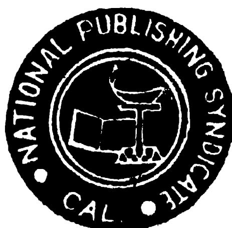
সংগ্রহশালা ঃ ইতিহাস ও সংরক্ষণ

(প্রথম খণ্ড)

অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য্য রীডার ও বিভাগীয় প্রধান
সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, লেকচারার
সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



ন্যাশনাল পাবলিশিং সিণ্ডিকেট
১৫এ, নবীন কুণ্ডু লেন কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশিকা ঃ মাম্পি রায়চৌধুরী
ন্যাশনাল পাবলিশিং সিণ্ডিকেট
১৫ এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪

অলংকরণ ঃ শিল্পী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল
প্রচ্ছদচিত্র ঃ মিউজ দেবী

মুদ্রক ঃ
ইউনাইটেড প্রেস অফ্ ইণ্ডিয়া
শ্রীপ্রবোধকুমার মাইতি
৮২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রাক্-ভাষণ

সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বা মিউজিওলজি একটি-নতুন বিষয় যার নিয়মিত চর্চা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে এই বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৮ সাল থেকে স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে ডিপ্লোমা ও ১৯৭২ সাল থেকে এই বিষয়ে এম. এ এবং এম এস. সি পড়ানো হয়। এছাড়াও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয় ও পিলানি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টি স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাগ্রহণ ও উচ্চতর গবেষণার সুযোগ আছে।

সংগ্রহশালাগুলি আজ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরক ও গণ-শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। ইতিহাস, শিল্প, প্রত্নবস্তু, পুরাবস্তু, নৃতত্ত্ব, জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, কারিগরী বিজ্ঞান, সাহিত্য ও জীবনী প্রভৃতি সকল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাকৃত ও মানবকৃত প্রামাণ্য অজস্র উপকরণ ও নিদর্শন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ছড়িয়ে আছে। সমাজ জীবনের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে সংগ্রহশালাগুলি ক্রমশঃ গণশিক্ষার মাধ্যমে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই সংগ্রহ-শালা, পুরাস্থল, উদ্ভিদকানন, মীনাগার, তারামণ্ডল, অভয়ারণ্য, চিড়িয়াখানা, মহা-ফেজখানা প্রভৃতি কখন একা একা, অথবা দলবদ্ধভাবে বা সপরিবার আমরা দেখতে যাই এবং নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বসহ মনোরম আনন্দের সন্ধান পাই। কিন্তু এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কবে, কোথায়, কেন শুরু হয়েছিল, এর কি ইতিহাস, তা' আজও অনেকের জানা নেই। সংগ্রহশালাগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। এই ইতি-হাসের শুরু প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির, বিভিন্ন যুগের আর্থরাজনৈতিক ও বস্তু-সংস্কৃতির মূল ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে সংগ্রহ-শালার ইতিবৃত্তান্তের সম্যক যোগ আছে—সে তথ্য ও ভাবনা ক'জনই বা জানেন।

শিল্পনিদর্শনগুলি ছড়িয়ে আছে দেশের নানান সংগ্রহশালা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাড়ি, মহাফেজখানা, বিদ্বজ্জনসভা, ও গ্রন্থাগার ইত্যাদিতে। এছাড়া মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, দুর্গ, বিজয়স্তম্ভ, রাজপ্রাসাদ, গুহা ও গুহাচিত্র, দেওয়ালচিত্র, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, ধ্বংসস্তূপগুলিও বহন করছে শিল্প বিজ্ঞান ও সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা। বহুক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতিতে বস্তুগুলির সংরক্ষণ না হওয়ায় এগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। তাই এগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। শিল্পবস্তুগুলিকে সংরক্ষণ করতে হলে এদের রাসায়নিক গঠন অনুসারে ভাগ করা দরকার—যেমন জৈব বস্তু, অজৈব বস্তু, বালি ও মৃত্তিকাযুক্ত বস্তু প্রভৃতি।

পুঁথিপত্র, তালপাতার পুঁথি, ভূর্জপত্র, চিত্র, পাটাচিত্র, জড়ানো পটচিত্র, ক্যানভাস-চিত্র, দেওয়ালচিত্র, কাপড়, কাঠ, হাড় ও হাতীর দাঁতের শিল্পবস্তু, ধাতব শিল্পবস্তু যেমন—লোহা, ইস্পাত, সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, সীসা, ও অন্যান্য সংকর-ধাতুর বস্তু, পোড়ামাটি, কাঁচ, পাথর, সিরামিকস্, মাটির তৈরী জিনিসগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য বস্তুগুলির উপর দূষিত পরিবেশ, তাপ, চাপ, আলো, আর্দ্রতার, ক্ষার ও অম্ল ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব এবং নানা ধরনের আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিগুলি জানা দরকার। এছাড়াও এ বিষয়ে সংগ্রহশালা বিজ্ঞানীরা কি ভাবেন ও কি করতে বলেন তার উপর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এই গ্রন্থটিতে করা হয়েছে।

এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় এখনও পর্যন্ত কোন গ্রন্থ নেই। তাই 'সংগ্রহশালা ঃ ইতিহাস ও সংরক্ষণ' দুখণ্ড রচনার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়। বিশাল এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা সে বিচার করবেন সুহৃদ ও 'সহিত' পাঠকবর্গ।

অনালোচিত অংশগুলি পরবর্ত্তী খণ্ডে আলোচিত হবে এবং শীঘ্রই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে।

১৯৮৪ সাল সংগ্রহশালার ইতিহাসে এক বর্ণময় বছর। বিশ্বের প্রথম আধুনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন সংগ্রহশালা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অ্যাসমোলিয়ান মিউজিয়মের তিন শ' বছর পূর্ত্তি, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির (প্রথম ভারতীয় সংগ্রহশালার জনক) দু'শ' বছরে পদার্পণ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি (সংগ্রহশালা বিজ্ঞান) বিভাগের রজত জয়ন্তীর ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে এই বছরে। ১৯৮৪ সালকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচনা।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য বহু নিবন্ধ, প্রতিবেদন, পুস্তক, পুস্তিকার লেখকদের কাছে আমরা ঋণী। বিশেষভাবে শিল্পী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল ও শ্রীসুশীল ভদ্র মহাশয়ের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধনীয়।

ন্যাশনাল পাবলিশিং সিণ্ডিকেটের পক্ষে শ্রী শিশিররঞ্জন রায়চৌধুরীকে তাঁর এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে সহৃদয় পাঠক, সংগ্রহশালার পরিচালক, কর্ম্মীবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকার ও অন্যান্য সংস্থাগুলি জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংগ্রহশালার গুরুত্ব যদি আরও বেশি করে উপলব্ধি করেন এবং শিল্পবস্তুগুলির সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সংগ্রহশালা সম্বন্ধে সচেতন হন তবে এই গ্রন্থের লেখকদ্বয়ের পরিশ্রম সার্থক হবে।

১লা বৈশাখ
১৩৯১

বিনীত
গ্রন্থকারদ্বয়

ভূমিকা

মানবসভ্যতার কোন শুভ মুহূর্তে সংগ্রহশালার সৃষ্টি হয়েছিল জানি না, তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাকে যারা রক্ষা করে—ও নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করে, তাদের মধ্যে সংগ্রহশালা প্রধান। মনস্তত্ত্বে ও সৌন্দর্যতত্ত্বে যাঁরা নিষ্ণাত তাঁরা বলেন, মানবমনের কর্ষণ থেকে যে ফলগুলির উদ্ভব হয়, তারা যদি 'কৃষ্টি' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, তাহলে এদের বিশুদ্ধতম রূপটিকে বলতে হয় 'সংস্কৃতি'। মানবচিত্তকে কে বা কারা কর্ষণ করে, এ প্রশ্নের উত্তরে বলতেই হয় যে এরা হচ্ছে কাব্যকলা, নাট্যশৈলী, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলা। সংগ্রহশালা ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকলার নিদর্শনগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে বলে সংস্কৃতির নব নব প্রবাহ ও তরঙ্গকে আয়ত্ত করতে গেলে সংগ্রহশালার শরণ নিতেই হবে। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে তাই সংগ্রহশালার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংগ্রহশালার এত গুরুত্ব থাকলেও কিন্তু এর বিবর্তনের কোনো ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত হয়নি। শিল্পবস্তু সংরক্ষণের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা বাংলা ভাষায় করার সাহসিকতা এখনও পর্যন্ত কেহ দেখান নি। এই দায়িত্ব সর্বপ্রথম পালন করার জন্য অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এ'রা 'সংগ্রহশালা : ইতিহাস ও সংরক্ষণ' গ্রন্থে পৃথিবীর বহু দেশের সংগ্রহশালার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস ত' উদ্ঘাটিতক রেছেনই ; সঙ্গে সঙ্গে দেশ-কাল-পরিবেশের পার্থক্য সত্ত্বেও মানবমনের যে স্বাভাবিক ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করার—তার ধারায় গতিবেগ সঞ্চারিত করার—যে আগ্রহ, তাকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। গ্রন্থকারদ্বয়ের মধ্যে ঐতিহাসিকের স্বচ্ছ দৃষ্টির সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণীশক্তির এবং তার্কিকের বলিষ্ঠ যুক্তির সঙ্গে কাব্যকতার রম্য অনুভূতির সমাবেশ ঘটেছে। ফলে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য ও অনন্যসাধারণ। গ্রন্থকারদ্বয়ের পরিবেশনশৈলী ও ভাষার ওপর অধিকার বইটিকে সুখপাঠ ও কাব্যধর্মী করে তুলেছে।

বাংলা সাহিত্যের এই নবতম সংযোজন 'সংগ্রহশালা : ইতিহাস ও সংরক্ষণ'-কে আমি সানন্দে বরণ করি। এই গ্রন্থ পুরাতত্ত্ববেত্তা ও সাধারণ কৌতূহলী পাঠক উভয়কেই পরিতৃপ্ত করে কালজয়ী রচনার মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে,—

'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা, নিরবধি'

১লা বৈশাখ,
১৩৯১

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন উপাচার্য
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম ভাগ

সংগ্রহশালার স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ

সংগ্রহশালা বা সংগ্রহালয় কথা দুটি বড় বেশি কেতাবী ও যথেষ্ট প্রচলিত না হওয়ায় হঠাৎ শুনলে কি ধরণের সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রহশালা বোঝানো হচ্ছে সেটি না দেখা পর্যন্ত ধরা যায় না। তুলনায় যাদুঘর অথবা মিউজিয়ম বললে শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং সাক্ষর, নিরক্ষর. শহুরে বা দেহাতী অনেকেই বুঝতে পারেন সেটা কি।

দেহাতী লোকেরা কলকাতায় এসে পাঁচটি জিনিস অবশ্যই দেখেন—হাওড়া পুল. কালী মাঈ কী মন্দির, বিটুর দেবী কী মন্দির (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল), জিন্দাঘর (চিড়িয়াখানা) এবং মুর্দাঘর (মর্গ বা লাশকাটা ঘর নয়, ভারতীয় যাদুঘর)। তাঁদের অনেকের মুখে আবার শোনা যায় আজয়েব ঘর অর্থাৎ আজব জিনিসের বাড়ী। আর কলকাতার লোকেরা তো গত শতক থেকেই ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মকে বলে আসছেন যাদুঘর, যেমন বোটানিক্যাল গার্ডেনকে বলতেন কোম্পানীর বাগান। পশুশালা অর্থাৎ জুলজিক্যাল গার্ডেনে পাখি ছাড়াও অন্য অনেক রকম জীবজন্তু রয়েছে, তবু মুখে মুখে তার নাম চিড়িয়াখানা, ইংরাজীতে যাকে এ্যাভিয়ারী বলে। আবার যেখানে পুরোনো কাগজ-পত্তর, দলিল দস্তাবেজ. চিঠিপত্র, সরকারী খাতা-পত্তর প্রভৃতি সংরক্ষণ করা হয় সেই আর্কাইভের ভারতীয় নাম মহাফেজ খানা, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক শিল্পবস্তু সংগ্রহকে অনেকেই কালেকশন বলতে অভ্যস্ত। এখানে যে সব প্রতিষ্ঠান বা যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হল তার সবগুলিই কিন্তু সংগ্রহশালা বা সংগ্রহালয়, ইংরাজী মিউজিয়ম শব্দটির ভারতীয় পরিভাষা। অবশ্য এখন যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সারা বিশ্বে মিউজিয়ম বলা হয়, উদ্ভবে মিউজিয়ম কিন্তু তা ছিল না।

তাহলে শুরু থেকে শুরু করাই ভাল। মিউজিয়ম (museum) শব্দটি গ্রীক শব্দ মিউজিয়ন (museion) থেকে এসেছে, অর্থ মিউজ দেবীর মন্দির। দেবরাজ জেনাস (Zenus) এবং নেমোসাইন (Mnemosyne) বা স্মৃতি দেবীর কন্যাদের গ্রীক দেবদেবীতত্ত্বে বলা হত মিউজেস (muses)। গ্রীক যুগে মিউজেসের সংখ্যার তারতম্য থাকলেও শেষাবধি তা ন'টিতে দাঁড়ায়। তারা সকলেই কুমারী এবং একেকজন জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলার একেক বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সেবিষয়ে মানুষের প্রেরণার উৎস। সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রেরণা লাভের জন্য আরাধনা ও ধ্যান করা হত বিভিন্ন মিউজেসের বা ধ্যান কন্যার। প্রেরণার উৎস মুখ হচ্ছে যুগ যুগান্ত ধরে সঞ্চিত স্মৃতি, লিখিত ও কথিত। তাই ধ্যান কন্যা বা প্রেরণা কুমারীরা স্মৃতির কন্যা। অবলোকন, পর্য্যবেক্ষণ, পঠন, পাঠন, অনুশীলন, চর্চা, শিক্ষা, শিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্মৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হয়; তবে না হয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রতিভার স্ফুরণ। তাই গ্রীকেরা মনে করতেন এরা সব স্মৃতির

গর্ভজাতা এবং এই ন'জন জ্ঞান ও প্রতিভার দেবীদের ধ্যান ও পূজাই যথেষ্ট নয়। এদের তুষ্টির জন্য চাই শিক্ষা, অনুশীলন, চর্চা—জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কলার। ফলে মিউজদের মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র—গ্রন্থাগার, মানমন্দির প্রভৃতি। এগুলির স্থান সংকুলানের জন্য মন্দির চত্বরের সংলগ্ন প্রাসাদ এবং তত্রস্থ গ্রন্থাগার ও সংস্কৃতির চর্চার কেন্দ্রকে বলা হতে লাগল মিউজিয়ন। বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাজানুকুল্যে এসব মিউজিয়ন-এর সংগে যুক্ত থাকতেন। দেখা যাচ্ছে যে, এযুগের শিল্প কলা বা ললিতকলা একাডেমী, বিজ্ঞান গবেষণা-ভবন, মান মন্দির জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রায় দু-আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসে এবং গ্রীস অধিকৃত বিভিন্ন স্থানে মিউজিয়ন বলা হ'ত। ভারতে বৌদ্ধদের সমৃদ্ধির যুগে নালন্দা, ওদন্তিপুর, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিহার ও মহাবিহারগুলি কাজ-কর্মে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ঐ মিউজিয়নের মতন ছিল। জৈনদের জ্ঞানভাণ্ডার বা লাইব্রেরী ধরণে ও ধারণায় সে যুগের মিউজিয়ন। তিব্বতের ধর্মীয় গুম্ফাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হিন্দু মন্দির ও দেবস্থানে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে পঠন, পাঠন, নৃত্য, সংগীত, নাট্য, কথকতা প্রভৃতির চর্চা করা হয়। এ কারণ সে সব দেবস্থানে অতীতে মিউজিয়ন বলতে মূলত যা বোঝাত তা এখনও টিকে আছে। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্ট ধর্মের গীর্জা ও যাজকদের বিহারগুলিকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় দর্শন, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা হত। রোমের ভ্যাটিকান চার্চ মধ্যযুগে এ জাতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ছিল। দূরে যেমন ভ্যাটিকান চার্চের মিউজিয়ম, হাতের কাছে তেমন উদাহরণ শ্রীরামপুর মিশনারীর পাদ্রী উইলিয়ম কেরীর যাজকতার সংগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা এবং অবশেষে মিশনারীর চার্চ, কলেজ ও লাইব্রেরীর পথ ধরে গড়ে উঠল একটি সংগ্রহশালা। সবই সেই গ্রীক মিউজিয়ন। সংস্কৃতির চর্চা, পণ্ডিতদের সভা, বিতর্ক, যাত্রা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতি গ্রাম বাংলায় অনুষ্ঠিত হত সাধারণত বৈষ্ণবদের শ্রীপাট বা অন্যান্য মন্দিরের নাট মণ্ডপে অথবা শক্তি মন্দির সংলগ্ন চণ্ডী-মণ্ডপে। তবে গ্রীক মিউজিয়ন, বৌদ্ধ বিহার, জৈন জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং খৃষ্টান চার্চের মত শ্রীপাট বা চণ্ডীমণ্ডপের সাংস্কৃতিক চর্চা স্থায়ী বা ধারাবাহিক ছিলনা অথবা বলা যেতে পারে যে ঠিক নির্দিষ্টভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না। গ্রীক মিউজিয়নও একেবারে গোড়ার দিকে খুব একটা একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না।

গ্রীক মিথলজীতে ঝর্ণার পরীদের বা দেবীদের (nymph) বলা হত মিউজেস বা মিউজকুমারী। সে সময়ে তারা ছিলেন সঙ্গীতের দেবী। তাদের কাজ ছিল দেবতাদের ভোজের সময় সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর বীণাটি বাজান ও গান করা। পরবর্তীকালে এর থেকে ধারণা তৈরী হল কবিরা মিউজ কন্যাদের গানে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্য রচনা করেন। সেভাবে মিউজ কন্যারা সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের দেবী হয়ে উঠলেন। অনুপ্রেরণার দেবী বলে বিবেচিত হবার ফলে সকল রকম শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে গেলেন এই মিউজ কন্যারা এবং অলিম্পিয়া পর্বতের দেবলোকে তাদের স্থান নির্দিষ্ট করা হোল। প্রথম দিকে

তাদের সংখ্যা ছিল তিন ; যেমন—Melete অর্থাৎ ধ্যানদেবী, Mneme অর্থাৎ স্মৃতি দেবী এবং Aoide অর্থাৎ সঙ্গীত দেবী। সবচেয়ে প্রাচীন মিউজ মন্দির আছে গ্রীসের অলিম্পাস ও হেলিকন পর্বতের পাদদেশে। ধীরে ধীরে অন্যত্র মিউজদের মন্দির তৈরি ও পূজার প্রবর্তন হয়। থেসপিয়াতে (Thespiae) তো মিউজ মন্দিরে পাঁচ বছর অন্তর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। সারা গ্রীসের নামকরা সঙ্গীতজ্ঞেরা এসে যোগ দিতেন সেই সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়—এটি ছিল যেন সঙ্গীতের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা, যেন কেন্দুলির জয়দেবের বাউলমেলা। আনন্দময়ী অনুপ্রেরণারূপে যখন মিউজদের আরাধনার শুরু হল, তখন তাদের সুরা, আঙ্গুর ক্ষেত ও আনন্দময়তার দেবতা ডায়োনিসাসের (Dionysus) আনন্দ সঙ্গীনী হতে বাধা থাকল না। কবিদের দেবতা অ্যাপোলোর (Apollo) বীণায় সুরের ঝংকার তুললেন মিউজ কুমারীরা এবং অ্যাপোলো হলেন মিউসাজিটেস (musagetes) অর্থাৎ মিউজকুমারীদের নেতা। অ্যাপোলোর সহচরী হওয়ায় মিউজ কুমারীরাও অ্যাপোলোর মতই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বা স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অধিকারী বলে বিবেচিত হতেন। মিউজ ধারণার এই বিবর্তন লক্ষ্যণীয়। পার্বত্য ও আরণ্যক ঝর্ণার জলকন্যা বা জল দেবী থেকে সঙ্গীত ও আনন্দ সত্তার অনুপ্রেরণাদায়িনী হয়ে ওঠায় তাঁরা ভাবের ও ভাবনার উৎস; তাই তাঁরা হলেন কাব্যলক্ষ্মী এবং অবশেষে কৃষ্টি, জ্ঞান, কলা, বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এযেন ভারতীয় ভাবনার সরস্বতী নদীর ক্রমে ক্রমে বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী হয়ে ওঠা। মিউজদের মতই সরস্বতী জল দেবী থেকে ধীদেবী হয়ে ওঠেন। সরস্বতী নদীতীরে জ্ঞান চর্চার খ্যাতি, দেবী সরস্বতী কতৃক গন্ধর্বদের কাছ থেকে সুরা অপহরণ ও সুরায় দেবতাদের অধিকার দান, গন্ধর্ববিদ্যা অর্থাৎ বীণাবাদন ও সঙ্গীত সাধনার অধীষ্ঠাত্রী দেবী বলে সরস্বতীর প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করলে গ্রীক মিউজ কুমারী সংক্রান্ত গ্রীসীয় ধারণার সঙ্গে চিরকুমারী সরস্বতী দেবী সম্বন্ধীয় ভারতীয় ধারণার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সে যুগে এথেন বাসীরা বিদ্যালয়ে মিউজদের পূজার ব্যবস্থা করেন ঠিক যেমন আমাদের দেশে জৈন জ্ঞানভাণ্ডারে গ্রন্থ-পূজা, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে গুরুগ্রন্থের নিত্যপূজা এবং সংস্কৃত টোল ও চতুষ্পাঠীতে শ্রীপঞ্চমীতে বই, দোয়াত, খাগের কলম পূজা এবং সাম্প্রতিককালে এদেশে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে মাঘী পঞ্চমীতে বিদ্যাস্থানেভ্য এবচ মন্ত্রোচ্চারণ সহ সরস্বতীর মূর্তি পূজা। ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছে সরস্বতী যে ধ্যানধারণায় প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন গ্রীকবাসীদের কাছে মিউজের প্রতিষ্ঠা ছিল সেই রকম। সরস্বতীকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতে সারস্বত ভবন গড়ে না উঠলেও মিউজকে কেন্দ্র করে গ্রীসে গড়ে ওঠে মিউজিয়ন।

এবার ন'জন মিউজকে কেন কলা বা বিজ্ঞানের দেবী বলে অভিহিত করা হয় সেটি আলোচিত হলে মিউজ, মিউজিয়ন ও বর্তমানকালের মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে ভাবগত সাদৃশ্য আছে সেটি ধরা পড়তে পারে। ন'জন মিউজ হলেন (১) Calliope, অতি সুমিষ্ট তাঁর কণ্ঠস্বর, হাতে লেখনী ও লেখ-ফলক, মহাকাব্য-সঙ্গীতের প্রেরণা;

(২) Clio, স্তুতিনিপুণা, ইতিহাস রচনার প্রেরণা, হাতে জড়ানো পট্টলেখ (Scroll) ; (৩) Euterpe, আনন্দদায়িনী, লিরিকের প্রেরণা, দুহাতে দুটি বাঁশি : (৪) Thalia, উন্নতিকারিনী, কমেডির প্রেরণা, মুখে কমেডির মুখোস, হাতে আইভি মালা এবং মেষ পালকের লাঠি ; (৫) Melpomene, বিষাদ সঙ্গীত গায়িকা, হাতে গদা বা তরোয়াল, মুখে বিষাদের মুখোশ, ট্রাজেডি কাব্যের প্রেরণা ; (৬) Terpsichore, নৃত্যোচ্ছল, হাতে বীণা, নৃত্যের প্রেরণা, (৭) Erato, প্রেমময়ী, হাতে ছোট একটি বীণা, শৃঙ্গার-কাব্যের প্রেরণা ; (৮) Polhymnia অথবা Polymnia, স্তবৈশ্বর্যময়ী, ঘোমটাঢাকা মুখ, চিন্তামগ্না, ধর্মীয় সঙ্গীতের প্রেরণা এবং (৯) Urania, স্বর্গীয়া, (heavenly) হাতে মহাকাশের মানচিত্র গোলক (celestial globe), জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রেরণা। মোটামুটি সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, স্তবস্তুতি, ইতিহাস, মহাকাব্য ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রেরণাদায়িনী দেবী ঐ মিউজ কুমারীরা। এ থেকেই তাঁরা হয়ে উঠলেন জ্ঞান, বিজ্ঞান কলা ও কৃষ্টির দেবতা।

মিউজ দেবকন্যাদের আরাধনাকে ভিত্তি করে গ্রীসে আধ্যাত্মিক দর্শনের চর্চা শুধু নয়, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে কাব্য, মহাকাব্য, সঙ্গীত, নাটক, ইতিহাস, নিসর্গ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা, চর্চা, অনুশীলন করা হত। এমনকি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকত। এরকম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলার চর্চা সৃজন ও উদ্ভাবনের জন্য যে সব আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের প্রয়োজন হত সেগুলি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হত ঐ মিউজিয়নে—মানমন্দির সংক্রান্ত যন্ত্রাদি, নাট্য চর্চার পোষাক পরিচ্ছদ, সঙ্গীত চর্চার যন্ত্রপাতি, যেমন বীণা, বাঁশি এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞান চর্চার জন্য অজস্র পুঁথি। এ রকম একটি মিউজিয়নের প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম টলেমি সোটেরেস (Soretes) খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের গোড়ায় মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বা ব্রুসিয়াম নামক স্থানে। প্রথম টলেমির পুত্র টলেমি ফিলাডেলফাস এই মিউজিয়নটিতে একটি বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। সেই গ্রন্থাগারে সাতলাখের মত পুঁথি সংগৃহীত হয়। এর ফলে স্থানাভাব দেখা দেওয়ায় সেরাপিউমে (Serapeum) একটি সুবৃহৎ অট্টালিকায় গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হল। এই মিউজিয়নের কাছেই ছিল রাজপ্রাসাদ এবং ঠিক সম্মুখে ছিল মিউজেসের মন্দির। দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা যাতে অবাধে তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলার সাধনা চালাতে পারেন সেজন্য এই মিউজিয়নে তাদের সরকারী ব্যায়ে জীবন যাপনের ব্যবস্থা ছিল। শুধু কি তাই! তাঁদের পঠন-পাঠন, শিক্ষা ও শিক্ষণে সকল রকম সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা রাজকোষ থেকে করা হত। স্ট্রাবোর লেখা থেকে জানা যায় যে মিশর যখন রোমের দখলে এল তখনো এই আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়নের অর্থ সাহায্য আসত সম্রাটের রাজকোষ থেকে এবং অংকশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা ও অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল এটি। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে রোমের গৃহযুদ্ধ কালে এই প্রতিষ্ঠানটি নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা বহুল প্রচারিত হয়ে আছে যে, মুসলমানেরা মিশর আক্রমণকালে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি পুড়িয়ে দেয়। কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়।

যাই হোক একথা অনস্বীকার্য্য যে গ্রীক সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণ আলেকজান্দ্রিয়ার এই মিউজিয়নের বিশিষ্ট অবদান ছিল।

বর্তমানকালে আধুনিক ধারণা সমৃদ্ধ মিউজিয়মগুলিতে সংগৃহীত বস্তুকে ভিত্তি করে গবেষণা, পঠন-পাঠন, শিক্ষা ও আনন্দদায়ক চিত্ত বিনোদনের উপর যে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় সেই মৌলিক উদ্দেশ্যটি ইতিহাসের নানা ঘুরপথে গ্রীক ধারণার মিউজিয়ন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রীক সভ্যতার আগে মন্দিরকেন্দ্রিক এবং সরকারী ব্যায়ে পরিচালিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ম আর কি কোথাও ছিল? মিশরের হেলিওপোলিস নামক নগরীর গ্রন্থাগারটির খ্যাতি ছিল সেই যুগে। এডফিউ (Edfu) মন্দিরে ছোট কক্ষে যে পাঠাগারটি ছিল তার সংগ্রহ তালিকা লিখিত হয়েছিল কক্ষটির দেওয়ালের গায়। এগুলি ঠিক সংগ্রহশালা ছিল কিনা তা জানা যায় নি।

বিশ্বের প্রাচীনতম সংগ্রহশালার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে ব্যাবিলনের রাজধানী উরনগরীর শহরতলীতে অবস্থিত চন্দ্রদেবী নন্নরের মন্দির সংলগ্ন একটি বিহারের কক্ষে। যে কক্ষে এই সংগ্রহশালাটি পাওয়া যায় সেটি নির্মিত হয়েছিল ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা নেবুচাডনেজরের পৌত্র এবং ব্যাবিলনের শেষ রাজা নবোনিডাসের নির্দেশে খৃঃ পূঃ ৫৫০ সালে অর্থাৎ আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজয়ন প্রতিষ্ঠার প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে। দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত মন্দির, যাকে বলা হ'ত 'দুবলাল মখ, সেটি নবোনিডাস-এর সময়, তাঁর নির্দেশে পুনর্গঠিত হল এবং এই মন্দিরের কাছে আর একটি মন্দির ও কয়েকটি সারিবদ্ধ ঘর তৈরী হল। একটি মৃৎফলকে লেখা লিপি থেকে জানা যায় গৃহটি চন্দ্রদেবী নন্নরের নামে উৎসর্গীকৃত এবং সারিবদ্ধ কক্ষগুলি চন্দ্রদেবীর উপাসিকাদের বিহার। অন্য একটি পুরা লেখ থেকে জানা গেল রাজা নবোনিডাস তাঁর কন্যা বেল-শাল্টি নন্নরকে চন্দ্রদেবীর মন্দিরের প্রধানা উপাসিকা নিযুক্ত করেন এবং এই নতুন বিহারের যে ঘরে উপাসিকা রাজকন্যা থাকতেন তার নাম ছিল ই-গিগ-পর (E-gig-por)। এই ই-গিগ-পর, বিহারের সবচেয়ে বড় গৃহ, স্বভাবতই রাজকন্যার মর্য্যাদার ইঙ্গিতবাহী।

এই যাজিকা বা উপাসিকাদের বাসগৃহ, বিশেষ করে প্রধানা উপাসিকা বেল-শাল্টি নন্নরের গৃহটির গুরুত্ব বর্তমান আলোচনায় অস্বীকার করা যায় না। দুবলাল মখের পাশের একটি ঘরের দরজার কাছে পাওয়া গেল একটি চুণা পাথরের উপর খোদাই করা চিত্রমালা। এই মন্দিরটি থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত 'এরিডু' নামে একটি ছোট প্রাচীনতর শহরের "স্থান দেবতা" ছিলেন জলের দেবতা এয় (Ea), যার হাতে জলপাত্র। আলোচ্য অগভীর খোদাই কাজটিতে এয়-র হাতের জলপাত্র থেকে প্রবাহিত জলধারায় মাছেরা খেলা করছে দেখান হয়েছে। এয়কে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের দেবতা রূপে অভিহিত করা হত। এখন প্রশ্ন পাথরটি দ্বারশীর্ষে না থেকে ঐভাবে দরজার কাছে ছিল কেন? এরিডুর মন্দিরটি ভেঙ্গে গেলে কেউ হয়ত পূর্ব-

পুরুষের শ্রদ্ধেয় (প্রায় পনের শ বছর আগেকার) দেবমূর্তিটি উদ্ধার করে দুবলাল মখে এনে তুলে রেখেছিলেন। এবার প্রশ্ন এই 'কেউ' ব্যক্তিটি কে ?

'দুবলাল মখ' মন্দিরের রান্নাঘরের দরজার পাশে মেঝেতে পাওয়া গেল একটি হাতীর দাঁতের অতি সুন্দর কাজ করা কাস্কেট বা ঝাঁপি। এর কাজের রীতি দেখে। মনে করা হয় এটি সে সময়ের (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক) ফিনিসীয় হস্তীদন্ত শিল্পীদের হাতের কাজ। ফিনিসীয় কারিগরদের এ জাতীয় হস্তশিল্পে তখন খুবই খ্যাতি ছিল। হয়তো বা রাজকন্যা বেল শাল্টি নন্নরের এটি নিজস্ব বিলাস সামগ্রী ছিল।

দুবলাল মখের দুটি ঘর থেকে দুটি জিনিস পাওয়া গেল। একটি পুরাবস্তু রাজকন্যার সময়ের পনের শ বছর আগেকার, আরেকটি তাঁর কালে রপ্তানীকৃত হস্তশিল্প। এরপর অন্য একটি কক্ষ থেকে অনেকগুলি মাটির ফলক-লেখ পাওয়া গেল। এগুলির এক পিঠে একটি করে সরল বাক্য লেখা আছে এবং অন্য পিঠে কারা যেন সেই লেখাটি অনুশীলন করেছে, কোথাও ভুল হলে পুনরায় নতুন করে লিখেছে। এগুলির সঙ্গে পাওয়া গেল অনেক ভাঙ্গা ভাঙ্গা মৃৎ-ফলক লেখ—যাদের উপর এমন সব বিষয় লিখিত যা বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় বলে মনে হয়। লেখাগুলি অনেকটা ইংরাজী স্পেলিং বুকের মত। অবশেষে এমন একটি মৃৎ-ফলক-লেখ পাওয়া গেল যেটিতে পরিষ্কার লেখা আছে "ছাত্রদের সম্পত্তি"। এবার বোঝা গেল দুবলাল মখের সংলগ্ন নন্নর দেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে উপাসিকা বিহারটি গড়া হয়েছিল শুধুমাত্র পুজা-পার্বন বা উপাসনার কাজেই সেটি ব্যবহৃত হ'ত না। সেটি ছিল রাজা নেবুচাডনেজরের প্রপৌত্রী উপাসিকা বেল-শাল্টি নন্নর পরিচালিত আবাসিক বিদ্যালয়, যেখানে ছাত্ররা অধ্যয়ন করত এবং থাকত।

বিস্ময়ের শেষ কিন্তু এখানেই নয়। অন্য একটি কক্ষ থেকে পাওয়া গেল সযত্নে রক্ষিত একটি খোদিত সীমানা নির্দেশক শিলা-লেখ। এটিতে লেখা আছে কোন একখণ্ড জমির অবস্থান, পরিমাণ, কেমন করে ঐ জমি মালিকের হাতে এল এবং সেই সঙ্গে যে এই সীমানা ফলক নষ্ট করবে বা সরিয়ে ফেলবে তার উদ্দেশ্যে নিদারুণ অভিশাপ। ফলকটি উৎকীর্ণ হয়েছে খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতকে, ঐ বিহার তৈরীর সময় থেকে প্রায় সাড়ে আটশ বছর আগে। সেই কক্ষের পাশেই ছিল একটি মূর্তির ভগ্নাবশেষ, বাহুর অংশ এবং সেখানে লেখা 'ডুঙ্গি'। কে এই ডুঙ্গি ? তিনি হেঁজি-পেজি কেউ নন ! তিনি উরের রাজা ছিলেন এবং রাজা হয়েছিলেন খৃঃ পূঃ ২০৫৮ অব্দে। তিনি মনে করতেন রাজা শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতিনিধি নন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। সে কারণ তাঁর পিতা উর-নম্মু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অসমাপ্ত নন্নর বা চন্দ্রদেবীর মন্দিরটিকে ডুঙ্গি প্রাসাদ মন্দিররূপে নির্মাণ করেন এবং সেখানে তাঁর নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। হয়তো বা এটাই সেই স্ব-প্রতিষ্ঠিত দেবতা-রাজার মূর্তির ভগ্নাবশেষ। 'ডুঙ্গি' মূর্তির ভগ্নাবশেষের পাশেই পাওয়া গেল খৃঃ পূঃ অষ্টাদশ শতকের লারসা নগরীর এক রাজার নামাঙ্কিত প্রাসাদের ভিত্তি-প্রস্তর। ঐ সময় উর লারসা নগরীর রাজা কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং বিজয়ী রাজা উরে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত

ঐ কক্ষে পাওয়া গিয়েছিল আরও অনেক পুরাবস্তু। নন্নর বিহারে বেল-শাল্টি নন্নরের বিদ্যালয় ছিল সে তো জানা গেল। কিন্তু এতসব পুরাবস্তু কেন ?

এই রহস্য ভেদ হল যখন একটি ঢোলকাকৃতি মৃৎ ফলকে চার স্তম্ভে লিখিত একটি লেখ মালা পাওয়া গেল। এর তিনটি স্তম্ভে লেখার বিষয়বস্তু উরের রাজা বুর-সিন (Bur-Sin)-এর রাজত্বকালে লেখা (খৃঃ পূঃ ২০০৫)। চতুর্থ স্তম্ভে সেমেটিক ভাষায় লেখা আছে, এগুলি উরের ধ্বংসাবশেষে পাওয়া বার-সিনের সময়ের লিপির নকল। আমি এগুলি দেখেছিলাম এবং সকলের বিস্ময়ের জন্য লিখে রেখে দিলাম।" যদিও লেখক পটু নকল নবীশ ছিলেন না, তবু বলা যেতে পারে এটি একটি মিউজিয়ম লেবেল যার মাধ্যমে পরিচিত ভাষার সাহায্যে অপরিচিত লিপির পরিচয় লিখে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং এতক্ষণে বোঝা গেল ঐ গৃহটি উরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া প্রাচীন পুরাবস্তুর সংগ্রহশালা—যেটি রাজকন্যা বেল-শাল্টি নন্নরের প্রযত্নে তৈরী হয়েছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়মের প্রকৃতি ছিল উচ্চ শিক্ষা ও অনুশীলন কেন্দ্র, পাঠাগার নির্ভর একাডেমী। কিন্তু উরের নন্নর মন্দির বিহারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একটি বিদ্যালয় এবং এর সঙ্গে ছিল পুরাবস্তু সংগ্রহশালা। আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ম ছিল ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের-ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ কেন্দ্র। নন্নর সংগ্রহশালাটি ছিল আধুনিককালে ইনসিটু (insitu) বা সাইট (site) মিউজিয়ম বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। পুরাস্থানের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ সেই স্থানে নির্মিত কোন গৃহে সংরক্ষণ করা হলে সেই পুরা বস্তু ভাণ্ডারকে ইনসিটু বা সাইট মিউজিয়ম বলা হয়। এখানে আর একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। গ্রীক ধারণায় মিউজ-দেবীরা হলেন জলদেবী, ঝর্ণার কলধ্বনি, তরঙ্গের সঙ্গীত। নন্নর উরের চন্দ্রদেবী। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিতে নদীতে জল কমে বাড়ে। সঙ্গে পাওয়া গেল এয় (Ea) দেবের রিলিফ প্যানেল। তাঁর হাতের জলপাত্রের ধারায় মীনক্রীড়া চিত্রিত, তিনি উরের-প্রাণ-স্বরূপ নদীদ্বয়ের জীবন দাতা। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে গ্রীক ধারণা মিউজের মন্দির মিউজিয়মের সঙ্গে জল দেবতার সংযোগ ভারতীয় ধারণায় সরস্বতী নদী এবং উভয়েই জ্ঞান দায়িনী ও বীণাবাদিনী। জল থেকে উর্বরতা, উর্বরতা থেকে কৃষি ও অরণ্য সম্পদ, নদী থেকে বাণিজ্য, বাণিজ্য থেকে লক্ষ্মীলাভ এবং যেখানে সম্পদ সেখানে কলা ও কৃষ্টি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠালাভ—এই সরল ধারণাটি কি উর, কি ভারত এবং কি গ্রীক সকল দেশের মানুষের চিন্তায় সক্রিয় ছিল কি ?

প্রাচীনকালে মিউজিয়মের বা সংগ্রহশালার ধারণা ধর্ম-ভিত্তিক ছিল। সেগুলি আধ্যাত্মিকতার ভাব মণ্ডিত থাকত। এইসব সংগ্রহশালা জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে গড়া হত এবং জ্ঞান ও চিত্ত বিনোদনের কাজে লাগান হত। অবশ্য আধুনিককালে মিউজিয়মের মূল উদ্দেশ্য জন সাধারণের শিক্ষা ও আনন্দের জন্য সংগৃহীত বস্তু সম্ভারকে কেন্দ্র করে নানান পদ্ধতিতে নানা ধরণের কার্য্যকরী ব্যবস্থা রাখা। আধ্যাত্মিকতা ও ঐতিহ্যগামিতা দ্বারা এই যুগের সংগ্রহশালা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয় না। আজকের সংগ্রহশালাগুলি ধর্মনিরপেক্ষ হলেও ভাবাদর্শ বা ইডিওলজি (ideology) নিরপেক্ষ

নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং প্রদর্শবস্তু বা নিদর্শনের ক্ষেত্রে অপ্রকট হলেও, কোন না কোন ভাবাদর্শ কাজ করে। প্রাচীনকালেও শুধুমাত্র জ্ঞান-চর্চা ও শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সংগ্রহশালা গড়া হত না। এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান ভিত্তিক উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার গড়ে উঠেছিল গ্রীসে ম্যাসিডোনিয়া রাজ্যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অর্থাৎ টলেমির আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ন প্রতিষ্ঠার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ তাঁর পুত্র আলেক-জাণ্ডারের শিক্ষার দায়িত্ব দেন সে যুগের মহাপণ্ডিত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের হাতে। অ্যারিস্টটল ছিলেন সর্বশাস্ত্র বিশারদ। সে কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করেন এবং প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন। তার পাণ্ডিত্য ছিল বস্তুনিষ্ঠ, পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তি নির্ভর। গুরু প্লেটোর মত তিনি ভাববাদী ছিলেন না এবং তাঁর কৌতূহল, অধ্যয়ন ও রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রকৃতি বিজ্ঞানের স্থান ছিল। এ বিষয়ে তাঁর রচনা শ্রদ্ধা সহকারে গৃহীত হত। সে কালের একটি ঘটনার কথা বলা যাক। গ্রীসে টিবুর নগরীতে আউলি গেল্লাস (Aulu Gellus of Tibur) নামে এক ব্যক্তির গৃহে আহূত এক ভোজ সভায় জলের গুণাগুণ নিয়ে তুমুল তর্ক বেধে যায়। তখন এক ব্যক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে স্থানীয় পাঠাগার থেকে অ্যারিস্টটলের লেখা একখানি পুঁথি নিয়ে এসে জল সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের অভিমত পড়ে শোনানোতে তর্কের ঝড় থেকে গেল। এ হেন অ্যারিস্টটল আলেকজাণ্ডারকে শুধুমাত্র কাগজে কলমে প্রকৃতি বিদ্যা শেখাবেন এমনটি আশা করা যায় না। অন্তত তাঁর আগ্রহী পিতা যখন ম্যাসিডন অধিপতি এবং তাঁর অর্থ, সামার্থ্য ও প্রতাপ আছে। রাজার অর্থানুকুল্যে ও ছাত্রের আগ্রহে অ্যারিস্টটলের পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুসারে ম্যাসিডনে গড়ে উঠল এক বিশাল উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার অর্থাৎ বোটানিক্যাল গার্ডেন—আজ থেকে প্রায় সাড়ে তেইশ-শ' বছর আগে। বিশ্বের প্রথম উদ্ভিদ সংগ্রহের উদ্ভবের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, গবেষণা ও প্রাকৃত বিজ্ঞান চর্চা—ঠিক আজকাল যে উদ্দেশ্যে বোটানিক্যাল গার্ডেন গড়ে তোলা হয় ঠিক তাই। নিসর্গ বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, গণনা এবং নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ পর্য্যবেক্ষণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান বীক্ষণ কেন্দ্র, একালে যাকে আমরা অবজার্ভেটরী বলি সে রকম মান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার। সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সেটি একটি বিজ্ঞান মিউজিয়ম, বোধহয় পৃথিবীর প্রথম মানমন্দির। এই শতকে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে তৈরী হচ্ছে প্ল্যানেটোরিয়াম অর্থাৎ তারামণ্ডল, যে প্রেক্ষাগৃহে বসে দর্শক আকাশের নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতিপথ, নানা সময়ের অবস্থান, পরিচিতি প্রভৃতি বিষয়ে জানতে পারেন অরং আকাশে তাদের যেমনটি দেখা যায় তেমন ভাবেই দেখতে পারেন। কলকাতা শহরের বিড়লা তারামণ্ডলটি একারণে খুবই জনপ্রিয় দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। অবশ্য প্রাচীনকালের মান মন্দির ছিল যন্তর মন্তরের পূর্ব পুরুষ।

সেকালে পূর্বোক্ত মিউজিয়াম, মানমন্দির, উদ্ভিদকানন প্রভৃতির পাশাপাশি অন্য আরেক ধরণের বস্তুভাণ্ডার গড়ে উঠল নানা দেশে নানান মন্দির, গীর্জা ও মসজিদে। গ্রীসের পার্থেনন, অলিম্পিয়া ও ডেলফিসের মন্দিরে, রোমের ক্যানিটোলাইনে, ভারতের

তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বর, মাদুরাই-এর মীনাক্ষী, রামেশ্বরমের রামেশ্বর, তিরুপতির বেঙ্কটেশ্বর এবং বহুবার লুণ্ঠিত ইতিহাসে বিখ্যাত সোমনাথের মন্দিরে, পৃথিবীর প্রায় সকল সম্পদশালী গীর্জায় এবং কোন কোন মসজিদে গড়ে উঠল ভক্তদের দেওয়া নানা ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার—সোনা, রূপা ও রত্নের অলংকার, সাজ পোষাক, ধাতু ও পাথরের তৈজসপত্র, পূজার সাজ সরঞ্জাম, কত বিচিত্র সব বাদ্যযন্ত্র, হাওদা, দোলা, পালকি, রথ,আসন, এমনকি অস্ত্রশস্ত্র, শোভাযাত্রার ধ্বজাদণ্ডের বিশাল বিশাল সংগ্রহ। এর মধ্যে অনেক দেবস্থানের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আজও টিকে আছে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুসারে উপযুক্ত দর্শনী দিলে দেখতে দেওয়া হয়। দেশ, জাতি ও সমাজের শিল্প, কলা, হস্তশিল্পের কারিগরি কুশলতা ও সামাজিক ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবে এই সব সংগ্রহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। অবশ্য শিক্ষাদান বা জ্ঞানান্বেষণের কাজে এগুলির ব্যবহার আজও খুব একটা হয় না।

সামগ্রী সংগ্রহগুলিকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পরিবার কর্তৃক কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতার পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু সংগ্রাহক বা তাদের উত্তরাধিকারীরা প্রাচীন কাল থেকেই পুরাবস্তু বা শিল্প সামগ্রী বা কৌতূহল উদ্দীপক জিনিসের সংগ্রহ জাতির, রাষ্ট্রের, অথবা জনসাধারণের সম্পত্তি বলে মনে করতেন। অন্ততপক্ষে আরও পাঁচজন যাতে সে সব সংগ্রহ দেখতে পাবে খুব সীমিত হলেও তেমন ব্যবস্থা তারা করতেন। মন্দির বা দেবস্থান সংলগ্ন সংগ্রহগুলি দেবস্থানে যে সব দর্শনার্থী বা ভক্ত আসতেন তাদের দেখার সুযোগ থাকত। গণরাষ্ট্র এথেন্সের শাসনকর্তা পেরিক্লিস। (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক) মন্দিরের থেসারাসের সম্পদ যে জনগণের, সে কথা স্বীকার করে, প্রতিশ্রুতি দেন যে পোলোপন্নেসিয়ার যুদ্ধেরজন্য ব্যবহৃত মন্দিরের রক্ষিত সকল সম্পদ, যুদ্ধ শেষে ফেরত দেওয়া হবে। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে মিশরের আলেক-জান্দ্রেয়ায় যে মিউজিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে জ্ঞানীগুণীরা যেমন সেই মিউজিয়নের গ্রন্থাগার, মানমন্দির এবং অন্যান্য সংরক্ষিত দ্রব্য ও শিক্ষা শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করতে পারতেন, তেমনি রাজার নির্দেশে যখন রাজকীয় শোভাযাত্রা আলেকজান্দ্রিয়ায় বের হত, তখন গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নগরীর জনসাধারণও বিচিত্র বস্তু সম্ভার দেখার সুযোগ পেতেন। আলেকজান্দ্রেয়ার মিউজিয়নের সঙ্গে যে সুবিশাল গ্রন্থাগার ছিল সেখানে পুঁথি ছিল প্রায় সাতলক্ষ। সেই পাঠাগারের অত পুঁথি কী শুধুমাত্র বাক্স বন্দী বা বস্ত্র-বিজড়িত করে রাখার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল? তেমন মনে হয় না।

ইতিহাস বলে যে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ও মিউজিয়নটি আধুনিক চিন্তায় যে সব প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তদোত্তর গবেষণা কেন্দ্র (Centre for Advance Studies) বলা হয় সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। সে যুগের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কলা বিদ্যার একাধিক দিকপাল ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের অনস্বীকার্য্য অবদান রেখে গেছেন।

প্রথমে টলেমি যার অন্য-নাম টলেমি সোটের (Ptolemy Soter) আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ন ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর সেখানে অঙ্ক জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের

দায়িত্ব দেন জগত বিখ্যাত জ্যামিতি শাস্ত্রবিদ Euclide-কে (আঃ ৩০০ খৃঃ পূঃ) এবং এই প্রতিষ্ঠানে থাকা কালীন ইউক্লিড রচনা করেন তাঁর Elements of Mathematics নামক প্রখ্যাত গ্রন্থটি। অবাক লাগে যখন জানতে পারি যে এই জ্যামিতি বেত্তা Euclide-ই সঙ্গীতের উপর রচনা করেন Introduction to music বইটি। অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বলা দরকার যে আলেকজান্দ্রিয়া সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা টলেমির সোটের নামের অর্থ ত্রাণকর্তা বা সংরক্ষক। ভাবুন তো পৃথিবীর প্রায় প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতার নাম 'সংরক্ষক' যিনি তরবারি ও বর্শা হাতে নিয়ে, অশ্বপৃষ্ঠে আসীন থেকে, দীর্ঘদিন আলেকজাণ্ডারের বিশ্বস্ত সেনানায়কত্ব করেছেন, তাঁর বিশ্ব অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সবশেষে সম্রাটের মৃত্যুর অনেক পরে ষাট বছর বয়সে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করে, যুদ্ধ না করে, গড়ে তুললেন শাসন কালের প্রথম বছরেই এক সুবৃহৎ মিউজিয়ন ও লাইব্রেরী ; উদ্দেশ্য জাতি কীর্তির ও কৃষ্টির সংরক্ষণ, অনুশীলন এবং ক্রমোন্নয়ন। শুধু কি তাই, তাঁর লেখা আলেকজাণ্ডারের উপর ইতিহাস আজও এই বিষয়ের একটি প্রামান্য ইতিহাসগ্রন্থ।

টলেমি সোটের পর টলেমি ফিলাডেলফাস গ্রন্থাগারের নতুন গৃহ নির্মাণই শুধু করেন নি সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি সংগ্রহ সংরক্ষণ ও তালিকা রচনার দায়িত্ব দিলেন পণ্ডিত Callimechus-কে, যিনি গ্রন্থাগারের সভাপতি পদে ব্রতী থেকে প্রায কুড়ি বছর অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা, গ্রন্থরচনা প্রভৃতি কাজ করেন। তিনিই পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থাগারিক, যিনি নতুন ভবনে গ্রন্থাগার স্থানান্তর কালে, আট শ' গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা রচনা করেন। প্রতিটি গ্রন্থের বিবরণ সেই তালিকায় বিবৃত করার ফলে এই তালিকার আয়তন দাঁড়ায় একশ কুড়ি খণ্ড। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ মহা পণ্ডিত Erastothenes, Aristophanes of Byzantium, Apollonius of Rhodes প্রভৃতি। Callimachus এর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন প্রাচীন নগরীর ইতিহাস উদ্ধার করা এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। এই দুই বিষয়ের উপর তাঁর লেখা গ্রন্থ Aitia (অর্থ Causes, কারণসমূহ)। আজ যারা কলকাতার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা তাঁদের প্রাচীনতম গুরুর সন্ধান পাবেন Callimachus-এ, যিনি আজ থেকে বাইশ শ' বছর আগে জনপদেরও যে পুরাবৃত্ত রচনার প্রয়োজন আছে সে কথা তার কর্মের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

টলেমি ফিলাডেলফাস তাঁর পুত্রদের শিক্ষার দায়িত্ব দিলেন Zenodotus নামে এক কাব্য সাহিত্য বিশারদকে। Zenodotus আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ন ও গ্রন্থাগারের সুপারিনটেনডেন্টের পদে নিযুক্ত হলেন। হোমরের মহাকাব্যের উপর ক্রিটিক্যাল ও সমালোচনা মূলক সাহিত্যালোচনার পথ প্রদর্শক এই Zenodotus এবং তাঁর শিষ্য Aristophanes of Byzantium ও Aristarchus প্রমুখ পণ্ডিতেরা ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানের পুরোধা ছিলেন।

Callimachus এর পর আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ন ও গ্রন্থাগারের দায়িত্ব পান এথেন্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানের সকল শাখার পারঙ্গম Erotosthenes, যিনি একাধারে

ভূগোল, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেই সুপণ্ডিত ছিলেন তাই নয় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল ইতিহাস দর্শন ও কাব্যসাহিত্যে। এই কারণে তাঁকে বলা হত Pentathlos, master of five great exercises of arena, পাঁচরকম ক্রীড়াকুশলী। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে গ্রীক বিদগ্ধ মণ্ডলী Philologos বা বিজ্ঞানের বন্ধু বলে অভিহিত করতেন। তাঁর লেখা তিন খণ্ডের Geographia, সে যুগের ভূগোলের কোষগ্রন্থ ছিল। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়নের ভূগোল সংক্রান্ত সংগ্রহের সুসঙ্গত বিন্যাস করেছিলেন। এই অর্থে তাঁকে বিশ্বের প্রথম মিউজিওলজিস্ট বললে ভুল হবে না।

Eratosthenes অবসর গ্রহণ করার পর আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন Callimachus-এর ছাত্র Apollonius of Rhodes (খৃঃ পূঃ ১৯৬)। তাঁর খ্যাতি মহাকাব্য রচনায়। তাঁর পরে Zenodotus ও Callimachus-এর আরেক ছাত্র Aristophanes of Byzantium (খৃঃ পূঃ ২৬০-১৮১) মুখ্য গ্রন্থগারিক হন. তখন এর বয়স সাতাত্তর বছর। এর খ্যাতি ছিল ব্যাকরণে। তাঁর ছাত্র Aristarchus সংরক্ষক নিযুক্ত হন। ইনি Callimachus-এরও ছাত্র ছিলেন এবং এর হোমরের উপর লেখা টীকা ভাষ্য এখনও হোমর কাব্যের উপর আলোচনার মূল গ্রন্থ। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে Aristarchus তাঁর ছাত্র রাজপুত্র, যখন সপ্তম টলেমি নাম নিয়ে, রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন একদা ঐ শিষ্যের স্বৈরাচারী শাসনের তাড়নায় আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হন।

Aristarchus নামে আরেকজন পণ্ডিত আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষালাভ করেন (আঃ খৃঃ পূঃ ২৭০)। তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং তিনিই প্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে পৃথিবী নিজের অক্ষরেখায় অবস্থান করে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য্য ও চন্দ্রের আয়তন এবং পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব গণনার প্রথম চেষ্টা তিনিই করেন। অবশ্য এসব ব্যাপারে তাঁর বড় সহায়ক ছিলেন তারই শিষ্য Hipparchus যিনি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ, বিষুব সংক্রান্তি প্রভৃতি গণনার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। Hipparchus-এর আর এক কৃতিত্ব ১০২৬ টি নক্ষত্রের একটি বিবরণমূলক তালিকা নির্মাণ।

এঁরা ছাড়াও আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ন ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ Herophilus (আঃ খৃঃ পূঃ ৯২৫), যন্ত্রযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষজ্ঞ Heron (আঃ খৃঃ পূঃ ২৫০) এবং Alexander Aetolus (আঃ খৃঃ পূঃ ২৮০) যাঁকে টলেমি ফিলাডেলফাস গ্রীক ট্রাজেডি ও স্যাটায়ার নাটকগুলিকে গ্রন্থাগারে সুবিন্যস্ত করে রাখার দায়িত্ব দেন, কেননা তিনি ছিলেন সে যুগের খ্যাতিমান ট্রাজেডি লেখক।

এই সব নামের তালিকাকে আর দীর্ঘ না করলেও বোঝা যায় যে আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ন ও গ্রন্থাগার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন, গবেষণা ও শিক্ষণে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করে। সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের প্রকৃত ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলেকজান্দ্রিয়া যে দিক নির্দেশ করে যায়, আজও সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের লক্ষ্য সেই নির্দিষ্ট পথে—জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও কলার চর্চা, গবেষণা, শিক্ষণ ও চিত্ত বিনোদন। জ্ঞান লিপ্সুর কাছে জ্ঞান ও রসিকের কাছে রস নিবেদনই সংগ্রহশালার

মূল কাজ। অবশ্য কাজে-কর্মে জ্ঞান ও আনন্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অধিকতর জনসাধারণের কাছে এই জ্ঞান ও আনন্দ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে আধুনিক সংগ্রহশালাগুলি আরও বেশি করে সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে চাইছে।

গ্রীক শক্তির অবক্ষয়ের ফলে ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে রোমের অভ্যুদয় হয় এবং রোমের সেনাপতি ও সম্রাটেরা, যে যখন গ্রীসের নগর ও দ্বীপগুলি আক্রমণ ও দখল করেছেন তখনই সেখানকার পুঁথিপত্তর ও শিল্প-সামগ্রীসহ, সকল সম্পদ লুন্ঠন করে এনেছেন। এইভাবে ধীরে ধীরে রোমের সেনাপতি, সেনেটর, সম্রাটবর্গের প্রাসাদ ও ভিলা এবং বিভিন্ন দেব মন্দির গ্রীক ও হেলেনীয় রীতির শিল্পকলা ও পুরাবস্তুর সংগ্রহ ভাণ্ডারে পরিণত হয়ে ওঠে। কোন কোন সময়ে অথবা কোন কোন ব্যক্তির জাতীয়তাবোধের প্রকাশে এইসব সংগ্রহ জাতীয় সম্পদ হিসাবে দেবমন্দির বা পাব্লিক টেজারীতে দান করা হয়েছে। আবার কোন কোন ব্যক্তি যুদ্ধে বিজিত সম্পদে নিজেদের প্রাসাদ ও ভিলা পূর্ণ করে ফেলেছেন। জাতি বা ব্যক্তির আত্মগৌরবের স্মারক হয়ে ওঠে এইসব লুণ্ঠিত সামগ্রী। অবশ্য রোমের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতির উপর আহৃত গ্রীক সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য্য। সামরিক শক্তিতে বলবান রোমের জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি ভূমি গড়ে দিয়েছিল গ্রীস। রোমের কবি হোরেসের বিখ্যাত উক্তি "পরাজিত গ্রীস বিজয়ী বন্দীদের এগিয়ে দিল"। পরাজিত গ্রীসের বন্দীরা রোমকে সংস্কৃতিতে উন্নত করে তোলে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে গ্রীসের মন্দির, মিউজিয়ন ও গ্রন্থাগারের সম্পদ ভাণ্ডার রোমের মন্দির, টেজারী, প্রাসাদ ও ভিলার সম্পদ ভাণ্ডার হয়ে উঠল —সংগ্রহশালার দেশান্তর হ'ল। এমনতো ইতিহাসে ঘটেছে বারংবার। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার মতই বলবানের করায়ত্ত হয়েছে শিল্প ও পুরা সামগ্রী—সে বল সামরিক শক্তির, সে বল অর্থের। ক্রীট, মাইসেনী, এশিয়া মাইনর, পারস্য এবং হেলেনীয় সম্পদ গ্রীসের সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করেছে। রোমের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে গ্রীসের সম্পদ। কনস্টান্টিনোপল ঐশ্বর্যে পুষ্ট হয়েছে রোমান সংগ্রহে। প্রাক রেনেশাঁ ও রেনেশাঁর যুগে গ্রীস ও রোমের পুঁথিবদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং অবহেলায় প্রায় অবলুপ্ত শিল্প ও স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের পুনরুদ্ধারের ফলে পরিপুষ্ট হ'ল ফ্লোরেন্স, মিলান সিয়েনা, ভেনিস ও রোম নগরীর গীর্জা, সমাধিগৃহ, প্লাজা প্রভৃতি। ফ্রান্স, হাপসবার্গ, স্পেনের সম্রাটেরা তাঁদের রাজগৃহ সাজিয়ে ও ভরিয়ে তুললেন ইটালী লুণ্ঠনের মাধ্যমে সোমনাথ মন্দিরের সম্পদে সজ্জিত হল গজনী। দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন গেল নাদির শাহের রাজসভায়। কোহিনূর আজ ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটমণি। তামাম ভারতের রত্ন ও ধাতব শিল্প-সম্ভার, চিত্র ও ভাস্কর্য্য, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি জড়ো করা হ'ল ইংলণ্ডের নানান সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ও মহাফেজ খানায়। আর এখন সারা পৃথিবীর পুরাবস্তু ও শিল্প পাড়ি দিচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাস্টে্র এবং প্রায়শই আইন অসিদ্ধ পথে। সামরিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক শক্তির পাদপীঠে সংস্কৃতির উন্মেষ, শিক্ষার অগ্রগতি চিত্তবিনোদনের চাহিদা ; তাই সংগ্রহশালার উদ্ভব ও বিকাশ চিরকালই উন্নত দেশে

হয়েছে। পাশাপাশি একদা উন্নত ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যময় দেশ ও জাতি অধুনা উন্নত জাতি ও দেশের সাংস্কৃতিক চাহিদা মিটিয়েছে—বিশেষত. উপভোগ্য কৃষ্টি কলার নিদর্শনের যোগানদার হিসাবে।

রোমের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। রোমান সেনাপতি মার্কাস মার্সেল্লাস (Mercus Mercellus) প্রথম গ্রীসের সাইরাকুজ (Syracuse) দ্বীপটি দখল করেন (খৃঃ পূঃ ২১২) এবং সেখানকার সকল সম্পদ লুণ্ঠণ করে নিয়ে এসে "সম্মান ও বীর্যবত্তার দেবীদ্বয়ের" (Honos and Virtus) ছোট একটি মন্দিরকে সম্প্রসারিত করলেন। এই সম্প্রসারণের কাজে তিনি গ্রীক শিল্প কলা সামগ্রীর অনন্য নিদর্শনগুলিকে মন্দির সজ্জার কাজে লাগান। খৃঃ পূঃ ১০১ সালে মারিয়াস (Marius) নামক আরেক সেনাপতি সিম্ব্রিয়ান (Cimbrian) যুদ্ধজয়ের পর, যুদ্ধে লুণ্ঠিত শিল্প সামগ্রী দিয়ে সাজালেন 'সম্মান ও বীর্যবত্তার' দেবীদ্বয়ের দ্বিতীয় মন্দির। মার্কাস মার্সেল্লাস যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে একটি মাত্র গ্লোব নিজের জন্য রেখে সকল লুণ্ঠিত সম্পদ জাতির উদ্দেশ্যে দান করেন। মারিয়াস নিজের জন্য কিছু রেখেছিলেন কিনা জানা যায় না। পাব্লিয়াস স্কিপিও (Publius Scipio) খৃঃ পূঃ ২০৭-এ যুদ্ধজয় করে চোদ্দ হাজার তিনশ বিয়াল্লিশ পাউণ্ড রূপোর বাট লুঠ করে আনেন। তার সবটুকুই পাব্লিক ট্রেজারীতে জমা করে দেন। এমনটি বেশিদিন চলেনি। ব্যক্তি স্বার্থ ও অহমিকা বোধ জাতীয় গৌরব বোধের ঊর্ধ্বে স্থান পেতে থাকল। কেননা তখন প্রজাতান্ত্রিক রোম একনায়কতন্ত্রী শাসন কবলিত হয়ে পড়েছে। কুখ্যাত স্বৈরাচারী কর্নেলিয়াস সুল্লা (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৭৮) যুদ্ধ বিগ্রহে যে পরস্ব সংগ্রহ করেন তার সবই আত্মসাৎ করে রেখে দেন নিজের প্রাসাদে। তারই পদাংক অনুসরণ করে রোমান বাগ্মী ওসাহসী আইনজ্ঞ সিসেরো, যাকে কখনওস্বাস্থ্যোদ্ধার, কখনও রাজরোষবা অভিজাতদের শত্রুতার জন্য বার বার গ্রীস ও এশিয়া মাইনরে গিয়ে বাস করতে হয়েছিল—তিনি সেসব স্থান থেকে সংগ্রহীত শিল্পসম্পদ দিয়ে তাঁর আঠারটি ভিলা ভরে ফেলেছিলেন। অবশ্য তাঁর বাগ্মিতা ও আইনে পাণ্ডিত্যের দ্বারা একাধিক অর্থবান রাজনীতিক. রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ীকে দুর্নীতি, হত্যা প্রভৃতি অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পারার পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন তাঁদের ঐশ্বর্যের অংশ। এথেন্স, ম্যাসিডোনিয়া, রোডস ও সিসিলি দ্বীপে অবস্থান কালে সিসেরো গ্রীক শিল্প ও পুরাবস্তু সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছিলেন। বাগ্মিতায় পটুত্ব অর্জনের জন্য এথেন্স ও রোডস থেকে কাব্যালংকার ও তর্কশাস্ত্র এংক্রান্ত প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের লেখা পুঁথি সংগ্রহে তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়িত পড়ার ফলে সিসরোর ভিলা লুণ্ঠিত হয় খৃঃ পূঃ ৫৮)।

জুলিয়াস সিজার (Julius Caesar: খৃঃ পূঃ ১০০—খৃঃ পূঃ ৪৪) সিসেরোর সমসাময়িক রাজনীতিক, রাজপুরুষ এবং অবশেষে সম্রাট। বাগ্মিতায় সিসেরোর পরেই ছিল তাঁর স্থান, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন তিনি। সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি একের পর এক যুদ্ধাভিযান চালান রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিমে ও উত্তরের দেশগুলিতে—ফ্রান্স, ব্রিটেন, স্পেন—গল ও ব্রিটন জাতি অধ্যুষিত

রাজ্যে। স্বভাবতই প্রচুর সম্পদ তিনি নিয়ে আসেন এই সব সফল অভিযান শেষে। কিন্তু সুল্লা বা সিসেরোর মত সেগুলি নিজ সম্পদে পরিণত করেন নি অথবা মার্সেল্লাস ও পাব্রিয়াসের ন্যায় দেবমন্দিরে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন নি। রোম নগরীতে ফোরাম হচ্ছে যেখানে লোকজন চলাচল করে, দোকান পাট, বিচারালয় আছে নগরের এমন একটি কেন্দ্রস্থলে তৈরী মুক্ত মঞ্চ। এই মঞ্চে সকাল বেলা রাজনীতিকেরা এসে জড়ো হতেন ; এখানে বিচার বসত ; টাকার লেনদেন চলত ; এরই আশে পাশে দোকান পাটে কেনা বেচা ও মন্দিরে পূজা পার্বণ হত। নগরীর কর্মব্যস্ত কেন্দ্রস্থল, জনগণের ফোরামের আশে পাশে রোম্ সম্রাটেরা নিজেদের পৃথক পৃথক ফোরাম নির্মাণ করান। জুলিয়াস খৃঃ পূঃ ৪৬ সালে প্রথম এ জাতীয় জাঁকজমক পূর্ণ রাজকীয় ফোরাম নির্মাণ করলেন। তার পরে অগস্টাস, ভেস্পাসিয়ান নার্ভা এবং ট্রজন এরকম ফোরাম তৈরী করালেন। এই সব রাজকীয় ফোরামে থাকত নানা দেবদেবীর মন্দির ও তাঁদের নামে উৎসর্গীকৃত নানা বিচিত্র ধরণের শিল্প ও বিলাস দ্রব্য, যা, রাজকীয় ঐশ্বর্য্য এবং সেই ধারায় বংশ গৌরবকে লোক চক্ষে তুলে ধরত। পর্বতের চূড়োয় অবস্থিত মন্দির ; শহরতলী বা গ্রামে অবস্থিত ভিলা এবং নগরীর অভিজাত বর্গের স্ব স্ব প্রাসাদে সম্পদ আবদ্ধ সংগ্রহ না হয়ে এই জাতীয় ফোরামের মাধ্যমে প্রদর্শিত শিল্প ও অন্যান্য স্মারক সংগ্রহ লোকচক্ষুর সামনে উপস্থাপিত হল। সংগ্রহশালার অবস্থান এমন স্থানে হওয়া উচিত যেখানে স্বাভাবিক কারণে জন সমাগম ঘটে এ রকম ধারণাকে আমরা আধুনিক মনে করে থাকলেও, আসলে তা প্রাচীন রোমের ধারণার বাইরে ছিল না।

জুলিয়াস সিজার তাঁর নির্মিত ফোরামে প্রতিষ্ঠিত করলেন ভেনাস জেনেট্রিক্সের মন্দির এবং তাঁর আজীবনের সংগ্রহ এই মন্দিরে উৎসর্শ বরে দিলেন। এবার আলোচনা করা দরকার যে এত দেব দেবী থাকতে জুলিয়াস সিজার ভেনাস জেনেট্রিক্সের (Venus Genetrix) মন্দিরে শিল্পবস্তু রাখতে গেলেন কেন। ভেনাস ল্যাটিন দেবতত্ত্ব অনুসারে মূলত বসন্তের দেবী, পুষ্পোদ্যান ও আঙ্গুর ক্ষেতের অধিষ্ঠাত্রী। সাধারণত যাঁরা বাগান ও আঙ্গুরের ক্ষেত অথবা পশুপালন করত, ভেনাস ছিলেন তাঁদের পূজ্যা। গ্রীক দেবী অ্যাফ্রোডাইটের সঙ্গে আঙ্গুর ক্ষেত ও সুরার সংযোগ থাকায় ভেনাস হয়ে পড়লেন গ্রীক অ্যাফ্রোডাইটের সমগোত্রীয়। অ্যাফ্রোডাইট গ্রীকদের ধারণায় সৌন্দর্য্যের দেবী। ফলে ল্যাটিন ভেনাস হলেন রোমানদের চোখে সৌন্দর্য্যের দেবী এবং ভাল বাসারও। ভেনাস বসন্তের দেবী বাসন্তী বা সৌন্দর্য্য ও প্রেমের রতি বলে সিজারের পূজনীয় হননি। ভেনাস আবার ল্যাটিন তথা রোমান জাতির জননী কেননা তাঁর পুত্র ঈনিয়াস (Aeneas) থেকে রোমাণদের উদ্ভব। ঈনিয়াসের পুত্র জুলী (Julii)। সেই কারণে, বিশেষ করে জুলী জেনেট্রিক্স বা জুলি গোত্রের রোমানরা ভেনাসকে তাঁদের মাতৃদেবী বলে মনে করতেন। এখন বোঝা যাচ্ছে জুলিয়াস সিজার যিনি জুলী গোত্রের রোমান, তিনি কেন ভেনাসের মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন এবং কেনই বা তাঁর

সারা জীবনের শৌর্য বীর্যের স্মারক ও সম্পদ ভেনাস জেনেট্রিক্সের মন্দিরে গচ্ছিত রাখেন। এও এক ধরণের মাতৃপূজা, বংশ গৌরবকে উজ্জ্বল করে তোলার প্রচেষ্টা এবং জন্ম কৌলীন্যকে লোক চক্ষে তুলে ধরা। প্রজাতান্ত্রিক রোমের জাতি গৌরব স্বৈরাচারীদের সময়ে ব্যক্তি গৌরবে পরিণত হয়েছিল এবং অবশেষে সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় সম্রাটের জন্ম কৌলিন্য ও বংশ মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হল স্বগোত্রীয় দেবীর মন্দির এবং তৎসংলগ্ন সংগ্রহশালা। অবশ্য সাধারণের দৃষ্টি গোচরে রাখা সিজারের সংগ্রহ বেশিদিন সেভাবে থাকেনি। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে ঐ সংগ্রহ বিভিন্ন ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। তবুও তার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে আসিনিয়াস পল্লিও (Asinius Pollio) তার সংগ্রহ নিজগৃহে রাখলেও, অনেকে যাতে সেই সংগ্রহ দেখার সুযোগ পায় সে রকম ইচ্ছা প্রকাশ করে যান। একই ভাবে সম্রাট আগস্টাসের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ২৭—) জেনারেল অ্যাগ্রিপ্পা (Marcus Vlspanius Agrippa) নিজের সংগ্রহশালা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন এবং যাঁরা তাদের সে সব সংগ্রহের দ্বার সকলের জন্য খুলে দেবার আহ্বান জানালেন। তার অনুরোধে তিনি বলেন যে শ্রেষ্ঠ শিল্প বস্তু রাষ্ট্রের সম্পদ, জনগণের সম্পদ. যারা সেই শিল্প সৌন্দর্য্যের আস্বাদ নিতে চান তাদের সকল সম্পদ। অ্যাগ্রিপ্পা (খৃঃ পূঃ ১২) ছিলেন সম্রাট অগাস্টাস অক্টাভিয়ানাসের (Augustus Octavianus) জামাতা, বন্ধু ও মন্ত্রী। অগাষ্টাসের নির্দেশে তাঁর তদারকিতে রোমান সাম্রাজ্যের জরিপের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই কার্য্যের সূত্রে তাকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়েছিল এবং ভূগোল সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সে সবের সঙ্গে তিনি সংগ্রহ করেন বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প সম্ভার। সংগৃহীত ভৌগোলিক তথ্য ও পুঁথির সাহায্যে তিনি পৃথিবীর বৃত্তাকার মানচিত্র তৈরী করেন। অগাস্টাস সেই মানচিত্র একটি বিশালায়াতন মার্বেল পাথরে খোদাই করান এবং অ্যাগ্রিপ্পার ভগ্নী যে কলোনেড তৈরী করান, সেখানে সকলের ব্যবহারের জন্য, সেই শ্বেত পাথরে খোদিত মানচিত্রটি রাখা হয়। অ্যাগ্রিপ্পার লেখা ভূগোল ও মানচিত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ Chorographia, সম্রাটের নির্দেশে প্রকাশিত হয়। অ্যাগ্রিপ্পা সঠিক ভাবেই ছিলেন মানচিত্র ও জরিপ বিদ্যার জনক। অবশ্য আমরা জানিনা তার শিল্প সংগ্রহের মধ্যে জরিপ কালীন সংগ্রহ করা কোনও কিছু ছিল কি ছিল না ? জানা গেলে বোঝা যেত অ্যাগ্রিপ্পার সংগ্রহ পৃথিবীর প্রাচীনতম ভৌগোলিক বস্তু সংগ্রহ কিনা। শ্রেষ্ঠ শিল্প রাষ্ট্রের, জনগণের, যারা তার রসাস্বাদন করতে জানেন তেমন সকল মানুষের সম্পদ, দুহাজার বছর আগের এই কথা কটি কি বিংশ শতাব্দীর সকল ধনিক, বণিক, রাজনীতিক বলতে পারেন ?

গ্রীসের সঙ্গে রোমের সামরিক সংঘর্ষের প্রথম অবস্থা থেকেই রোমের সেনাপতিরা এবং রোম-শাসিত গ্রীসের রোমান গভর্নর ও প্রাদেশিক শাসন কর্তারা জাহাজের পর জাহাজ ভর্ত্তি করে গ্রীক ও হেলেনীয় পাথর ও মাটির মূর্তি প্রভৃতি শিল্পকলা

হল গ্রীক শিল্পীদের এবং তাদের দিয়ে তৈরী করান হল অনুকৃত মূর্তি-ভাস্কর্য। স্বভাবতই গ্রীক শিল্প ও পুরা বস্তুর প্রতি কৃষ্টিতে উন্নতিকামী রোমানদের আকর্ষণ, রোম প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকে এবং রোমান সম্রাট শাসনকালে, রোমের শিল্প কলার. উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প সংস্কৃতি সংশিলষ্ট নিদর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধীয় পুঁথি-পুস্তক এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরের মধ্যে দিয়ে এই ভাবেই গ্রাহক দেশের শিল্প সাহিত্য. জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভাবিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে এবং উভয় দেশের সভ্যতার সম্মিলন নবতর কৃষ্টির উদ্ভব ঘটিয়েছে। দেশ বিদেশ থেকে সংগৃহীত ভাণ্ডারের এ এক অদৃশ্য. আপাত অননুভব্য অবদান।

ল্যাটিন জাতিগোষ্ঠি রোমে আসার আগে ইতালীতে বাস করত ইট্রাস্কন জাতি-গোষ্ঠি। তাঁরা তাদের সমাধি মন্দির সাজাত বর্ণাঢ্য দেওয়াল চিত্রে। জীবনে উপভোগ্য নানা ধরণের ঘটনার ও উপকরণের চিত্রিত জগৎ তৈরী করে দেওয়া হত সেই সব সমাধি ভূমিতে। রোমানরা আত্মীয় পরিজনকে সমাধিস্থ করার আগে শবদেহের শেষকৃত্য করতেন নিজ নিজ গৃহের ইট্রিয়াম বা অঙ্গনাকৃতি হল ঘরে এবং সেই হল ঘরটিতে সাজান থাকত মৃত পূর্ব পুরুষের প্রতিকৃতি—ভাস্কর্য। ইট্রাস্কন সমাধি চিত্র-শালা রোমানদের মৃত পুরুষের প্রতিকৃতি বীথিকা বা গ্যালারীতে পরিণতি লাভ করে। রোমান রাজপুরুষ, বণিক, ধনিকদের ইট্রিয়ামগুলি ছিল একেকটি প্রতিকৃতি গ্যালারী এবং প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে. সে কারণ. রোমান শিল্প ছিল অনন্য।

সমাধিগৃহে সংগ্রহ ভাণ্ডার সাজিয়ে দেবার রীতি সেই প্রস্তর যুগ থেকে চলে আসছে। পশ্চিম ইওরোপের নিয়নডারথাল নামক আদিম মানবগোষ্ঠির সমাধি গুহায় শবের কঙ্কালের পাশে পাওয়া গেছে প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র, মাটির তৈরী মাতৃ দেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি। মিশরের সমাধি মন্দির ও ছোট বড় সকল পিরামিডের অভ্যন্তরে সমাধি কক্ষকে অসাধারণ দেওয়াল চিত্র দিয়ে সাজান হত এবং সেখানে সাজিয়ে দেওয়া হয় সোনা, রত্ন, প্রস্তর. মৃত্তিকা, কাঠ প্রভৃতি উপাদানে তৈরী মৃতের ব্যবহারের জন্য কত না উপকরণ। তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষ যখন উন্মোচিত হল তখন প্রত্নতাত্ত্বি-কেরা বিস্ময় বিহ্বল চোখে তাকিয়ে দেখলেন এক অভাবনীয় সংগ্রহশালা, সব মিলিয়ে সে যেন এক মিউজিয়মের পিরিয়ড রুম বা একটি বিশেষ যুগ ও জীবন প্রতিফলিত হয় এমন একটি প্রদর্শন কক্ষ। বুদ্ধের পূতাস্থি বা অন্য কোনও স্মারক চিহ্ন প্রোথিত সাঁচী. ভারহুত. অমরাবতী প্রভৃতি স্তূপগুলিতে খোদিত বুদ্ধ জীবনী ও জাতক কাহিনী দেখতে কি মনে হয় না যেন কোনও মুক্তাঙ্গন চিত্রশালা দেখছি? খৃষ্টান সাধু সন্তদের সমাধি মন্দিরের মোজাইকের জ্যামিতিক অলংকরণ, চিত্র ভাস্কর্য্যে প্রতীকী আধ্যাত্মানুভূতি. হাতীর দাঁত. এনামেল ও ধাতু নির্মিত নানান উপকরণের বাহুল্য ও জাঁকজমক দেখে কি মনে হন না সে গুলি একেকটি অভগ্ন ও জীবন্ত সংগ্রহশালা?

সংগ্রহশালা কি শুধু নগর, জনবসতি, বন্দর, মন্দির, প্রাসাদ দুর্গ, সমাধিগৃহ থেকে সংগৃহীত স্থান ও পরিবেশ বিচ্ছিন্ন শিল্প ও প্রত্ন বস্তুর প্রদর্শন মাত্র?

বর্তমানের সর্বগ্রাসী চাহিদার হাত থেকে বাঁচিয়ে অষ্টাদশ শতকের পুরো একটি শহরকে অটুট রেখে নগর মিউজিয়ম করা হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত উইলিয়ামসবার্গ শহরটিকে।

আবারও ফিরে আসি ইতিহাসের স্মৃতি কথায়। মোটামুটি চতুর্থ শতকে রোম সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ও গথ-ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। ইতিমধ্যে খৃষ্টান গীর্জা গোপনে গোপনে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে যেতে থাকে। নোতুন ধর্মাদর্শের আক্রমণের বস্তু রোমের বহু দেবতাবাদ ও দেব-দেবীর মূর্ত্তরূপ। খৃষ্ট ধর্মে ঈশ্বর এক ও ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। যেমন সম্রাট কনস্টানটাইন (Constantine) খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করায় বহু রোমান দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরের দিন শেষ হয়ে গেল। কৃচ্ছ্রতায় বিশ্বাসী প্রথম যুগের খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের প্রবণতাও কমে এল। রোম থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হল রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব বিভাগে অবস্থিত নোতুন রাজধানী বাইজানটিয়ামে ; কেননা সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের দেশগুলিতেই খৃষ্টীয় চার্চের প্রভাব ছিল বেশি। সম্রাট কনস্টানটাইন প্রতিষ্ঠিত এই রাজধানীর নাম হ'ল কনস্টান্টিনোপল (৩৩০ খৃঃ)। সাম্রাজের নাম হল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। খৃষ্টান ধর্ম মূর্ত্তি বিরোধী, বহু দেবতা বিরোধী, জাঁকজমক বিরোধী। স্বভাবতই শিল্প ও উপকরণ সংগ্রহের কেন্দ্র হল চার্চ ও রাজ প্রাসাদ, সংগ্রহের চরিত্র হল প্রতিমা প্রতিকৃতিহীন আলংকারিক উপকরণ। সম্রাট জাস্টিনিয়ন Justinian -এর রাজত্বকালে বাইজান্টাইন সংস্কৃতির সর্বাধিক স্ফুরণ দেখা গেল। এর পর আর এক নোতুন সংস্কৃতির ধারার উন্মেষ হয় পার্শ্ববর্তী পূর্বাঞ্চলে আরব ও ইরানে – ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসারে। ইসলাম ধর্মও ছিল মূর্তি বিধ্বংসী। তাই সে ধর্মকে ভিত্তি করে যে জীবন যাত্রা ও কৃষ্টি গড়ে ওঠে তার মৌলিক শিল্প রূপ আলংকারিক বর্ণাঢ্যতায় সীমাবদ্ধ। ফলে এই যুগে যুক্তি, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও ঐহিক কৃষ্টির স্থান অধিকার করল অন্ধবিশ্বাস, আকুল ভক্তি, একেশ্বর মুখীন শাস্ত্রীয় বিধান ও অনুষ্ঠান।

চারু শিল্প হয়ে উঠল কারুশিল্প এবং ধর্মের বাহক ও উপকরণ। ধর্মবিরোধী পুরাতনকে ধ্বংস করা হলো নোতুনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বড়বড় মূর্ত্তির স্থান নিল হাতীর দাঁত ও এনামেলের ছোট ছোট ফলক—খোদাই ও চিত্রন। ধর্মগ্রন্থের প্রতি গভীর অনুরাগের ফলে বাইবেল ও কোরানের পাতায় চাপল স্বর্ণোজ্জ্বলতা ও বর্ণময়তা – সম্রাট, যাজক, রাজপুরুষদের পোষাকে জমকালো পূর্বদেশীয় রেশম ও জরির কাজ, জড়োয়া অলংকার, মীনে করা মিনিয়েচর, রত্নরাজি ও নানা গড়নের তৈজসপত্র। কনস্টান্টিনোপলের সান্তা সোফিয়া গীর্জার সংগ্রহ ভবে উঠল এরকম নানান ধরনের উপকরণ সম্ভারে। মূর্ত্তি বিরোধিতার প্রবণতা কমে এল ৮২৪ খৃষ্টাব্দের পর। অতঃপর প্রথম বেসিল (Basil, ৮৬৭ খৃঃ) ও তাঁর উত্তরাধিকারদের সময় ধীরে ধীরে অপোষ করে বলা হল "...If God is to be painted after all not only in

innocenee and Majesty but in common place and degradation of earthly life ..". পশ্চিম বাইজাণ্টাইন সামাজ্যের কেন্দ্রস্থল রোমে রূপময়তা ও সামগ্রী প্রীতির প্রাচীন ধারাটি খুব বেশি অবরুদ্ধ হয়নি। তাই রোমের গীর্জাগুলিকে কেন্দ্র করে প্রাচীনতর শিল্পসামগ্রী, কিছু কিছু, অবলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে গেল, যদিও নতুন গীর্জা ও প্রাসাদ নির্মাণের প্রয়োজনে রোমান কলোসিয়াম, মন্দির, প্রাসাদ বিনা দ্বিধায় ভেঙ্গে আনা হয়েছিল। কলোসিয়ামের ধাতুপাত্রগুলি খুলে গথ সৈনিকেরা বর্শার ফলা তৈরী করতে লাগল। বিজাতীয় বিরাগে বৈদগ্ধ ও শিল্পানুরাগ বিসর্জিত হলে সংগ্রহশালা গড়ে ওঠেনা, যতদিন না পর্যন্ত ভ্যাণ্ডালের ভ্যাণ্ডালিজম্ (ধ্বংস প্রবণতা) প্রশমিত হচ্ছে। ইতিহাসে কৃষি ও কৃষ্টির উর্বরতায় যারা আত্মপ্রত্যয়ী নয় তারাই বর্বর। জীবনের যে মতাদর্শ সৃষ্টিকে উৎসাহিত না করে সৃষ্ট কৃষ্টি ভেঙ্গে ফেলতে চায় তাই ভ্যাণ্ডালিজম্ এবং এ জাতীয় বর্বরতা শিল্প, কলা, কৃষ্টি, জ্ঞান-ও বিজ্ঞানের বিরোধী শক্তি। যে যুগে এ শক্তির দাপট বেড়েছে সে যুগে সংগ্রহশালার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। বাহ্য ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত হয়েছে এমন জাতি গোষ্ঠির রাজসভার, দরবার, কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতি বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি। ইওরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি কারী গথ জাতির শাখা ভিসিগথ গোষ্ঠির রাজা লিউভিজিল্ড (Leuvigild) যখন রাজবেশে সিংহাসনে বসতেন তখন তাঁর চার পাশ আলো করে থাকত অতুল ঐশ্বর্য সম্ভার (৫৬৮ খৃঃ); সে ঐশ্বর্য্য ছিল কৃষ্টিহীন ধনাঢ্যতা মাত্র।

সে যাই হোক, আদি মধ্যযুগে (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ থেকে খৃষ্টীয় ১৩শ শতক পর্য্যন্ত) অলংকৃত ও চিত্রিত পুঁথি, হাতীর দাঁতের ফলক, স্বর্ণালংকার, ধাতুপাত্র, মীনে করা কাজ, জড়োয়ার কাজ, সিল্কের পোষাক-আসাক, কাঠের আসবাব, দামী রত্নরাজি এবং বিশেষ করে আলংকারিক ও মূর্ত্ত মোজাইক চিত্রের কাজ প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত ছোটো বড় গীর্জা এবং দুই রাজধানীর রাজ প্রাসাদ থেকে শুরু করে স্থানীয় রাজা ও শাসকদের প্রাসাদ সালংকৃত হয়ে উঠল। ফলে সমগ্র ইওরোপ, মধ্য এশিয়া ও রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গীর্জা ও রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে বহু স্থানীয় সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার ভিত্তি ভূমি তৈরী হয়ে থাকল। গ্রীক ও রোমান যুগে যা ছিল ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, তাই ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ইওরোপে পূর্ব ও মধ্য এশিয়ায়। গীর্জাকে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং রাজা, ভূস্বামী, প্রাদেশিক শাসক ও সম্রাটদের ঐশ্বর্য্যময় বিলাস বহুল জীবন যাপনের প্রবণতা কলা ও কৃষ্টিকে নবরীতিতে নোতুন নোতুন স্থানে বিকশিত ও সংগৃহীত হবার সুযোগ করে দিল এই আদি মধ্যযুগ।

যারা ভাঙ্গে তারা পর-ধর্মের কীর্তি ভাঙতে ভাঙতে নিজ কীর্তিও ভাঙ্গে। নবম-দ্বাদশ শতকে কনস্টাণ্টিনোপলের সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় গীর্জা সান্তা সোফিয়ায় (আরেক নাম হাগিয়া সোফিয়া) বাইজাণ্টাইন সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের প্রতিকৃতি মোজাইক চিত্রে স্থান পেতে থাকে। রোমের ফোরামে যেমন রোম সম্রাটদের মার্বেলে খোদিত প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হত সেই রকম সান্তা সোফিয়া গীর্জার গ্যালারীতে মোজাইক

প্রতিকৃতি দেখা যায় বাইজান্টাইন সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের। আধুনিক পোর্ট্রেট গ্যালারীর নামান্তর মাত্র। হলে কি হবে, পরবর্ত্তী সম্রাট পূর্ববর্ত্তী সম্রাটের প্রতিকৃতির মাথাটুকু সরিয়ে দিয়ে নিজের মুখের প্রতিকৃতি সেখানে বসিয়ে দিতে দ্বিধাগ্রস্থ হননি। ধরা যাক সম্রাজ্ঞী জো (Zoe)-এর বিচিত্র কীর্তি কাহিনী। সান্তা সোফিয়ার দক্ষিণ গ্যালারীতে একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে খৃষ্টের দুপাশে সম্রাজ্ঞী জো ও তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্বামী কনস্টানটাইন মোনোম্যাকাস বা দ্বিতীয় কনস্টানটাইন। লিপি থেকে জানা যায় সম্রাটের প্রতিকৃতিটি মূলত সাম্রজ্ঞী জো-এর দ্বিতীয়পক্ষের স্বামী সম্রাট তৃতীয় রোমানোসের যার মৃত্যুর পর মহারানী মহোদয়া পরবর্ত্তী সম্রাটের অংকশায়িনী হন এবং ঐ চিত্রে সম্রাজ্ঞীর তৃতীয় স্বামী প্রতীকী অর্থে তার দ্বিতীয় স্বামীর মুণ্ডোচ্ছেদ করে সেখানে নিজের মুখের প্রতিকৃতি বসিয়ে দেন। উলুখাগড়ার প্রাণ কত যে গেছে জানা নেই, তবে রাজায় রাজায় ঐ যুদ্ধে চিত্র থেকে নিহত রাজার মুণ্ডু সরে গেল। আচ্ছা, কোলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসক, সেনাপতি প্রভৃতির প্রমাণ আয়তনের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিগুলো সরিয়ে গুদামে ফেলে না রেখে দিশী হোমড়া চোমড়াদের মুখের প্রতিকৃতি বিদেশী মুখের বদলে লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? ইতিহাস তো বিরোধ ও সমন্বয়ের পথ ধরেই এগোয়। তবে এতে আপত্তির কি আছে? আর সংগ্রহশালা? সেতো সকল বিরোধ, সকল সমন্বয়ের সহাবস্থানের ক্ষেত্র। ঠিক এই মুহূর্ত্তে মনে পড়ছে অজন্তার একটি গুহাচিত্র। চিত্রটিতে দেখান হচ্ছে এক রাজবেশী পুরুষ তার উদ্ধত তারবারি তুলে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়া এক নারীর মুণ্ডোচ্ছেদে উদ্যত। হায়রে! কালের কুটিল গতিতে পদ লুন্ঠিতা নারীর মস্তক অটুট আছে - নেই সেই উদ্ধত অসি হস্তে আসীন রাজার মুন্ডটি। এমনও হতে পারে কোনও দর্শক ভ্যান্ডাল এই কুকর্মটি করে গেছেন। হয়ত বা তিনি এক অজ্ঞাত কুলশীল উইমেন লিবার, নারী মুক্তির প্রবক্তা। আর একটি ঘটনার কথা বলি। উত্তর প্রদেশের একটি মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুণ্ডেশ্বরী অর্থাৎ মুণ্ডের ঈশ্বর (মুণ্ড রক্ষাকারিনী ?)। মুন্ডেশ্বরী মন্দিরে সব মূর্তিই প্রায় অটুট, নেই শুধু কটি দ্বার রক্ষীর বা প্রতিহারী-প্রতিহারিনীর মুন্ড। কে বা কারা সেই মুন্ডগুলি কেটে নিয়ে গেছেন বছর পনের আগে। মুন্ডেশ্বরীর দ্বাররক্ষী আজ মুন্ডহীন। না দেবতা না সম্রাট কারও শক্তিই ত্রিকাল জয়ী নয়। তবে কেউ কেউ মিউজিয়মে স্থান পেয়ে সম্পূর্ণ অবলুপ্তির হাত থেকে আরও বেশ কিছুকাল রক্ষা পান।

এবার মন্দির সংলগ্ন একটি দূর প্রাচ্যের অনন্য সংগ্রহশালার কথা উল্লখ করি। কেননা ঐ সংগ্রহ ভান্ডারটি ব্যাবিলনের নন্নর মন্দির সংলগ্ন বিহার-স্থিত পুরাস্থানীয় সংগ্রহ শালার মত অত ছোট বা বহু বিচিত্র দেশ দেশান্তরের উন্নতমানের শিল্প সামগ্রীহীন নয়। সময় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ। জাপানে তখন মাত্র দুশ বছর হল বৌদ্ধ ধর্মের সামান্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কোরিয়ার পায়কচে (Paekche) রাজ্য থেকে একটি বুদ্ধ মূর্ত্তিসহ কিছু বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠান হয়েছে যমাটো (Yamato) রাজসভায়। জাপানে তখন

শিন্টো (Shinto) ধর্ম, যার অর্থ ভাগবত পন্থা, প্রচলিত। আদিম দেবদেবী এবং প্রাকৃতিক শক্তির পূজা ও মৃত পূর্বপুরুষের অর্চনা এই নিয়ে শিন্টো ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান। ছোট-খাট মন্দির ও সমাধি মন্দিরে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান রাজকীয় ও রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাকে ঠিক রূপ দিতে পারে না। প্রতিবেশী কোরিয়া তখন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মে অনেক উন্নত। চীনের সঙ্গে সরাসরি যোগ না থাকলেও চীনের উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, দর্শন ও শিল্পকলার ছিটেফোঁটা কোরিয়া হয়ে আসছে জাপানে—যেমন এল বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধগ্রন্থ ৫৫২ খৃষ্টাব্দে। রাজসভায় বহুদিন তর্ক বিতর্ক হল নোতুন ধর্মমত নিয়ে এবং অবশেষে রাজ পুরুষেরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। নাবালক রাজকুমারের রাজ প্রতিনিধি শোতোকু তাইশি (Shotoku Taishi) ৬০৭ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন জাপানী ভিক্ষুকে চীনে পাঠানো ঠিক করলেন এবং চীন থেকে শিল্পী নিয়ে এলেন। একই বছরে তিনি হোরয়ু-জি (Horyuji) মন্দির স্থাপন করে বৌদ্ধ শাস্ত্র পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করে দিলেন। যে শিল্পী ঐ মন্দিরের শাক্যমুনির কোন্দো (Kondo) মূর্ত্তি রচনা করেন তাঁকে রাজকীয় সম্মান ও জমিদারী দান করা হল। শুধু উন্নত রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা নয়, শুধু উন্নত ধর্মপথ নয়, উন্নত মানের শিল্পের সমাদর একটি জাতির সাংস্কৃতিক তৃষ্ণার পরিচয় দেয়।

আসুকা (Asuka) থেকে নারাতে (Nara) রাজধানী স্থানান্তরিত করার ফলে (৭১০ খৃঃ) নোতুন রাজধানীর স্থাপত্যে চৈনিক শিল্পের (তাং সংস্কৃতির) প্রভাব পড়ল। এই সময় মূল চীনের রাজবংশ জাপানের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের জন্য রাজদূত পাঠালেন। এরকম একটি দূত-বাহিনীর সঙ্গে চীনের বহুজন বন্দিত ভিক্ষু চিয়েন চেন (Chien chien ঃ জাপানী ভাষায় গনজিন) জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইচ্ছায় আসতে গিয়ে সমুদ্র যাত্রার ধকলে বারবার ব্যর্থ হয়ে যখন জাপানের নারায় পৌঁছলেন (খৃঃ ৭৫৪), তখন তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে নারায় নবনির্মিত তোদাই-জি মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের আসনে অধিষ্ঠিত করা হল। সেই সৌম্য, বৃদ্ধ ও অন্ধ ভিক্ষুর শুষ্ক লাক্ষায় তৈরী প্রতিমূর্ত্তি (৭৫৪ খৃঃ) আজও তোদাই-জি মন্দিরে আছে। এত উন্নতমানের প্রতিকৃতি শিল্প জগতে দুর্লভ। দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষান্তে জাপানে আগত ও দুঃসহ সমুদ্র যাত্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়া ভিক্ষু, যিনি নারার তোদাই জি-মন্দিরে তথাগতের সেবায় সমর্পিত প্রাণ আর প্রাচ্যের বহু বিচিত্র শিল্প সৌন্দর্য্যে যে সম্রাট তাঁর রাজধানী পূর্ণ করে তুলেছেন সেই শোমুর (Shomu) সদ্য বিধবা শোক সন্তপ্তা সম্রাজ্ঞী, দুয়ের মানসিকতা তখন ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি শাক্যমুণির শরণাভিলাষী। সম্রাজ্ঞী নির্দ্বিধায় প্রাসাদের সকল শিল্পসামগ্রী উৎসর্গ করে দিলেন দেবতার নামে। তোদাই-জি মন্দির সংলগ্ন করে স্থাপিত হল শোসো ইন সংগ্রহ ভান্ডার (৭৬০ খৃঃ)। যেখানে সাজিয়ে রাখা হল চীন, কোরিয়া, মধ্যএশিয়া ও পারস্য থেকে সংগৃহীত এবং স্বদেশে দিশী ও বিদেশী শিল্পী দ্বারা নির্মিত কত না শিল্প ও কারু সামগ্রী—আসবাব, তৈজস পত্র, বসন, ভূষণ, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি,

সম্রাটের যাবতীয় সামগ্রী-সম্পদ। আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণায় জীবনের বিষণ্ণতা ও শোকের উত্তরণ হল এক অনন্য সুন্দর স্মৃতি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠায়—আজ থেকে বারশ বছর আগে বিশ্বের প্রথম শিল্প ও কারু সংগ্রহশালা, প্রথম ব্যক্তি আশ্রয়ী সংগ্রহশালা এবং পৃথিবীর প্রথম যুগ পরিচায়ক সংগ্রহশালা।

রোমের ভ্যাটিকান চার্চকে কেন্দ্র করে সেখানে ষোড়শ শতক থেকে গত শতক পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দর্শনীয় সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জনসাধারণের কাছে বিশেষ করে পর্যটকদের কাছে সেগুলি খুবই আকর্ষণীয়। ভ্যাটিকান গীর্জার সংগ্রহশালাগুলিকে একত্রে পণ্টিফিকাল মিউজিয়মস্ এণ্ড গ্যালারীজ্ (Pontifical Museums and Galleries) বলা হয়। এই সংগ্রহশালাগুচ্ছ পৃথিবীর বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসংগ্রহগুলির মধ্যে অন্যতম। এইসব সংগ্রহ যে সব অট্টালিকায় সাজান আছে সেগুলিও স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও দেওয়াল চিত্র কলায় সমৃদ্ধ এবং খৃষ্টান রোমন ক্যাথলিক্ ভাবাদর্শের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ইউরোপের নবজাগৃতি বা রেনেশাঁ-কালীন শিল্পকলার বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন এইসব যাজকীয় প্রাসাদ ও তন্মধ্যস্থ প্রদর্শসমূহে রক্ষিত আছে।

ভ্যাটিকানে সংগ্রহশালা গড়ে তোলার আদিপুরুষটি হলেন পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস (১৫০৩—১৫১৩ খৃঃ)। তিনি গ্রীক ও রোম সভ্যতার সময়কার বিভিন্ন ক্ল্যাসিক্যাল বা মার্গীয় রীতির ভাস্কর্য্য বেলেভেডিয়ার প্যাভেলিয়ানে (Belvedere Pavillion) এনে রাখলেন। রেনেশাঁ শিল্পরীতির প্রেরণা স্বরূপ মূর্তিগুলি দিয়ে সাজান এই প্যাভিলয়নে এই যাজকীয় সংগ্রহশালার উদ্বোধন হল। দ্বিতীয় জুলিয়া-সের অনুবর্ত্তী পোপ দশম লিও ছিলেন ফ্লোরেন্সের অভিজাত এবং শিল্পসাহিত্যের সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক মেডিসি (Medici) পরিবারের সন্তান। পোপ দশম লিওর (১৫১৩—১৫২১ খৃঃ) উত্তরাধিকারী হলেন ফ্লোরেন্সের ঐ মেডিসি পরিবারভুক্ত পোপ সপ্তম ক্লিমেণ্ট (১৫২৩ –১৫৩৪ খৃঃ)। এই দুজন শিল্পরসিক পোপ এমন পরিবার থেকে এসেছিলেন যাদের পারিবারিক সংগ্রহ সে যুগের শিল্পী ও শিল্পরসিক মহলে মেডিসি সংগ্রহ বলে খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং ইউরোপের অন্যতম শিল্প-কলা সংগ্রহে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের পরিবারের পৃষ্ঠ-পোষকতা পেয়েছিলেন রেনেশাঁর সকল প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী—লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল প্রভৃতি। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে এক রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরিণতিতে ফ্লোরেন্স নগরীর শাসক মেডিসিরা ফ্লেরেন্স ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ফ্লোরেন্সে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ফ্লোরেন্সের বহু খ্যাতনামা শিল্পী পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের আমন্ত্রণে রোমে গিয়ে কাজ করতে থাকেন। এই ঘটনার আবর্তে রোমের ভ্যাটিকান গীর্জার সঙ্গে শিল্পীদের এক অভাবনীয় যোগসূত্র তৈরী হল। ফ্লোরেন্সর প্রজাতন্ত্র বেশিদিন স্থায়ী হয়নি কেননা ফ্রান্সের সম্রাটের সমর্থনের উপর নির্ভরতা বড় বেশী থাকায় মেডিসিরা স্পেন ও হ্যাপসবার্গের সম্রাটদের সাহায্যে ফ্রান্সকে পরাজিত করে

১৫১২ সালে ফ্লোরেন্স পুনর্দখল করেন। এ ঘটনার এক বছরের মধ্যে মেডিসি পরিবারের প্রধান পুরুষ দশম লিও ও সপ্তম ক্লিমেণ্ট বিশ বছরের অধিককাল ধরে ভ্যাটিক্যানের পোপের পদটি দখলে রাখতে পেরেছিলেন। ফলে ভ্যাটিকানে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্ররচনায় ডাক পড়ল সে যুগের ইটালীর সকল নামী দামী শিল্পীর। পোপ তৃতীয় পল (১৫৩৪—১৫৫০ খৃঃ যোড়শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই শিল্প-পৃষ্ঠ পোষকতার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে পোপ দশম লিও, সপ্তম ক্লিমেণ্ট এবং তৃতীয় পলের বদান্যতায় যাজকীয় সংগ্রহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে মেডিসি পরিবারের বিখ্যাত পারিবারিক সংগ্রহের একটি অংশ ভ্যাটিকানে দান করা হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে পোপ চতুর্দশ ক্লিমেণ্ট ১৭৬১—১৭৭৪ খৃঃ এই সংগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলেন এবং বিপুল সংখ্যক প্রদর্শ রাখার স্থানের অভাব ঘটায় বেলভেডিয়ার প্যাভিলিয়নের গা—লাগা অষ্টকোণাকৃতি পোর্টিকোটি তৈরী করলেন। এমনকি পোপ অষ্টম ইনোসেণ্ট নির্মিত প্যাভেলিয়নের অনেকগুলি ঘরকে পরবর্ত্তী পোপ ষষ্ঠ পায়াস (১৭৭৫—১৭৯৯ খৃঃ প্রদর্শ গ্যালারীতে রূপান্তরিত করেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে এই কারণে ভ্যাটিকান সংগ্রহশালার একটি পোষাকী নাম পায়াস-ক্লিমেণ্টাইন মিউজিয়ম। ষষ্ঠ পায়াস শুধু যে পূর্ব নির্মিত কক্ষ ব্যবহার করে সংগ্রহশালার কলেবর বৃদ্ধি করেন তাই নয়, তাঁর আগ্রহে ভ্যাটিকান লাইব্রেরীর উত্তরে সংগ্রহশালার প্রসারের জন্য নোতুন প্রাসাদ তৈরী হল। পরবর্ত্তী পোপ সপ্তম পায়াস (১৮০০—১৮২৩ খৃঃ) ভ্যাটিকানের চিয়ার মোণ্টি সংগ্রহশালাটি (Chiar-monti Museum) প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ যোড়শ গ্রেগরীর সময় (১৮৩১ - ১৮৪৬ খৃঃ) ইট্রাস্কান ও মিশরীয় পুরাবস্তুর সংগ্রহশালা দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইজন্য এই সংগ্রহশালা দুটি Gregorian Museums of Etruscan and of Egyptian Antiquities নামে পরিচিত। ভ্যাটিকান চিত্রবীথি (Vatican Picture Gallery) পূর্বোক্ত বেলভেডিয়ার প্যাভেলিয়ানে ছিল, কিন্তু স্থানাভাবের জন্য পোপ একাদশ পায়াস (১৯২২ –১৯৩৯ খৃঃ) সেটিকে একটি নবনির্মিত প্রাসাদে স্থানান্তরিত করান। ভ্যাটিকানের যাজকদের বাসস্থান সংলগ্ন একটি প্রাসাদ পোপ সিক্সটাস ১৫৮৯ খৃঃ নির্মাণ করান এবং সেখানে গড়ে তোলেন ল্যাটেরান মিউজিয়ম। পরবর্ত্তীকালে ল্যাটেরান সংগ্রহ শালার মধ্যে নোতুন একটি বিভাগ খোলা হয় যার নাম ল্যাটেরান মিউজিয়ম অব খৃষ্টান অ্যাণ্টিকুইটি (Lateran Museum of Christian Antiquity)। ভ্যাটিকান সংগ্রহ শালা গড়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে মূলত ফ্লোরেন্স নগরীর আকস্মিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে ফ্লোরেন্সের শিল্পী গোষ্ঠির একটি বড় অংশের রোমে আগমন (১৪৯৪-১৫১২খৃঃ), ঐ নগরীর শাসক ও বিদগ্ধ শিল্প রসিক মেডিসি পরিবারের আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যয় ও ভাগ্যোন্মেষ এবং মেডিসি পরিবারের দুজন ব্যক্তির পোপের পদে অধিষ্ঠান এমন একটি গীর্জাকেন্দ্রিক অতি সমৃদ্ধ শিল্প ও পুরাবস্তু সংগ্রহ গড়ে ওঠার মূল কারণ। অতঃপর দীর্ঘ তিন

শতকের অধিক কাল ধরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পোপের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভ্যাটিকানে একটির পর একটি সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। রোমান ক্যাথলিকদের কেন্দ্রীয় ও প্রধান গীর্জা হওয়ায় ভ্যাটিকানের অর্থবল এবং বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন শক্তি একাধিক বিষয়ভুক্ত এতবড় একটা সংগ্রহশালা গুচ্ছের সংগ্রহ দেশ দেশান্তর থেকে সংগ্রহ করে আনা সম্ভব করেছে। ধর্মীয় সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক সুবিধা, আগ্রহী ও নিষ্ঠাবান জ্ঞানী-গুণী যাজকের মিশনারী কর্মদক্ষতা এবং ধার্মিক ভক্তদের স্বতঃ প্রণোদিত দান—এই ত্রিবেণী সংযোগ না ঘটলে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে এত উঁচুদরের ও এত বিশাল সংগ্রহশালা গুচ্ছ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

এই বিচারে ভারতের ধর্মস্থান ও মন্দির কেন্দ্রিক সংগ্রহ ভাণ্ডারগুলি অনেক ক্ষুদ্র, কম বৈচিত্র্যময় এবং নিম্নমানের। ভারতের দেবস্থানগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ভৌগোলিক সীমানা, অর্থবল, প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন শক্তি প্রভৃতি ক্যাথলিক যাজক রাষ্ট্র ভ্যাটিকানের সঙ্গে কোনমতেই তুলনীয় নয়। তবুও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে মন্দির ও দেবস্থানগুলিতে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত অমূল্য অলংকার, রত্নরাজি, ধাতু পাত্র, রত্ন-হস্তীদন্তখচিত এবং স্বর্ণরৌপ্য শোভিত ধাতু বা কাষ্ঠ নির্মিত নানা মাপের বিচিত্র সব বাহন ও সিংহাসন, কাঠের রথ, মন্দির সজ্জার চিত্রিত পট্টবস্ত্র, পূজার সাজসরঞ্জাম, রত্নখচিত পোষাক-আসাক, অস্ত্রশস্ত্র, শোভাযাত্রার বহুবিচিত্র ধ্বজা ও দণ্ড এবং নানান বাদ্যযন্ত্রের দীর্ঘ কালের যে সম্পদ সম্ভারের সংগ্রহ গড়ে উঠেছে সেগুলির নান্দনিক ও ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এই সব সংগ্রহ থেকে সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি মন্দির ও দেবস্থান সংগ্রহশালার উদ্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বর মন্দির সংলগ্ন রাজা রাজা সংগ্রহালয়; এখন এই মিউজিয়মটি সরস্বতী মহল প্রাসাদে স্থানান্তরিত হয়েছে; (২) শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী দেবস্থান মিউজিয়ম; (৩) মাদুরাই-এর মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর মন্দির সংগ্রহ—যেখানে ধাতু মূর্ত্তি ও হাতীর দাঁতের অসাধারণ কারু শিল্প আছে; (৪) রামেশ্বরমের মন্দির ভাণ্ডার যেখানে সোনা ও রূপোর নানা জিনিসের এক দর্শনীয় সংগ্রহ রয়েছে এবং (৫) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ রয়েছে তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত তিরুপতির শ্রীভেংকটেশ্বর মিউজিয়ম। গীর্জাকে অবলম্বন করে ভারতে যে কটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে পুরোণো গোয়ায় অবস্থিত সেণ্ট ফ্রান্সিস চার্চের সংগ্রহশালা এবং পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনারী পরিচালিত উইলিয়াম কেরী মিউজিয়মের পরিচিতি বেশী। মাদ্রাজ শহরের দু'একটি গীর্জায় গীর্জা-সংক্রান্ত নানান বস্তুর সংগ্রহ আছে। শ্রীরামপুর কলেজ চত্বরে অবস্থিত কেরী মিউজিয়ম দেড় শতাধিক বছরের পুরোনো (১৮১৮) এবং প্রখ্যাত মিশনারী ও শিক্ষাবিদ কেরী সাহেবের স্মৃতিবিজড়িত সামগ্রী, উনিশ শতকে প্রকাশিত দুর্লভ গ্রন্থ সমূহ এবং সেই সময়ের খৃষ্টান মিশনারীদের নানা ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নথিপত্রাদি এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এই সব বিষয়ের গবেষকদের কাছে কেরী

মিউজিয়মের গুরুত্ব থাকলেও সাধারণ দর্শক ও পর্যটকদের কাছে এটি প্রায় অপরিচিত। গোয়ার সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চের সংগ্রহশালাটি খুবই ছোট এবং সামান্য কিছু মিশনারী, চার্চ ও যাজক সংক্রান্ত সামগ্রী সেখানে রক্ষিত আছে। তবে যে সব দর্শক পুরাতন গোয়া দেখতে যান তাঁরা সকলেই এই সংগ্রহশালাটি ঘুরে দেখেন। ধর্মস্থান কেন্দ্রিক মিউজিয়ম প্রসঙ্গে হরিদ্বারের গুরুকুল মিউজিয়ম এবং অমৃতসরের সেন্ট্রাল শিখ মিউজিয়মের কথা জানান দরকার। প্রথমটিতে হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত পুঁথি ও পুরাবস্তুর সংগ্রহ রয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে শিখ ইতিহাস সংক্রান্ত নানা সামগ্রী ও শিখ চিত্রকলার নিদর্শন আছে।

মধ্যপ্রদেশের সোনাঙ্গিরে প্রাচীন জৈন পুঁথিপত্র ও চিত্র সম্বলিত একটি সংগ্রহশালা আছে—নাম দিগম্বর জৈন মিউজিয়াম।

মন্দির ও ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে গোপন ঐশ্বর্য্য-ভান্ডার গড়ে ওঠার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। গ্রীসের প্রায় সকল বিখ্যাত মন্দিরের তলায় ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষে দেবতার উদ্দেশ্যে দান করা সকল সম্পদ নিরাপত্তার কারণে রাখা থাকত। এই সব সম্পদ ভান্ডারকে বলা হত থেসারাস (Thesaurus)। এথেন্সে এই থেসারাস রাষ্ট্রের বা জনগণের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হত। সেই কারণে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধের ব্যয় সংকুলানের জন্য পেরিক্লিস যখন পার্থেনন মন্দিরের সম্পদ ভান্ডার ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন তখন তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে যুদ্ধ শেষে সরকার এই সম্পদ পুনরায় মন্দিরে ফেরত দেবে।

রোমানদের সময় বহু বিত্তশালী ও শক্তিমান রোমান সেনেটর, সামরিক প্রধান, নেতা ও রাজকর্মচারীরা তাদের গৃহে গোপন সম্পদ ভান্ডার রাখতেন এবং রোমান আইনে এ গুলিকে থেসারাস (Thessurus) বলা হত। এই থেসারাস শব্দটি থেকে ইংরাজী ট্রেজারী যার অর্থ তোষাখানা বা রাজকোষ এবং Treasure trove যার অর্থ গুপ্তধন শব্দ দুটি এসেছে। ভারতীয় আইনে এই গুপ্তধন সরকারী সম্পত্তি এবং এরকম গুপ্তধন যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে প্রাপক তাহা আইন অনুসারে সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাতে বাধ্য। ট্রেজার ট্রোভ থেকে সাধারণত প্রাচীন কালের মুদ্রা ও ধনরত্ন পাওয়া যায়। এ জাতীয় গুপ্তধন হিসাবে সংরক্ষিত বহু ট্রেজার ট্রোভ ভারতের বিভিন্নস্থানে পাওয়া গিয়েছে এবং বিভিন্ন মিউজিয়ামের মুদ্রা সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছে। সাম্প্রতিক কালে কাশ্মীরের শ্রীনগর ট্রেজারীর নীচ থেকে প্রচুর রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ একটি ট্রেজার ট্রোভ পাওয়া গেছে। ঐ সম্পদের মূল্যায়নের দায়িত্ব পেরেছেন বিশ্বের বিখ্যাত শিল্প ও পুরাবস্তুর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সাউথবি। তাঁদের বিশেষজ্ঞেরা ঐ গুপ্তধনের মূল্যায়ন করেছেন চৌদ্দশ কোটি টাকা।

রোমে গোপন সম্পদ-ভান্ডার বা থেসারাস তৈরী করা হত মাটির তলায়। এগুলি আকারে সাধারণত গোলাকার এবং ছাদ হত ভল্টেড। ইওরোপে মধ্যযুগে দুর্গের মধ্যে এরকম গুপ্তধন-ভান্ডার রাখার ব্যবস্থা ছিল। পরিবার বা ব্যক্তির কুক্ষিগত

সামগ্রী-ভাণ্ডারের মালিকদের এমন এক ধরণের মানসিকতা ছিল যার ফলে তাদের বহু মূল্যবান সামগ্রীর সংগ্রহগুলি দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। এমনকি আপাত নির্দোষ শিল্প ও প্রাকৃত বস্তু সংগ্রহগুলিও ঐ মানসিকতার জন্য ট্রেজারস বা থেসারাস বলে অভিহিত হতে থাকে। সপ্তদশ শতকে এসে দেখছি ভেনিসের ব্রাণ্ডেনবার্গের রাজপুত্রের আর্টিফিসেলিয়া ও ন্যাচারালিয়া সংগ্রহটিও থেসারাস ব্রাণ্ডেন বার্গ (Thesaurus Brandenburgicus) বলে পরিচিত হয়ে পড়েছে। যতই গোপনীয়তা থাক পরবর্ত্তীকালে হয় সরাসরি না হয় নানা ঘুরপথে—লুণ্ঠন, চুরি, স্বেচ্ছাকৃত বিক্রী প্রভৃতির মাধ্যমে এই সব গুপ্তভাণ্ডারের মূল্যবান সম্পদ, শিল্প ও কারুসামগ্রী সমর নেতা, রাষ্ট্র দূত, বিজয়ী রাজা ও ব্যবসায়ীদের হাত হয়ে মিউজিয়মে এসে পেঁৗছেছে। এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে। গুপ্ত ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে ভাণ্ডারের মালিকদের মানসিকতায় যে গোপনীয়তা বোধ ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়েছিল আজও কিন্তু অনেক মিউজিয়মের পরিচালক ও কর্মীগোষ্ঠির মধ্যে সে রকম সংগ্রহশালার সম্পদ বড় বেশি আড়াল-আবডাল করার মানসিকতা দেখা যায়। ট্রেজার ট্রোভ সামগ্রীর সঙ্গে গুপ্তধনের যক্ষ সুলভ মানসিকতাও অনেক মিউজিয়মে টিকে আছে। এই সব মিউজিয়মে অধ্যক্ষ ও তাঁর কর্মচারীরা গবেষক, ছাত্র, শিক্ষক ও দর্শকদের খোলামনে গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাদের সাহায্য করাকে তারা কর্ত্তব্য বলে মনে করতে চান না তাঁদের দায়িত্বে ন্যস্ত সংগ্রহশালা যেন তাঁদেরই সম্পত্তি এমন দুর্ভাগ্যজনক মানসিকতা এ সব সংগ্রহশালা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

গোপনীয়তার ইঙ্গিতবাহী কিছু কিছু শব্দ সংগ্রহশালার বা নানান পারিবারিক ও রাজকীয় সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। পঞ্চদশ শতকে নেপলসের রাজা আলফান সোর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাটিকে পেনিট্রেলিয়া (Penetralia) বলা হত। পেনিট্রেলিয়া বলতে প্রাসাদের এমন স্থান বোঝায় যেখানে সচরাচর কেউ প্রবেশাধিকার পায় না। ঐ একই শতকে বারগাণ্ডির ডিউক জাঁ দ্য বেরী (Jetn de Berry, Duke of Burgundy) যে স্থানে তাঁর অসাধারণ সংগ্রহটি রাখতেন তাকে বলা হত গার্ডা রোপা (Guarda Ropa) অর্থাৎ এমন একটি স্থান যেখানে সতর্ক প্রহরীর নজরদারী রাখা হত। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ইতালীর প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্প-ইতিহাস রচয়িতা জিওর্জিও ভাসারি (Giorgio Vasari) অভিজাত পরিবারের চিত্রশালা কক্ষ বোঝাতে স্ক্রিত্তোজো Scrittojo) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ এ্যান্টিচেম্বার। ঠিক একই ভাবে ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে ব্যক্তিগত সংগ্রহ রাখার ঘরটিকে বলা হত চেম্বার অব রেয়ারিটিস। চেম্বার বা এ্যান্টি চেম্বার কখনই বাহির মহলের ঘর নয়। বেডরুম বা বেডরুমের লাগোয়া ঘরগুলিকেই আভিধানিক অর্থে চেম্বার ও এ্যান্টি-চেম্বার বলে। রেয়ারিটিজ, যার অর্থ দুর্লভ বস্তু; শব্দটি নিশ্চয়ই সামগ্রীকে সবার চোখের সামনে রাখা বোঝায় না। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েলস হোয়াইট হল প্রাসাদে তাঁর চিত্র সংগ্রহটি রাখার জন্য যে ঘরটি তৈরী করান তার নামকরণ

করা হয় ক্যাবিনেট রুম, ভাবার্থে যেটি মন্ত্রণাকক্ষ, যে ঘরে সকলের আনাগোনা বারণ। ফ্রান্সে অভিজাত পরিবারে যে লম্বা কক্ষে ছবি বা অন্যান্য শিল্প সামগ্রী রাখা হত সে কক্ষটিকে অনেকেই গ্যালারী বলতেন। আদতে বাহির মহল থেকে অন্দর মহলে ঢোকার মুখের হলঘরটিকে গ্যালারী বলে। মোঘল রাজপ্রাসাদে খাস দরবার বলতে যে জাতীয় কক্ষ বোঝায় গ্যালারীর অর্থ তাই। খুব চেনা পরিচিত ছাড়া অন্য কেহ গ্যালারী অবধি যেতে পারত না। অবশ্য গ্যালারী বলতে সব সময় অন্দর মহলে প্রবেশ কক্ষ বোঝায় না। গীর্জা, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে গ্যালারী হলঘরের ভেতরের দেওয়াল থেকে বার করে আনা আর একটি তলা যেখানে সাধারণ লোক খুব একটা যেতেন না।

যে সমাজ ব্যবস্থায় বিত্তহীন ও বিত্তবানের মধ্যে ফারাক বড় বেশি এবং বিত্তবানের সংখ্যা নিতান্তই কম—এমন সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে বিত্তবানেরা বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই শ্রেয় মনে করেন। যে যুগে বিত্তবানেদের মধ্যে ক্রমাগত রাজনৈতিক সংঘাত লেগেই আছে এবং সম্পদশালী পরিবারগুলির মধ্যে নিরাপত্তা বোধ যথেষ্ট নয়, সেইকালে সম্পদকে লোকচক্ষুর, এমন কি স্বজন পরিজনের দৃষ্টির আড়ালে রাখার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। সেই কারণে মধ্যযুগে প্রায় সর্বত্রই দুর্লভ জিনিসের সংগ্রহ একটু বেশি গোপন করে রাখা হত। প্রাচীন গ্রীস বা রোমে সে জাতীয় গোপনীয়তা ছিল না।

সম্পদ, বিলাস সামগ্রী, দুর্লভবস্তু-সম্ভার, শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি একা উপভোগ করে আনন্দ নেই। এসব পাঁচজনকে দেখিয়ে নিজের আভিজাত্য, বিত্ত, সামর্থ্য এবং প্রতাপ যদি দশজনে না জানে এবং শত শত লোক তার জন্য স্তাবকতা না করে তবে সে ব্যক্তি আত্ম-শ্লাঘা বোধ করেন কি করে? তাই গোপনীয়তার পাশাপাশি দেখা যায় লোককে জানানোর জন্য সংগ্রহ গড়ে তোলার প্রয়াস। সাধারণত যথেষ্ট প্রতাপ ও প্রভাবশালী পরিবারের বা রাজপুরুষেরা আত্মমর্যাদা-বোধ, আভিজাত্য, রুচি ও আত্ম-শ্লাঘা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ জাতীয় সামগ্রী-সংগ্রহ বহু অর্থব্যয়ে গড়ে তুলতেন। তাদের সেই সংগ্রহ আত্মীয় পরিজন, অতিথি, অভ্যাগত, ইয়ার, বন্ধু, জ্ঞানী, গুণী ও শিল্পী ও শিল্প রসিকেরা দেখার সুযোগ পেতেন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরীতে বিখ্যাত মেডিসি পরিবারে এমন একটি অসাধারণ ও দুর্লভ সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল এবং দান্তের মত কবি, মাইকেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফেলের মত শিল্পীসহ সে যুগের ইটালীর অনেক কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, যাজক, শিল্পী, শিল্পরসিক 'মেডিসি' প্রাসাদে রক্ষিত (Plazza Medici) গ্রীক ও রোমের পুরা সামগ্রী ও পুঁথির সংগ্রহটি উপভোগ করা এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করার সুযোগ পেতেন। লরেঞ্জো ডি মেডিসির কিছু আগে চতুর্দশ শতকে ফ্লোরেন্স নগরে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও নন্দন তত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মেডিসি পরিবারের প্রতিভাবান ও প্রতিপত্তি সম্পন্ন প্রধান পুরুষ জ্যেষ্ঠ কসিমো। তিনি ব্যাংক ব্যবসায় বিত্তবান হয়ে ওঠেন এবং তাঁর বংশধর লরেঞ্জো দি ম্যাগ্নিফিসেণ্ট এবং তৎপুত্র পিয়েরো ১৪৩০ খৃঃ থেকে ১৪৯৪ খৃঃ

পর্যন্ত ফ্লোরেন্স নগররীর চ্যান্সেলর বা অধিপতি হন। এই পরিবারের বিত্ত, প্রতিপত্তি, আভিজাত্য, রুচি ও বৈদগ্ধ্যকে ভিত্তি করে সমাবেশ ঘটল এক বিদগ্ধ মণ্ডলীর, যাদের মধ্যে দান্তের মত কবি, ম্যাকিয়াভেলির মত কূট রাজনীতি তত্ত্ববিদ, মাইখেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফেলের মত শিল্পীরাও ছিলেন। এই মণ্ডলী প্লেটোনিক এ্যাকাডেমি বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁরা গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো ও তাঁর অনুগামীদের ভাববাদী দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পবিচার নিয়ে অধ্যয়ন ও চর্চা শুধু নয়, তদনুসারে নিজেদের জীবনবোধ, রুচি ও মানসিকতাকে তৈরী করতেন। এর ফলে গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যার অনুশীলন ও অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্লাজা মেডিসিতে যে বিশাল গ্রেকো-রোমান ধ্রুপদী রীতির পুরা শিল্প-কলা-সামগ্রীর এক অমূল্য সংগ্রহ গড়ে উঠল তার রসাস্বাদন, উপভোগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে সে যুগের ফ্লোরেন্সের শিল্পী ও শিল্প রসিকেরা শিল্প রচনায় এক নতুন ধারার সূচনা করলেন যার নাম অ্যান্টিক ধারা, পুরাবস্তুর অনুগামী শিল্প রীতি। পঞ্চদশ শতকের এই পুরানুগামিতা সৃজনশীল শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে কয়েক দশকের মধ্যে রেনেশাঁ নামে পরিচিত মধ্যযুগীয় ইউরোপের সর্বোৎকৃষ্ট শিল্প রীতির উৎস মুখ খুলে দিল। এত কথা বলার কারণ যে অভিজাত, রুচিবান, বিত্তশালী ও সংস্কৃতমনা একটি বা দুটি পরিবার, বিদগ্ধ সভা, পুঁথি ও শিল্প সামগ্রীর সংগ্রহের সাহায্যে একদল প্রতিভাবান শিল্পী, শিল্পরসিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিকেরা একটি শহর তথা জাতি গোষ্ঠির বা দেশের সাংস্কৃতিক পুণরুজ্জীবন ঘটাতে যে সক্ষম হন সেটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কলকাতার ঠাকুর পরিবার ঊনবিংশ-বিংশ শতকে একশ বছর ধরে এমন একটি ভূমিকা পালন করেছে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে। একটি উপযুক্ত পরিবার, একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শনে বিশ্বাসী বিদগ্ধ মণ্ডলী ও একটি সংগ্রহশালা যৌথ প্রচেষ্টায় একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক হয়ে শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে কতদূর ফলপ্রসূ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যেতে পারে তার জলন্ত উদাহরণ ফ্লোরেন্সের ক্ল্যাসিক্যাল স্টাডির বিশ্ববিদ্যালয়, বিত্তবান ও উন্নত চিত্ত মেডিসি পরিবার, মেডিসি পরিবারের পৃষ্ঠ পোষকতায় গড়ে ওঠা প্লেটোনিক এ্যাকাডেমি এবং মেডিসি পরিবারের পুঁথি ও শিল্প সামগ্রী সংগ্রহের যথাযথ ব্যবহার থেকে উদ্ভূত রেনেশাঁ।

এই প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন যে, সর্বদেশে ও সর্বকালে দু'ধরনের সংগ্রহ দেখা গেছে। বিত্তবান ও প্রতাপশালী ব্যক্তিরা—রাজা, বাদশা, সম্রাট, আমীর, ওমরাহ, ডিউক, ডাচেস, লর্ড, জেন্টিল, ধণিক-বণিক ও বাবুরা আভিজাত্য, মর্যাদা, আত্মশ্লাঘা, লোভ, রুচি, বাতিক, কৌতূহল, বৈদগ্ধ প্রণোদিত উদ্যম প্রভৃতি এক বা একাধিক কারণে নানা যুগে যে সম্পদ-সামগ্রীর সংগ্রহ জড় করেছিলেন তাদের প্রাসাদে, দুর্গে, অট্টালিকায়, প্রমোদ ভবনে, উদ্যান বাটিকায় অথবা অন্যত্র (১) সেগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে যক্ষের ধন করে রাখা হয়েছে (২) কখনো কখনো আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, বান্ধব, অতিথি, অভ্যাগত, গুণী ও জ্ঞানীদের জন্য সে সব সংগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য

ব্যাপক জনসাধারণের শিক্ষা ও চিত্ত বিনোদনের জন্য সংগ্রহ শালার ব্যবহার শুরু হয় আধুনিক যুগে। অনেক ক্ষেত্রে কুক্ষিগত সংগ্রহ ভাণ্ডার ধীরে ধীরে নানা অবস্থার মধ্যে পড়ে লোক চক্ষে উন্মোচিত হয়েছে। ব্যাবিলনের নন্নর মন্দিরের বেল-শান্টি নন্নরের পুরোস্থানীয় ও বিদ্যালয়ের সহযোগী সংগ্রহালয়, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার প্রধান একাডেমিক মিউজিয়ন, রেনেশাঁ কালীন ফ্লোরেন্সের মেডিসি মিউজিয়ম অথবা তৎপরবর্তীকালে যাজকীয় ভ্যাটিকান ও ল্যাটেরান মিউজিয়ম এবং পিকচার গ্যালারী সীমিত অর্থে হলেও জনসাধারণের শিক্ষা ও আনন্দ লাভের কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে।

এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ এইসব সংগ্রহশালা যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁদের মানসিকতায় সক্রিয় এবং কোনও ক্ষেত্রেই ঐ ঐতিহ্যগামিতা পুরানুকরণ নয়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ব্যাবিলনের অন্তিমলগ্নে চলডিয়ান সম্রাট নেবুচাঁডনেজর ও তার পুত্র-পৌত্র সকলেই ব্যাবিলনের প্রাচীন মন্দিরগুলি সংস্কার ও পুণর্নবীকরণ করেন। নেবুচাঁডনেজরের পৌত্র নবোনিডাস তো এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রাচীন প্রাসাদ ও মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর উৎখনন করে সযত্নে রেখে দিতেন। হয়ত বা প্রাচীন রাজবংশের কিংবদন্তি বা স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ-কাজের মধ্যে দিয়ে অতীতের ব্যাবিলন ও তার ইতিহাসকে তিনি অন্বেষণ করেছেন। ইতিহাস অন্বেষ এবং পুরাপ্রেক্ষা আজও সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার মৌলিক কারণ। আজও পৃথিবীর অধিকাংশ সংগ্রহ শালা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত। সইটিয় (Satiic এবং টলেমীয় (Ptolemic) মিশরেও দেখা গিয়েছে পুরানুসন্ধান প্রবৃত্তি এবং ঐতিহ্যানুসারী সাংস্কৃতিক চর্চার ফলে-গড়ে উঠল আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ন। ফ্লোরেন্সের মেডিসি পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অতীত অনুসন্ধানী বিদগ্ধ-আগ্রহ ও উদ্যমে সংগৃহীত এক বিশাল পুরাশিল্প ও পুঁথির সংগ্রহের সঙ্গে সমসাময়িক শিল্পীদের রচনা সম্ভার। ভারতেও সেই অতীত অনুসন্ধিৎসা থেকে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪ খৃঃ), তাকে কেন্দ্রকরে বিদগ্ধ মণ্ডলীর অণ্বীক্ষা ও কৌতূহল উদ্দীপক বস্তু সংগ্রহ থেকে এক বিশাল সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা, যার নাম ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম (১৮১৪ - ১৮৭৮ খৃঃ)। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে নেবুচাঁডনেজর —নবোনিডাস এর ব্যাবিলন এবং টলেমীর আলেকজান্দ্রার মধ্যে। জ্যোতিষ ও নক্ষত্র বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র ছিল উভয় স্থান। নেবুচাঁডনেজরের ইশ্টর (শুক্র দেবী বা ভেনাস) দ্বার ও মারডুক জিগারাট (বৃহস্পতি বা জুপিটারের মন্দির , নন্নর বা চন্দ্র দেবীর মন্দির (যেখানে নবোনিডাস-কন্যার সংগ্রহশালা ছিল) এবং আলেকজান্দ্রিয়ার মানমন্দির নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ-চর্চা-সম্বন্ধীয়। কৃষি ও জল-পথে-বাণিজ্য নির্ভর সমাজে নক্ষত্র বিদ্যার সাহায্যে বর্ষার আবির্ভাব, নদীর প্লাবন ও জোয়ার ভাঁটা এবং জল পথে যাতায়াতে দিক নির্ণয় হত। অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার

প্রয়োজন সেকালে আরও বেশি ছিল। তাই ধর্ম, মিউজিয়ম, নক্ষত্র বিদ্যা সবই হাত ধরাধরি করে চলত। নেবুচাঁডনেজরের প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন তুলে এই আলোচনার ইতি টানা যাক। ম্যাসিডোনিয়ায় খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে প্রথম উদ্ভিদ সংগ্রহ উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে এতাবৎ জানা আছে। কিন্তু খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে নির্মিত নেবুচাঁডনেজরের সুবিশাল প্রাসাদের ছাদে বহু বিচিত্র বৃক্ষ-লতা-গুল্ম শোভিত যে ঝোলান বাগানের কথা প্রাচীন গ্রীক ও হিব্রু সাহিত্য ও শাস্ত্র থেকে জানতে পারি সেই উদ্যান কি শুধু-মাত্র "বিস্ময়" সৃষ্টির জন্য তৈরী করা হয়েছিল, না কি শিল্প স্থাপত্য, ঐতিহ্য প্রীতি ও, নক্ষত্র বিদ্যার চর্চার সঙ্গে নেবুচাঁডনেজরের আগ্রহ ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞানে —উদ্ভিদ উদ্যান রচনায়, উদ্ভিদ-সংরক্ষণে ?

প্রাচীন কালে ধর্মস্থান ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে গঠে ওঠা সংগ্রহগুলির সব না হলেও কিছু সামগ্রী মন্দিরের নানান আচার অনুষ্ঠানের সময় জন সাধারণ দেখতে পেতেন। রাজা রাজাদের সংগ্রহের কিছু কিছু অভিষেক বা বিজয় শোভাযাত্রার শোভা বর্ধন করত এবং দর্শকেরা সামান্য হলেও সে সব সম্পদের খানিক খানিক দেখার সৌভাগ্য লাভ করতেন। রাজার অভিষেক, বিজয়োৎসব প্রভৃতি উপলক্ষ্যে দেশ বিদেশ থেকে বন্ধু স্থানীয় মিত্র ও অধস্তন রাজপুরুষেরা ও বণিক-শ্রেষ্ঠীরা নানা ধরণের উপঢৌকন পাঠাতেন—এমন সব বর্ণাঢ্য বর্ণনা মহাকাব্য, পুরাকাহিনী ও ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। এইসব অনুষ্ঠান যেমন রাজকীয় সংগ্রহ সামগ্রীর কলেবর ও বৈচিত্র্য বাড়াত, তেমনি আবার প্রজাকুলকে রাজকীয় সংগ্রহ দেখার সীমিত সুযোগ করে দিত। রাজৈশ্বর্য্য কিম্বা রাষ্ট্রের সম্পদ প্রদর্শনের ফলে রাজা বা রাষ্ট্রের জাঁকজমকপূর্ণ প্রতাপ সম্বন্ধে দর্শকের মনে রাজ-সম্মান বা রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন বাড়ত, তেমনি বাড়ত প্রজাদের ভীতি। অনেক সময় রাজ-মর্য্যাদা জাতির মর্য্যাদা বোধ জাগাতে সাহায্য করত। জাতি ও সমাজ তাদের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও বর্তমান আড়ম্বরতা দেখে, জেনে, বুঝে নোতুন করে জেগে ওঠার উদ্দীপনা লাভ করত।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক অধিকৃত মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেলফাসের আদেশে রাজকীয় সম্পদ শোভাযাত্রা সহকারে সর্ব সাধারণকে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী, বিজিত প্রজা ও সৈনিকেরা নানা ধরণের স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, রাজ মুকুট, অস্ত্র শস্ত্র, অঙ্গাবরণ ও অঙ্গাভরণ, দেব দেবীর ছোট বড় মূর্ত্তি বহন করে পায়-পায় এগিয়ে যেত। তাদের পিছনে পিছনে যেত বৃষ বাহিনী, হস্তী-দন্ত-সম্ভার, নানা জন্তু জানোয়ারের চর্ম নিদর্শন, সূচীকর্ম শোভিত ও চিত্রিত শিবির-বস্ত্র। শোভাযাত্রা উপভোগ্য হয়ে উঠত সঙ্গীতের মূর্চ্ছণায় ও পুষ্প বর্ষণে। অবশ্য একথা সত্য যে এ জাতীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য রাজৈশ্বর্য্য ও রাজশক্তির গরিমা প্রদর্শন, গণশিক্ষা বা গণকল্যাণ নয়। আবার এও বলা যায় যে গণ-আনন্দ ও গণ-উদ্দীপনা জাগাতে এগুলি পরোক্ষ-ভাবে কাজ করত।

শোভাযাত্রা করে গণমানসে রাজার ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ ও মর্যাদা যেমন প্রতিষ্ঠিত করা

যায়, সে রকম সম্পদ সামগ্রী দ্বারা শোভিত রাজ সভায় রাজা বা সম্রাট স্বয়ং উপবিষ্ট থেকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী দেবতার পার্থিব প্রতিকল্প হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। ভেনিসের রাষ্ট্রদূত ১৫২০ খৃষ্টাব্দে হ্যাম্পটন রাজসভা দেখে লেখেন, "সমস্ত হল ঘরটি সোনা ও রূপোর ফুলদানি ও কলস দিয়ে সাজানো। সেখানে রাজা উপবেশন করে স্বর্গীয় সম্মান গ্রহণ করতেন"। স্পেনের চতুর্থ ফিলিপ তামাম ইওরোপ থেকে খ্যাতিমান শিল্পীদের কাজ সংগ্রহ করে, তাঁর সভাসদ্‌সহ বসার কক্ষে এনে হাজির করেন। সেই ঘরে তিনি পরিষদ সহ যখন বিরাজ করতেন তখন নিজেকে তিনি মনে করতেন 'গ্রহরাজ' এবং সভাসদেরা সেই ভাবেই তাঁকে রে প্ল্যানেটা (Rey Planeta) বলে স্তুতি করতেন। স্বর্গীয় রাজতন্ত্রের ধারণায় রাজা ও সম্রাটেরা নিজেদের স্বর্গের দেবরাজ সদৃশ মনে করতেন। তাই স্বর্গীয় রূপ শিল্পে সাজাতেন তাদের পরিবেশ - প্রাসাদ, কানন, রাজসভা। এ ভাবে ডিভাইন মনার্কি তত্ত্বকে বাহ্যরূপ দিতে গিয়ে মধ্যযুগে গড়ে উঠেছে বহু প্রাসাদ সংগ্রহশালা। ভিসিগথদের রাজা লিউভিজিল্ড (Leuvigild) যখন (৫৬৮ খৃঃ) জাঁকজমকপূর্ণ রাজবেশে সিংহাসনে বসতেন তখন তার চারপাশ আলো করে সাজান থাকত অতুল ঐশ্বর্যের পরিচায়ক নানা সমগ্রী। ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুই Louis XV1) রাজপ্রাসাদ সজ্জার জন্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ শিল্প বস্তু ও অ্যান্টিক সংগ্রহ করেন এবং যে সমস্ত চিত্র ও ভাস্কর্য তাঁর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, শিল্পী নিয়োগ করে সেগুলির অনুকৃতি তৈরী করে আনান। রাজসভা ও প্রাসাদকে সুসজ্জিত করার জন্য শিল্প সংগ্রহ, ফ্রান্সের সম্রাটদের মধ্যে ষোড়শ লুই যে প্রথম করেন তা নয়। তাঁর পূর্ব পুরুষ পঞ্চম চার্লস ও প্রথম ফ্রান্সিস প্রচুর জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন। অবশ্য প্রথম চার্লসের আগ্রহ ছিল পুঁথি, বিশেষ করে চিত্রিত পুঁথি সংগ্রহে এবং প্রথম ফ্রান্সিস তাঁর কালেক্টরস্‌ ক্যাবিনেট (Collector's Cabinet) ভরে তোলেন সমসাময়িক রেনেশাঁ মাস্টারদের অংকিত চিত্রে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে বিখ্যাত চিত্র শিল্পী তথা সে যুগের মহামনীষী লিওনার্দো দা-ভিঞ্চির শেষ জীবন কেটেছিল প্রথম ফ্রান্সিসের রাজ সভায় এবং সম্রাটের কোলে মাথা রেখে মারা যান সেই শিল্পী সম্রাট। শিল্পী ও শিল্পের প্রতি যথার্থ অনুরাগ ছিল সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের। ফরাসী সম্রাটদের এই প্রাসাদ সংগ্রহটি পরবর্তী কালে বিশ্ব বিখ্যাত লুভর মিউজিয়মে (Louvre Museum) পরিণত হয়। চতুর্দশ লুইয়ের মন্ত্রী কোলবার্ট (Colbert) প্রথম ফ্রান্সিসের সংগ্রহ লুভ্যর্‌ প্রাসাদে স্থানান্তরিত করেন এবং শিল্প শিক্ষার্থীরা সেই সংগ্রহ থেকে যাহাতে শিক্ষা লাভে সুযোগ পান সেই ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য শিল্পী ও শিল্প শিক্ষার্থীদের জন্য সামান্য এই সুযোগ বেশি দিন চালু থাকল না। ষোড়শ লুই তাঁর শেষ জীবনে লুভ্যর্‌ এর এই শিল্প সংগ্রহ পুনরায় রাজ পরিবারের

বাসস্থল ভার্সাই (Versialles) প্রাসাদের অভ্যন্তরে সরিয়ে আনেন এবং পরিবারের বাইরের লোকের কাছে সেই প্রাসাদ সংগ্রহের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হল।

একই ভাবে সে সময়ে স্পেনের মাদ্রিদ, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা, ইংলণ্ডের লণ্ডনের উইণ্ডসোর, রাশিয়ার হারমিটেজ প্রভৃতি রাজ প্রাসাদে ঐশ্বর্য মণ্ডিত রাজকীয় প্রাসাদ সংগ্রহ শালা গড়ে উঠতে থাকে। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে ইওরোপে ডিভাইন মনার্কি বা দৈব রাজতন্ত্রের সুবর্ণযুগে ইওরোপের ছোট বড় প্রায় সকল রাজ সভা ও রাজ প্রাসাদে একেকটি রাজকীয় সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। এই সব চোখ ধাঁধানো অতুল ঐশ্বর্য মণ্ডিত প্রাসাদ সংগ্রহের মধ্যে রাজকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই সক্রিয় ছিল। রাজতন্ত্রের চরম অভ্যুদয়ের যুগ ছিল শেষ মধ্যযুগ। ফলে রাজ ঐশ্বর্য আহরণের প্রতিযোগিতার যুগও ছিল সেটি। পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে তখন রাজসভা ও রাজ প্রাসাদের জাঁকজমক পূর্ণ জীবন যাত্রা, বিলাস-ব্যসন, আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য প্রদর্শনের এক সমারোহ কাল চলেছে। যুদ্ধ বিগ্রহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি তখন এক দেশের সম্পদ অন্য দেশের রাজ সম্পদকে সমৃদ্ধ করে তুলছিল। এই রাজাড়ম্বরতার যুগে যে সব সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল তার অনেকগুলি পরবর্তীকালে গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে সাধারণ সংগ্রহালয়ে পরিণত হয়।

সংগ্রহশালার ইতিহাসে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দ একটি স্মরণীয় বছর, কেননা সেই বছরে পৃথিবীর প্রথম পাব্লিক মিউজিয়ম অর্থাৎ সর্ব সাধারণের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের দীর্ঘ পথ যাত্রায় এতদিন পর্যন্ত এমন সব সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে এবং কালের ও অবস্থার পরিবর্তনে ধ্বংস হয়ে গেছে যে গুলি ছিল হয় সংগ্রহ ভাণ্ডার, না হয় সুবিধাভোগী শ্রেণী গোষ্ঠীর মর্যাদা ও ঐশ্বর্য প্রদর্শনের উপায় অথবা সামান্য কিছু সংখ্যক পণ্ডিত, কলারসিক, ও অভিজাত ব্যক্তির শিক্ষা ও চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্র। ইওরোপের নবজাগরণ, শিল্প, ও পুরা সংগ্রহগুলি, সে যুগের শিল্প শিক্ষার্থী, শিল্পী ও পণ্ডিত মণ্ডলীর নাগালের মধ্যে এনে দিলেও, সাধারণ লোক সে সব সংগ্রহশালা শিক্ষা ও চিত্ত বিনোদনের জন্য ব্যবহার করার সুযোগ পায়নি। সমুদ্রাভিযান ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তারের দ্বারা ইউরোপ সপ্তদশ শতকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে সুরু করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন প্রাকৃত দ্রব্য, শিল্প ও কারু সামগ্রী, পুরাবস্তু এবং বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি সংস্কৃতির উপকরণ বণিক, নাবিক, ধর্ম প্রচারক ও পর্যটকদের মাধ্যমে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে সংগৃহীত হচ্ছিল। সেই সব জিনিস বিভিন্ন ধণিক, বণিক, রাজপুরুষ, বিদগ্ধ মণ্ডলী ও রাজ পরিবারের সংগ্রহভাণ্ডারকে বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ করে তুলছিল। ইতিমধ্যে ম্যাগনা কার্টা চুক্তির পরবর্ত্তী নানা ঘটনার মাধ্যমে ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় বণিকী গণতন্ত্রের ছোঁওয়া লেগেছে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষণও সেখানে দেখা যেতে শুরু করেছিল। এই পটভূমিকায় লণ্ডনের সাউথ ল্যাম্বেথ (South Lambeth)-এ

অবস্থিত দি ট্রাডেস্কাণ্ট মিউজিয়ম The Tradescant Mesuum) তখন ছিল একটি পারিবারিক সংগ্রহালয়। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ঐ পরিবারের উত্তরাধিকারী মিঃ এ্যাসমোলে, ট্রাডেস্কাণ্ট মিউজিয়মের সকল সংগ্রহ, বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডকে (Oxford University) দান করে দেন। সেই বছর ২৪ মে ডিউক অব ইয়র্ক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী সহ এই সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে গেলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও অধ্যাপনার সহায়ক এই সংগ্রহশালাটির নাম কারণ করা হল দাতার নামে—এ্যাসমোলিয়ান মিউজিয়ম। বস্তুত এ্যাসমোলিয়ান মিউজিয়ম পূর্ব-কালের আলোকজান্দ্রিয়া মিউজিয়মের মত উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সহায়ক হয়ে ওঠে। জনসাধারণের শিক্ষা ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে এটিকে সক্রিয় করে তোলা হয় অতি সাম্প্রতিক কালে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসমোলিয়ান মিউজিয়ম সরকারী অর্থে স্থাপিত প্রথম ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ম।

পরবর্তী শতকে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ঐ ইংল্যাণ্ডেই স্থাপিত হল দেশের আইন সভায় আইন পাশ করে আর একটি সাধারণ সংগ্রহশালা- লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম, পৃথিবীর ছটি সুবৃহৎ সংগ্রহশালার একটি। স্যার হেনরী স্লোন (Sir Henry Sloane, A.D. 1660 – 1753, জীবিকায় ডাক্তার, রয়াল সোসাইটির সভাপতি, এবং জন্মসূত্রে আইরিশ। ডিউক অব আলবেমার্ল Duke of Albemarle) যখন আফ্রিকার জ্যামাইকায় ব্রিটিশ উপনিবেশের গভর্নর হয়ে যান তখন স্যার হেনরী স্লোন তাঁর চিকিৎসক হয়ে জ্যামাইকায় গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি জ্যামাইকা ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিদর্শন সংগ্রহ ও ঐ বিষয়ে সমীক্ষামূলক গবেষণার কাজ করেন। Natural Hisroiy of Jamaica নামে তাঁর লেখা একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে তিনি দেশে ও বিদেশে বসবাস কালে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নানা ধরণের rarerities বা দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ করার ফলে, তিনি একটি বিশাল সংগ্রহের অধিকারী হয়েছিলেন। রেনেশাঁ পরবর্তী বৌদ্ধিক (Enlightment) যুগের অন্যান্য আরও পাঁচজন অর্থবান বুদ্ধিজীবির মত তিনিও জ্ঞান লিপ্সু, অনুসন্ধিৎসু ও মানবতাবাদী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন, ১৭২৭ খৃঃ থেকে ১৭৪০ খৃঃ পর্যন্ত, দীর্ঘ তেরো বছর, লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভাপতি থাকায় অন্যান্য বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। তার ফলে তাঁর সংগ্রহের বৈচিত্র, পরিমাণ ও গুণগত মান অন্যান্য অনেক সংগ্রহ থেকে উন্নত হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের ভাষায় বলা যায় তাঁর সংগ্রহে ছিল "গ্রন্থ, রেখাচিত্র, পুঁথি, মুদ্রিত চিত্র, মডেল, প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রা, পুরাবস্তু, সীল, সীলমোহর, দামী পাথর ও রত্ন, গণিত সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, এবং চিত্র।" তিনি এই সংগ্রহ রাজা অর্থাৎ জাতির জন্য দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দানের একটিই শর্ত ছিল যে সংগ্রহটির সার্মাগ্রিক মূল্যের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ সে কালের কুড়ি হাজার পাউন্ড রাজকোষ থেকে দিতে হবে, কেননা "কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ও উন্নতি এবং মানব জাতির কল্যাণের জন্য এই সকল সামগ্রী

এক সঙ্গে প্রধানত লণ্ডন নগর বা তার আশে পাশে কোন স্থানে রাখতে হবে যাতে বহু মানুষের সর্বাধিক কাজে এগুলি লাগান যায়।"

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তখন গীর্জা ও রাষ্ট্র থেকে কয়েকজনকে নিয়ে একটি ট্রাস্ট গড়ে দিলেন এবং লটারির মাধ্যমে টাকা তুলে স্লোনের সংগ্রহের সঙ্গে হারলিয়ান (Herleian) পুঁথি ভাণ্ডারটি গ্রহণ করার দায়িত্ব দেওয়া হল ঐ ট্রাস্টকে। ১৭০০ খৃঃ অধিকৃত কটনইয়ান (Cottonian) গ্রন্থাগারের সঙ্গে হারলিয়ান সংগ্রহটি যুক্ত করে সংগ্রহশালার স্বার্থে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার (ব্রিটিশ লাইব্রেরী) গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে হারলিয়ান পুঁথি ভাণ্ডারটিকে নিতে বলা হয়। বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়াম যেখানে অবস্থিত সেই সপ্তদশ শতকে নির্মিত মণ্টাগু (Montagu) প্রাসাদটি পাওয়া গেল ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগারের সংগ্রহ রাখার জন্য। ১৭৫৩ সালে পার্লামেণ্টে ঘোষণা করা হল যে ঐ সংগ্রহ এবং ভবিষ্যতে সংগৃহীত সবকিছু সকল প্রজন্মের সকলের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত হবে এবং সকল শিল্পশিক্ষার্থী (studio) এবং কৌতূহলী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোন প্রবেশমূল্য নেওয়া হবে না। আধুনিক সংগ্রহশালাগুলির যে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা হয়, যেমন শিক্ষার্থীর শিক্ষা এবং সকলের চিত্তবিনোদন, সংগ্রহশালার মৌলিক লক্ষ্যের সেই কথা সর্বপ্রথম লিখিতভাবে ঘোষণা করা হল সেদিনের সেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ব্রিটিশ মিউজিয়ম স্থাপনের আইনে। এখান থেকেই শুরু হল আধুনিক আদর্শ প্রণোদিত সংগ্রহশালার পথ যাত্রা। গ্রীক ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিয়মে সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক হয়ে শিক্ষা ও গবেষণাকে সমৃদ্ধ করার যে আদর্শ আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়মে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, এক্ষেত্রেও তাই করা হল। ১৭৫৩ সালের আইনেই বলা হয়—"সকল কলা ও বিজ্ঞান বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, প্রাকৃত দর্শন ও অনুমান ভিত্তিক জ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যা এই সংগ্রহশালা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তা করবে, অথবা অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অন্যান্য কাজ করতে পারে।" ১৭৫৯ সালেই ট্রাস্ট সিদ্ধান্ত করেন যে শুকনো গাছ পাতা (dried plants) ইত্যাদি লাইব্রেরীর রিডিংরুমে পাঠকের কাছে এনে দেখান হবে। পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের সহ-অবস্থান একইভাবে গবেষকের কাজের সুবিধা করে দেয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ম পরবর্তীকালে নোতুন নোতুন নানান সংগ্রহে পুষ্ট হলেও সূত্রপাতের সেই বিশাল স্লোন সংগ্রহ যার সংখ্যা ছিল ৬৯,৩৫২ টি সামগ্রী এবং যার মধ্যে পুঁথিপত্র, মেডেল, মুদ্রা, চিত্র, মুদ্রিত পুস্তক ও ম্যাপ, গ্লোব, প্রাকৃত বস্তু, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ছিল, সেই দ্রব্য সামগ্রীই বিশ্ববিখ্যাত সুবৃহৎ ব্রিটিশ মিউজিয়মের ভিত্তি। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ১৭৫৩ সালের ঐ আইন অনুসারে ১৭৫৭ সালে বিশ্বের প্রথম সাধারণ সংগ্রহালয়, ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। ১৭৫৭ সাল সংগ্রহশালার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। কেননা অনাগত কালের অগণিত সংগ্রহশালার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঐ সাধারণ সংগ্রহালয়

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিদ্দিষ্ট হয়ে গেল। যুগের প্রয়োজনে সংগ্রহশালাগুলি যে আর পরিবারের কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না, তার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল ঐ ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। রাজতন্ত্রের প্রতাপ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে বণিকী গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের শক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকায় ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজকীয় সংগ্রহশালা সাধারণ সংগ্রহশালা বলে সরকারী ভাবে ঘোষিত হতে থাকল অষ্টাদশ শতকেই।

ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই লুভ্‌র্‌ থেকে ভার্সাই প্রাসাদে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালা সরিয়ে নিয়ে গেলেও ফ্রান্সে যখন বিপ্লবের ফলে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, সেই বিপ্লবী সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন, সংগ্রহশালা লুভ্‌র্‌-এ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেইমত ১৭৯৩ সালে লুভ্‌র্‌ সংগ্রহশালা সাধারণের সংগ্রহশালায় পরিণত হল। দশদিনে তিনদিন সাধারণের প্রবেশাধিকার রাখা হল। স্মরণীয় যে প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সে তখন দশদিনে সপ্তাহ গণনা করা হত। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ইওরোপ অভিযান সামরিক দিক থেকে ব্যর্থ হলেও, লুভ্‌র্‌-এর সংগ্রহের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। সারা ইওরোপ ও উত্তর আফ্রিকার শিল্প ও পুরাদ্রব্য সংগৃহীত হল নেপোলিয়নের সমরাভিযানের ফলে। শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সমরাস্ত্রের নক্সা তৈরীতে দক্ষ ছিলেন এবং নানান ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র, সাবমেরিন ও উড়ো জাহাজের নক্সার উদ্ভাবক ছিলেন তিনি। অবশ্য তার আঁকা ঐ সব নক্সা ও তৎসংক্রান্ত বিবরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আদৌ কোথাও রক্ষিত আছে কিনা, সে খবরও নেপোলিয়নের সময় জানা ছিলনা। যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং নেপোলিয়নের নির্দেশে ইতালী অভিযানের সময় বাড়ী বাড়ী তল্লাস। করে দা ভিঞ্চি কৃত বহু যন্ত্রপাতির নক্সার ড্রইং ও ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা তাঁরই হাতের লেখায় নোট্‌স্‌ পাওয়া গেল নানা পরিবারের কাছ থেকে। এই অমূল্য সম্পদ চিরকালের মত হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে লুভ্‌র-এ আশ্রয় পেল। অবশেষে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর লুভ্‌র্‌-এর সংগ্রহশালাকে জাতীয় সম্পদ বলে ঘোষণা করা হয়। রোমের ভ্যাটিক্যান চার্চের চতুর্দশ ক্লিমেণ্ট (Clement XIV) বেল-ভেডিয়ার উদ্যান ও গ্যালারীতে রক্ষিত উন্নতমানের মূর্ত্তিগুলি একটি নবনির্মিত প্রদর্শ কক্ষে সাজিয়ে রাখেন এবং ১৭৭৩ সালে ভ্যাটিকানের সংগ্রহশালা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। মাদ্রিদে ১৭৭২ সালে Museo Nacional প্রতিষ্ঠিত হল। এই সংগ্রহশালা ১৭৭৬ সালে সাধারণ সংগ্রহশালা বলে ঘোষিত হয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্পেন অধিকার করার পর তার ভাই যোশেফ বোনাপার্ট স্পেনের শাসন ভার পেয়ে ঘোষণা করলেন যে, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করা হবে। অবশ্য এ কাজ করে যাওয়ার সুযোগ তার হয়নি। পরবর্ত্তীকালে স্পেনের আইন সঙ্গত রাজা সপ্তম ফার্ণাণ্ডো প্রাদো রাজ প্রাসাদের সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে মাদ্রিদে প্রাদো মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। সংগ্রহশালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষণা করে বলা হল যে, শিক্ষা ও ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য, দেশের মানুষ ও বিদেশীদের

মহৎ কৌতূহলের তৃপ্তি সাধন এবং স্পেনকে উপযুক্ত গৌরব দানার্থে মূর্ত্তি ও চিত্রের গ্যালারী স্থাপিত হল। এ কথাও জানান হল যে, এটি একটি সাধারণের সংগ্রহশালা।

লণ্ডনের ওয়েষ্ট মিনিস্টার এলাকায় পার্ক স্ট্রীটে মিঃ টাউনলের রোমান ভিলাতে মিঃ টাউনলের নিজস্ব সংগ্রহ ভাণ্ডার ছিল। তিনিও সে যুগের অনুপ্রেরণায় তাঁর সংগ্রহশালায় সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে বলে ঘোষণা করলেন।

ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক স্বল্পায়ু বিপ্লবী সরকার Le Muses National d' Histoire Naturalle নামে প্রাকৃত বিজ্ঞানের উপর বিশ্বের দ্বিতীয় এবং প্রথম জাতীয় সংগ্রহালয়টি স্থাপন করেন (১৭৯৩-৯৪)। জার্মানীর ব্রার্নস উইকের ন্যাচার্যাল হিস্ট্রি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৪ সালে। ফ্রান্সে এই শতকে সংগ্রহশালার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর প্রথম যন্ত্রশিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা Conservatoire des Arts et Metiers প্যারিসে ১৭৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা প্রান্তে শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা গড়ে তোলার যে ঝোঁক দেখা দেয় তার শুরু অষ্টাদশ শতকে এবং ফ্রান্স ও জার্মানীতে।

অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন দেশে একাধিক সরকারী ভাবে স্বীকৃত সাধারণ সংগ্রহশালা বা সাধারণের জন্য সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও ঐ সব সংগ্রহশালাগুলির নিয়ম কানুন ও পরিচালকদের মানসিকতা প্রকৃতপক্ষে সাধারণের শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের প্রতি উদার ছিল না। এই বিষয়ে তথ্যের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। A Olearius ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে Schleswig Holstein ও Gottorf সংগ্রহ ভাণ্ডারের বিবরণমূলক তালিকা (Catalogue) তৈরী করে প্রকাশ করেন। তাঁর সেই প্রকাশনায় তিনি সকল সংগ্রাহকের কাছে আবেদন জানান, তারা যেন তাঁদের সংগ্রহ সম্পদ দর্শকদের দেখতে দেন, যাতে করে সাধারণ মানুষ অমূল্য ও সুন্দর নিদর্শনের পরিচয় পায় এবং উপকৃত হতে পারে। কিন্তু তাঁর আবেদনে সে সময়ে কোনও সংগ্রাহক সাড়া দিয়েছিলেন, এমন নজির নেই।

ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই এর মন্ত্রী কোলবার্ট (Colbert) ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ থেকে সম্রাটের শিল্প সংগ্রহ লুভ্‌র্ প্রাসাদে স্থানান্তরিত করেন যাতে শিল্প শিক্ষার্থীরা শিল্প অনুশীলনের কাজে ঐ সংগ্রহকে ব্যবহার করতে পারেন। এমন কি ১৬৯২ সালে Le Academie de Peinture et de Sculpture গঠিত হওয়ায়, সেখানে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এমন সামান্য ব্যবস্থাও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। চতুর্দশ লুই জীবনের শেষ প্রান্তে রাজকীয় সংগ্রহ লুভ্‌র্ থেকে পুনরায় ভার্সাইতে সরিয়ে নিয়ে যান। অবশ্য পঞ্চদশ লুই একমাত্র শিল্পীদের শুধু রুবেনের আঁকা চিত্রগুলি দেখার অনুমতি দিতেন। এমন কি অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগের পরেও ফরাসী সম্রাটদের বিপুল শিল্প ভাণ্ডার দেখার সুযোগ, রাজপরিবারের লোকজন ছাড়া, বিশেষ কারও ছিল না। ঐ শতকের মধ্যভাগে লুক্সেমবার্গ প্যালেসের শতখানেক চিত্র বাইরের লোক সপ্তাহে দু দিন দেখতে পেত। সেই সময় সম্রাট ষোড়শ

লুই সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা রাজকীয় সংগ্রহ দেখার অনুমতি দিতেন অতিথি অভ্যাগতদের —রাজকর্মচারী, রাষ্ট্রদূত, যাজক, অভিজাত পরিবারের ব্যক্তি বর্গ প্রভৃতি। ঐ শতকের প্রথম দিকে রোমের কুইরিনাল (Quirinal) প্যালেস এবং স্পেনে মাদ্রিদের এস্কোরিয়াল (Escorial)-এ দর্শনী দিয়ে দর্শকেরা ঐ সব প্রাসাদের সংগ্রহ দেখতে পেতেন।

রোমের বিশাল পন্টিফিকাল মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী ঐ শতকের মধ্যভাগে (১৭৪০-'৫০) সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হলেও, দর্শকেরা কিভাবে সেই সংগ্রহশালা দেখতে পেতেন তার একটি কৌতুকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায় জার্মানীর পর্যটক ভল্কম্যানের লেখায়—"নোতুন মিউজিয়মটি একজন সংরক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তাকে খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার। তিনি যখন একদল দর্শক নিয়ে মিউজিয়ম দেখতে ভেতরে যেতেন তখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যেতেন এবং অন্য দর্শকদের সেই সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দরজার সামনে বসে অপেক্ষা করতে হত অথবা এমনও ঘটত যে, তাকে মিউজিয়ম দেখার আশা ত্যাগ করে মিউজিয়ম না দেখেই, ভ্যাটিক্যান ছেড়ে যেতে হত। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সের সেন্ট ডেনিস ট্রেজার চেম্বারের কথা বলা যেতে পারে। সেখানে প্রদর্শ-আধার (case) থেকে জিনিস বার করে দেখানর আগে ঘরের দরজা ভাল করে বন্ধ করে দেওয়া হত।

১৭৯৩ সালের ২৭শে জুলাই ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারে জ্যাকোবিন নামক বামপন্থী জনগোষ্ঠীর আধিপত্য থাকায় লুভ্‌র্‌ সংগ্রহকে সাধারণের সংগ্রহশালা হিসাবে ঘোষণা করে Musee Central des Arts স্থাপিত করা হয় এবং লুভ্‌র্‌-এর Grndie Gallerie জনসাধারণের জন্য যথার্থই উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু সংগ্রহশালার উপর প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী রাষ্ট্রের জনসাধারণের অধিকার বেশিদিন কার্যকরী থাকেনি। নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ে (১৭৯৪-১৮১৫) ফ্রান্সে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত শাসন সংস্কারের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ, আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। প্যারিসের কণ্টিনেণ্টাল গৌরব বৃদ্ধির জন্য নগরীর শোভাবর্দ্ধন করার নানান কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে, লুভ্‌র্‌ মিউজিয়মটি আরও আকর্ষণীয় করে তোলেন।

মাদ্রিদের রাজকীয় সংগ্রহশালা প্রাদো সাধারণের সংগ্রহশালা হিসাবে ঘোষিত হলেও সেটি কিন্তু তখন নামেমাত্র সাধারণ সংগ্রহালয়। সে সময়ের প্রাদো মিউজিয়মের একটি প্রদর্শ তালিকায় পরিস্কার অক্ষরে লেখা হল যে সংগ্রহটি রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নগ্ন চিত্র দেখে জনসাধারণের নৈতিক ক্ষতি যাতে না হয়, সে জন্য প্রাদো মিউজিয়ামের সকল নগ্নমূর্ত্তি ও চিত্র সংরক্ষিত (Reserve) সংগ্রহ কক্ষে সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেওয়া হল। ঐ নিষিদ্ধ চিত্রের তালিকায় টিসিয়ান ও রুবেনও ছিলেন। বিদেশীদের প্রাদো মিউজিয়ম দেখতে হলে পাসপোর্ট জমা দিতে হত এবং স্পেন-দেশীয়রা প্রথমদিকে সপ্তাহে একদিন এবং পরবর্ত্তীকালে সপ্তাহে দু দিন ঐ সংগ্রহশালায় ঢুকতে পারতেন। সে সব দিনে বৃষ্টি হলে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হত না। এখানেই শেষ নয়।

মিউজিয়মে ঢোকার সময় মাথার টুপি খুলতে ভুলে গেলে দর্শকদের যৎপরোনাস্তি অপমান করা হত।

স্যার হেনরী স্লোনের দান করা সংগ্রহশালাটি অধিগ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার পার্লামেণ্টে আইনে উল্লেখ করলেন বটে ঐ সংগ্রহশালাটি এবং তার সঙ্গে যা কিছু সংগ্রহ যুক্ত হবে, সবই সর্বকালের সাধারণের ব্যবহারার্থে সংরক্ষিত হবে এবং দর্শকেরা প্রবেশ মূল্য ছাড়াই সংগ্রহালয়ে ঢুকতে পারবেন। এই সাধু সংকল্প কিন্তু তখন ঠিক ঠিক ভাবে কার্যকরী করা হ'ত না। কেননা তখনও মিউজিয়মকে মনে করা হত 'Cabinets de curiosities' কৌতূহল উদ্দীপক জিনিসের আধার মাত্র। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়ম ছিল সরকারী গৃহে রক্ষিত ব্যক্তিগত সংগ্রহ। ১৭৮৫ সালে, অর্থাৎ ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হবার ৩২ বছর বাদে, এক জার্মান ঐতিহাসিক ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখার নিয়মকানুন সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখে রেখে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, কোন লোক যদি ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখতে ইচ্ছুক হতেন তবে তাকে প্রথমে তার আনুপূর্বিক প্রত্যায়িত পরিচয় অফিসে জানিয়ে দরখাস্ত করতে হত এবং দরখাস্ত পেশের প্রায় দু' সপ্তাহ বাদে তিনি তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলে মিউজিয়মে ঢোকার একটি টিকিট পেতেন। ১৮০৪ সালের নিয়ম অনুসারে বৃটিশ মিউজিয়ম সপ্তাহে চারদিন সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দর্শকদের জন্য খোলা রাখা হত। ইচ্ছুক দর্শককে বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে মিউজিয়মের অফিসে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হত। আবেদন গৃহীত হলে, পালাক্রমে মাত্র ১৫ জন দর্শক একসাথে ভেতরে ঢুকতে পারতেন এবং এরকম আটটি দলকে দিনে ভেতরে ঢোকান হত। এমন কি প্রতিটি দল ঢোকার আগে একজন নির্দেশক অফিসার, যাঁরা ব্যতিক্রমের পর্য্যায় পড়েন এমন পদ মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া, অন্য সকলের পরিচয় পত্র পরীক্ষা করে দেখে তবে মিউজিয়মের ভেতরে যেতে দিতেন, অন্যথায় বিদায়। যারা ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেতেন তাদের সঙ্গে দেওয়া হত একজন সহায়ক। এমন মনে করার কারণ নেই যে যেদিন দরখাস্ত দেওয়া হত, সেদিনই দর্শকের মিউজিয়মে ঢোকার অনুমতি মিলে যেত। সময় সময় মাস কাবার হয়ে যেত দরখাস্তের উত্তর আসতে। এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যা কিছু দেখার দেখে নিতে হত। প্রদর্শ বস্তুর সঙ্গে তার পরিচিতি (label) প্রায়শই লেখা থাকত না এবং কোনও কিছু সম্বন্ধে প্রদর্শককে (Guide) জিজ্ঞাসা করলে তিনি বেশ চটে যেতেন। মিউজিয়মের উপর সংক্ষিপ্ত সারাংশ সহ বস্তু বিবরণ তালিকা (catalogue) জাতীয় একটি ছোট পুস্তিকা ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়—সেটাই ছিল সাক্ষর দর্শকদের মিউজিয়ম ও সেখানে রক্ষিত জিনিস সম্বন্ধে জানার একমাত্র সহায়ক। এল. সিমণ্ড (L. Simond) নামে একজন ফরাসী পর্য্যটক ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখে ১৮১০ সালে লেখেন, "আমাদের জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করে দেখার মত কোনও সময় দেওয়া হয়নি। আমাদের প্রদর্শক আমাদের কোনও প্রশ্নের প্রতি মনোযোগ না দিয়েই এগিয়ে যেতে থাকলেন।" পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে বলা হয়েছিল যে সকল প্রজন্মের জনগণের উপকারার্থে ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহ এবং ভবিষ্যতের সকল

সংযোজন ব্যবহার করা হবে। কিন্ত সেই আইন পাশ হবার অর্দ্ধশতাব্দী পরেও "সর্বজন হিতায়" ঘোষণাটি কথার কথা থেকে যায়। সংগ্রহশালাটি দীর্ঘদিন এমন রক্ষণশীল অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত হত যাঁরা মনে করতেন যে, সংগ্রহশালায় ঢোকা দর্শকদের দেওয়া সুবিধামাত্র, অধিকার নয়। এই সুযোগ পেয়ে তারা কৃতজ্ঞ থাকবে এবং পরিচালকদের শুধুমাত্র প্রশংসাই করবে, প্রশ্ন করবে না।

১৭০০ খৃষ্টাব্দের পর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল গ্যালারীতে ফি দিয়ে দর্শকেরা ঢুকতে পারতেন। সেখানেও পরিচয় পত্র দাখিল করতে হত এবং যে কেউ ঢুকতে পেতেন না।

জনসাধারণকে খুব বেশি নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে না আটকে শিল্প সংগ্রহ দেখতে দেবার ব্যাপারে জার্মানীর রাজন্যভোগুলি বরঞ্চ অনেক উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। ১৭৪৬ সালের পর থেকেই ড্রেসডেনের শিল্প গ্যালারীটি বিনা বাধায় সকলে দেখতে পারতেন।

অষ্টাদশ শতকে জার্মানী তিনশটি নগর ও আঞ্চলিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সব স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যগুলি ছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীন। এদের মধ্যে অর্থ ও সংস্কৃতিতে উন্নত রাজ্য ছিল দক্ষিণে ব্যাভেরিয়া ও উত্তরে প্রুশিয়া। এই দুটি রাজ্যের শাসন ও শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে মিউনিখ ও বার্লিন এর ফলে জার্মানীর সংগ্রহশালাগুলি এই দুটি নগরে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ব্যাভেরিয়ার শাসক, ইলেক্টর ম্যাক্স ইমানুয়েল (১৬৭৯—১৭২৬) একজন সংগ্রহ বাতিক রাজপুরুষ ছিলেন। আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে তিনি ইওরোপের নামী দামী শিল্পীদের কাজ, বিশেষ করে চিত্র ও পুঁথি সংগ্রহে মেতে যান। Schleissheim-এর দুর্গ প্রাসাদে তাঁর এই সংগ্রহ থাকত। প্যালাটিনেট নুরেমবার্গ শাখার কার্ল থিয়েডোর ১৭৭৯ সালে ব্যাভেরিয়ার রাজা হলে, তাঁর প্রযত্নে Schleissheim-এর সংগ্রহটি আরও সমৃদ্ধ হয়। এ ছাড়া Dusseldorf-এর চিত্র সংগ্রহটিও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে কার্ল থিয়েডোর এটি আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। Manheim-এ যে সংগ্রহটি ছিল তার পরিবর্দ্ধনও কার্ল থিয়োডোরের আর এক অবদান। পরবর্ত্তী শতকের প্রথম দিকে ডুসেলডর্ফ ও ম্যান-হেইমের সম্পদ সংগ্রহ মিউনিখে সরিয়ে আনা হয়। কার্ল থিয়োডোরের সময় আর একটি রাজকীয় সংগ্রহ গড়ে তোলেন প্যালাটিনেট শাখার ম্যাক্স জোসেফ, তাঁর মিউনিখের বাস ভবনে। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা চুক্তি অনুসারে ব্যাভেরিয়ার শাসনভার পেলেন প্রথম লাডউইগ। তিনি কার্ল থিয়োডোর ও ম্যাক্স যোশেফের সংগৃহীত চিত্র-ভাণ্ডার থেকে রেনেশাঁ-রোকোকো-বারুক শৈলীর এক বিশ্ব বিখ্যাত সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮৩৬ সালে, মিউনিখে। ইওরোপের ওল্ড মাস্টার্সদের রচনার এই চিত্র সংগ্রহশালার নাম Alte Pinakothek, জার্মানীর সাধারণ সংগ্রহশালা। লাডউইগ Boisseree Brothers এবং Wallerstein কর্ত্তৃক সংগৃহীত জার্মান মাস্টার্সদের চিত্র সংগ্রহ দুটি কিনে Alte Pinakothek-এর সংগ্রহটি মোটামুটি সর্ব ইওরোপীয় চিত্র শৈলীর সংগ্রহশালা করে তোলেন। প্রথম লাডউইগের

আর এক অসাধারণ কীর্ত্তি—উনবিংশ শতকের আধুনিক ইওরোপীয়, বিশেষ করে দক্ষিণ জার্মানীর রচনা সংরক্ষণের জন্য Neue Pinakothek নামে ১৮৫৪ সালে একটি পিকচার গ্যালারী স্থাপন। Neue Pinakothek কে আধুনিক চিত্রের প্রথম জাতীয় সংগ্রহশালা বলা যেতে পারে। নেপোলিয়নের ইওরোপ অভিযান কালে ওল্ড মাস্টার্স-দের বহু রচনা সংগ্রহ লুণ্ঠিত হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ায় সে সব শিল্পবস্তুর দর পড়ে যায়। ফলে সেগুলি তখম শিল্প-কলার ব্যবসায়ী ও উঠতি ধনী বণিক পরিবারদের হাতে চলে যায়। উনবিংশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকে ইওরোপের বাজারে ওল্ড মাস্টার্সদের রচনা খুবই দুর্লভ হয়ে পড়ে। উপরন্তু ফরাসী বিপ্লব, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালে জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যা-লয়ে উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দাবীতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষকে মানবতা ও যুক্তিবাদী এবং আধুনিক চিন্তা মুখী করে তোলে। নোতুন বণিকী সভ্যতার অভ্যুদয় ও শিল্প বিপ্লবের আবির্ভাব সেই সময়টিকে সামন্ততান্ত্রিক কৃষ্টি ও রুচি থেকে সরিয়ে আনতে শুরু করেছে। চারু-শিল্প সংগ্রহশালার ইতিহাসে এর প্রাথমিক প্রকাশ ঘটল মিউনিখে ঐ Neue (New) Pinakothek প্রতিষ্ঠায়। এই সংগ্রহশালাটি বর্তমানে বিগত দুই শতকের পাশ্চাত্য চিত্ররীতির অন্যতম শিল্প সংগ্রহালয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্যাভেরিয়ার রাজবংশীয় সংগ্রহভাণ্ডার বিচিত্র শিল্পবস্তু সংগ্রহে এতই বিপুল ছিল যে বর্তমানে ব্যাভেরিয়ার বারোটি সংগ্রহশালায় ঐ সম্পদ সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে। অবশিষ্ট অংশ থেকে গড়ে উঠেছে Residenzmuseum নামে একটি সংগ্রহশালা। ডিউক এবারহার্ড লাডউইগ (১৬৭৭-১৭৩৩ খৃঃ) তাঁর সমসাময়িক কালের ডাচ ও জার্মান শিল্পীদের সহস্রাধিক চিত্রে সমৃদ্ধ একটি সংগ্রহ গড়ে তোলেন এবং তাঁর এই সংগ্রহটিকে কেন্দ্র করে উটেমবার্গের রাজা প্রথম উইলিয়ম ১৮৪৩ সালে স্টুটগার্টের স্টেট গ্যালারীর প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাভেরিয়া ও উটেমবার্গের মত বাডেন দক্ষিণ জার্মানীর আর একটি রাষ্ট্র। বাডেন-বাডেন ও বাডেন ডারলাখ্-এর মারগ্রেভ রাজপরিবারের প্রাচীনতর ইওরোপীয়ান মাস্টার্সদের চিত্র সংগ্রহ ছিল। বৈবাহিক সূত্রে এই রাজপরিবার বিভিন্ন ধরনের শিল্পবস্তু উপঢৌকন পান। এঁদের সংগ্রহকে ভিত্তি করে কার্লসরুহির রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রদর্শকক্ষ Staatlische Kuntshall প্রতিষ্ঠিত হল। মারগ্রেভের গ্রান্ড ডিউক কার্ল ফ্রেডরিখ ১৮৪৫ সালে এই স্টেট গ্যালারীর প্রতিষ্ঠা করেন। কার্ল ফ্রেডরিখের মহিষী হেসের রাজকন্যা ক্যারোলাইন লুইস সে যুগের বিচারে রুচিসম্পন্না শিল্পরসিকা ছিলেন। তাঁরই আগ্রহে এই বিখ্যাত সংগ্রহশালাটি গড়ে ওঠে। হেসের রাজকন্যা ক্যারোলাইনের শিল্প রুচি বংশজাত। হেসের রাজ পরিবারেও একটি বৃহৎ শিল্প ভান্ডার ছিল। অষ্টম ল্যান্ডগ্রেভি উইলিয়ম (১৭৩০-১৭৬৬ খৃঃ) সেটি গড়ে তোলেন। উন্নত মানের শিল্পবস্তু চেনার অসাধারণ চোখ ও রুচিবোধ ছিল ল্যান্ডগ্রেভির। ক্যাসেল নগরীর Staatlisch Gemaldegalarie মূলত ল্যান্ডগ্রেভির নিজের সংগ্রহ।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে জার্মান জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। প্রোটেস্টান্ট

খৃষ্টান ধর্ম জার্মানীর জাতীয় সংহতির প্রাথমিক স্তর তৈরী করে দেয়। রোমান ক্যাথলিক রোমের ভ্যাটিক্যান যাজক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত অস্ট্রিয় সম্রাটদের শাসন থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা এই জাতীয়তা বোধকে তীব্রতর করে তোলে। জার্মানীর সংগ্রহশালায় এর প্রতিফলন দেখা গেল নুরেমবার্গে, Freiheer Von und Zu Aufsess কর্তৃক ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত Germanisches National Museum এর সংগ্রহ-বৈশিষ্ট্যে। জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলের জার্মান শিল্পীদের রচিত চিত্র সহ জার্মান সংস্কৃতি ও শিল্পের নানা ধরনের নিদর্শন—ভাস্কর্য, হস্তীশিল্প, লোক কলা, গৃহ-সামগ্রী, পুরাবস্তু, পুস্তক, পুঁথি প্রভৃতি জার্মান জাতীয় সংগ্রহশালার এক ছাদের তলায় প্রথম প্রদর্শিত হল। দক্ষিণ জার্মানীর আর একটি অমূল্য সম্পদ ইওরোপের মাস্টার্সদের রচনা সমৃদ্ধ চিত্রশালা Hesse শহরের Hessisches Landesmuseum, যেটি কোলনের ব্যারন Huepsch এর দেওয়া কিছু ইওরোপীয় পেইন্টিং থেকে ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লাডউইগের আগ্রহ ও অর্থানুকুল্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লাডউইগ (ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদ) সেই জাতীয় রাজ পরিবারের উত্তর পুরুষ যাঁরা অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিদীপ্তির (Enlightenment) ধারায় লালিত পালিত। জ্ঞানদীপ্ত অষ্টাদশ শতকের ইওরোপীয় রাজতন্ত্র এবং তৎকালীন শত শত রাজন্য-বর্গের আদর্শবাদ। জ্ঞানদীপ্ত ঐ শতকের পশ্চিমী যুগ মানসিকতা। সে যুগে সমস্ত ইওরোপ জুড়ে যে জ্ঞানোন্মেষ চলছিল, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের রেনেশাঁ বা নবজাগরণের শতাব্দীর পর তেমনটি আর ঘটেনি। ইতালীর নবজাগরণের ইওরোপ-ব্যাপী প্রসারণের উত্তর পর্যায় হল জ্ঞানদীপ্তির যুগ। সে যুগের ভাবাদর্শের মূল—প্রকৃতিবাদ (naturalism), যুক্তিবাদ (rationalism), আশাবাদ (optimism) এবং মানব-হিতৈষণা। ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের রাজতন্ত্র যেমন গণতন্ত্রীকরণের ফলে অষ্টাদশ শতকে নিয়মতান্ত্রিক হয়ে ওঠে, তেমনি ব্যাভেরিয়া, প্রুশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শিল্পী-বিজ্ঞানী-দার্শনিক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রশাসনিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপের রাজন্যবর্গ অজস্র সংগ্রহ ভাণ্ডারকে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে এমন সাধারণ (public) অথবা জাতীয় (national) অথবা রাষ্ট্রীয় (State), নিদেন পক্ষে প্রাসাদ (palace) সংগ্রহ-শালায় রূপান্তরিত করেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইওরোপের সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার ইতিহাসের মৌলিক চালিকা শক্তি হল ঐ জ্ঞানদীপ্ত তথা জানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র। জ্ঞানদীপ্ত ভাবাদর্শের প্রকৃতিবাদ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের (natural history) চর্চাকে উৎসাহিত করার ফলে, ইওরোপীয় সংগ্রহভাণ্ডারগুলিতে এতদিন যে কৌতুহল উদ্দীপক ন্যাচারালিয়া ও অডিটিস (odities) এর এলোমেলো সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল, সেগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন শুরু হল। নানা ধরনের বস্তু সমন্বিত সংগ্রহভাণ্ডার ও সংগ্রহশালাগুলিতে এর প্রভাব

পড়ায়, অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ থেকে ঊনবিংশ শতক জুড়ে বহু ন্যাচারাল হিস্ট্রি (প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, নিসর্গবিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি) বিষয়ের উপর নিদর্শনগুলি নিয়ে পৃথক বিভাগ বা সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। এর সঙ্গে এতদ্বিষয়ে নানান বিদগ্ধ-সংস্থা—সোসাইটি ও একাডেমি—এবং সমীক্ষাসংস্থা (Surveys) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃ-তত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ের তথ্য ভিত্তিক সংগ্রহ যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমনি পূর্বে সংগৃহীত নিদর্শনের উপযুক্ত মূল্যায়ন সম্ভব হল। জ্ঞানদীপ্তির মানব হিতৈষণাবাদ পারিবারিক সংগ্রহ-ভাণ্ডারগুলিকে, জনসাধারণ না হোক, অন্তত পক্ষে মধ্যবিত্ত, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার প্রাথমিক পটভূমি তৈরী করে দেয়। ঐ ঊনবিংশ শতকেই জার্মানীতে চার্লস ডারইন (১৮০৯—১৮৮২ খৃঃ) ইওরোপের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত জীবাস্থির উপর গবেষণা করে, বিজ্ঞান চিন্তার জগতে যুগান্তকারী, প্রাণীর ক্রমাভিব্যক্তি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ১৮৫৯ সালে তাঁর লেখা 'অরিজিন অফ স্পিসিস' গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে জীব-বিজ্ঞান-সংগ্রহশালার নিদর্শনের বিভাগীকরণ ও বিন্যাসে যুক্তি-সিদ্ধ প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ডিসেণ্ট অফ ম্যান' গ্রন্থটি (১৮৭১) উল্লেখ্য।

জার্মানীর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর ফ্রাঙ্কফার্ট,—ভূ-স্বামী নয়—ধনিক-বণিকের শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র। সেটি যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণের শহর। মধ্য-যুগীয় সামন্ত তন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হয় ইওরোপের শক্তি গোষ্ঠীর প্রাচ্য-সন্ধানী ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং পূর্ব,পশ্চিম ও দক্ষিণের মহাদেশগুলিতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্যিক প্রসারে। এর ফলে অষ্টাদশ শতকে যে বণিকী যুগের অভ্যুদয় হয় তার সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের মেল-বন্ধনে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বণিক, ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতি গোষ্ঠী ক্রমশঃ অর্থবান হয়ে উঠলেও, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপত্তি ও অবদান তখনও পর্যন্ত ব্যাপক ও দৃঢ়মূলে হয়ে ওঠেনি। দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী সামন্ত প্রভুদের উন্নত শিল্পরুচির অনুসারী হয়ে উঠতে পারেনি এই নোতুন বণিক সমাজ। ফলে আর্ট ডিলারদের এই নবোদ্ভূত অর্থবান বণিকদের, নিম্নমানের কলা ও পুরাবস্তু গছিয়ে দিতে অসুবিধা হয়নি। ফ্রাঙ্কফার্টে এ রকম একজন সংগ্রাহক ছিলেন ধনী ব্যাঙ্কার জোহান ফ্রেডরিখ স্টাডেল। তাঁর অর্থ ছিল, কিন্তু চোখ তৈরী ছিলনা। তাই তিনি নেপোলিয়ানের অভিযানকালে অনিশ্চিত বাজার থেকে পাঁচশর উপর যে চিত্র সংগ্রহ করলেন, সেগুলির অধিকাংশই নীচুমানের। সংগ্রহের মান যাই হোক, তিনি সেগুলি ১৮১৬ সালে নগরবাসীদের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ গিল্ডার্স মুদ্রাসহ দান করলেন। সেই দানে ফ্রাঙ্কফার্ট শহরে স্থাপিত হল একটি আর্ট স্কুল, আর্ট এসোসিয়েশন ও সংগ্রহ-শালাসহ, Stadelsches kunstinstut, যে শিল্প সংস্থার সাহায্যে এগিয়ে এলেন অর্থবান নাগরিকেরা। তাদের দানে এবং প্রকৃত শিল্পানুরাগীদের চেষ্টায় উন্নতমানের চিত্র-সংগ্রহে এই সংগ্রহশালা বেশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই রকম আর একটি আর্ট এসোশিয়েশন ও তৎসংলগ্ন শিল্প সংগ্রহশালা স্থাপিত হল জার্মানীর উত্তরাঞ্চলে

অবস্থিত হামবার্গ শহরে। ব্রেমেন শহরেও এরকম যে আর্ট গ্যালারী অর্থাৎ Kunsthalle, ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা আজও টিকে আছে। ব্রেমেনের নাগরিকদের সোৎসাহ পৃষ্টপোষকতায় এই Kunsthalle অচিরে নাগরিকদের একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল। শহরবাসীদের এমন শিল্পানুরাগ সে যুগে উত্তর ও পশ্চিম জার্মানীর এক বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। যাজক ওয়ালরাফ ১৮২৪ সালে তাঁর সংগ্রহ কোলন নগরবাসীদের উদ্দেশ্যে দান করেন। এর সঙ্গে জোহান হেইনরিখ রিচার্ট্জ এর সংগ্রহযুক্ত হয়ে ১৮৫৪ সালে স্থাপিত হল Wallraf-Richartz Museum, কোলনের গর্বের প্রতিষ্ঠান। মধ্য জার্মানীর ব্রানসউইক ও হ্যানোভারে গড়া হল দুটি সংগ্রহ, Herzog Anton Ulrich Museum ও Niedersachsische Landesgaleric। ব্রানসউইকের সংগ্রহশালাটি রাজ পরিবারের সংগ্রহ থেকে উদ্ভূত সংগ্রহশালা এবং বেশ প্রাচীন। ব্রান্সউইকের ডিউক অ্যান্টন উলরিখের (Anton Ulrich) একটি ভাল শিল্প সংগ্রহ ছিল এবং সেটি রাখার জন্য তিনি একটি অট্টালিকা নির্মাণ করান ১৬৯৪ সালে। তাঁর উত্তর পুরুষেরাও এই সংগ্রহটি রক্ষা ও পুষ্ট করেন। ১৭৭৬ সালে মুদ্রিত ঐ সংগ্রহ-শালার প্রথম তালিকা বিবরণ থেকে জানা যায়, ঐ সংগ্রহে ২১২৯-টি চিত্র ছিল। নেপোলিয়নের ইওরোপে অভিযান কালে ফরাসী সৈন্যরা ঐ অট্টালিকা ভেঙে ফেলে (১৮০৬ খৃঃ) এবং বহু মূল্যবান দুর্লভ চিত্র লুণ্ঠন করে প্যারিসে নিয়ে যায়। নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ সালে ব্রান্সউইকের ঐ লুণ্ঠিত সম্পদের মূল্যবান অংশ ফেরত পাওয়া যায় এবং Herzog Anton Ulrich Museum পুনর্গঠিত হয়। হ্যানোভারের Niedersachsische Landesgalerie পৌরসভা পরিচালিত শিল্প সংগ্রহালয়। অবশ্য এই পৌর গ্যালারীর মূল সংগ্রহটি এসেছে August Kestner সংগ্রহ থেকে। কেস্টনারের পিতা Wearther's Lotte, যিনি হ্যানোভার রাজসভার রাষ্ট্রদূত হয়ে প্রায় আটাশ বছর রোমে ছিলেন, ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে। তখন সেই সূত্রে তিনি ইতালীর বিভিন্ন রীতি ও শৈলীর শিল্পীদের, বিশেষ করে র‍্যাফেল-পূর্ব শিল্পীদের রচনা সংগ্রহ করে আনেন। এছাড়া ঐ পৌর চিত্রবীথি গুয়েফ (Gueff) রাজপরিবারের সংগ্রহের একটি অংশ এবং বার্ণহার্ড হাউসমানের বিখ্যাত স্যাক্সনি মাস্টার্সদেরও সংগ্রহটি পায়। পরিশেষে, বার্লিনের কাইজার ফ্রেডরিখ মিউজিয়মের কথা না বললে জার্মান শিল্প-কলা সংগ্রহশালার ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পশ্চিম জার্মানীর এই বৃহত্তম শিল্প ও পুরাবস্তু সংগ্রহে ১৯৩১ সালের তালিকানুসারে চিত্রের সংখ্যা প্রায় ২৯০০ এবং ইওরোপের সকল অঞ্চল, শৈলী ও শিল্প আন্দোলনের নিদর্শন এখানে আছে। নেপোলিয়নের শাসনের পরাধীনতা থেকে যে বছর প্রুশিয়া তথা সমস্ত জার্মানী মুক্তিলাভ করে সেই বছরই, ১৮১৫ সালে, এই সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রুশিয়ার প্রধানতম নগর, বার্লিনে। ১৮৩০ সালে বিশেষ ভাবে এই বহুমুখী সংগ্রহশালার জন্য একটি ভবন নির্মিত হলে মিউজিয়মের সংগ্রহ সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। জার্মানীর এই জাতীয় অন্যান্য সংগ্রহালয়ের মত

বার্লিনের এই সংগ্রহশালার মূল অংশটি আসে বিভিন্ন রাজপরিবারের সংগ্রহ ভাণ্ডার, বিশেষত হোয়েন জোর্লেন রাজপরিবারের ফ্রেডরিক-দি গ্রেট, কর্ত্তৃক সংগৃহীত অসাধারণ শিল্প সম্পদ, সানসৌসি পার্কে অবস্থিত, সম্রাটের নিজস্ব গ্যালারী থেকে। তাঁর সংগ্রহশালায় সমস্ত জার্মানী, ইটালী, নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শিল্প, ইতিহাস, পুরাবস্তু প্রভৃতি সংগৃহীত হয়, কেননা তিনি ১৭৪১ সালে প্রুশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে ১৭৮৬ সালে মারা যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে প্রুশিয়া ও অন্যানা অধিকৃত রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন, অস্ট্রিয়া ও হোলি রোমান সম্রাটদের প্রভুত্ববাদের হাত থেকে, সমগ্র জার্মানীকে মুক্ত করার আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যান। এই কারণে তাকে বহু যুদ্ধ ও শান্তি চুক্তি করতে হয় এবং ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়। তিনিই প্রথম জার্মান সম্রাট যিনি জার্মান জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও সংহতি সাধনে প্রয়াসী হন। এ ব্যাপারে তাঁর অদম্য চেষ্টার ফল পেতে আরও দীর্ঘ কয়েক দশক লাগলেও, যে জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে জার্মানীর সবচেয়ে নামী দামী সংগ্রহশালাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জনক ছিলেন ফ্রেডরিখ দি গ্রেট। মহান ফ্রেডরিখ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যথা স্টাইন, ফিস্টি, হেগেল, হাসার, বোহমার প্রভৃতি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্যান-জার্মানিজম্, জার্মান জাতির লোক মাত্রই ঐক্যবদ্ধ হোক, এরকম জাতীর ঐক্য-স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে। জার্মানীর মিউজিয়মের ইতিহাসের সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ঠিক ঐ যুগ। আবারও বার্লিনের কাইজার-ফ্রেডরিখ মিউজিয়মের কথায় ফিরে আসি। ১৮২১ সালে বার্লিনে ডোমিসাইল্ড সোল্লি (Solly) নামক এক ব্যক্তির আধুনিক মানসিকতার সংগ্রহ বার্লিন মিউজিয়ম সংগ্রহ করায়, এর সংগ্রহের ব্যাপ্তি আরও বেড়ে যায়। সেই সময় নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে বাজারে শিল্প ও পুরাবস্তুর দর নামার তাৎক্ষণিক সুযোগ গ্রহণ করে, সোল্লি বহুবিচিত্র দ্রব্যের এক অসাধারণ সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। সংগ্রাহক হিসাবে সোল্লি ছিলেন একাধারে আধুনিক ও দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন। বার্লিনের আলোচ্য সংগ্রহশালার প্রথম অধ্যক্ষ -ওয়াগেন (Waagen) সে যুগের খ্যাতনামা শিল্প বেত্তা ও শিল্প রসিক। ঐ শতকের শেষের দিকে শিল্প বেত্তা Wilhelm von Bode'র অধ্যক্ষতায় দীর্ঘ তিন দশকে সংগ্রহের মান ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে আজ বার্লিনের কাইজার ফ্রেডরিখ- মিউজিয়ম বা Staatilich museum তার ষোলটি বিভাগের বিপুল ও বিচিত্র সংগ্রহের উৎকৃষ্টতা ও ব্যাপকতায় পৃথিবীর অন্যতম শিল্প ও পুরা সংগ্রহালয় বলে খ্যাত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানী বিভক্ত হওয়ায় বার্লিনের এই রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ-শালা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। বার্লিনের চিত্রশালাগুলিতে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ওল্ড মাস্টার্সদের রচনা এবং পরবর্ত্তীকালের শিল্পীদের কাজ ভিন্ন ভিন্ন ভবনে রাখা হয়। জার্মানীর অনেক শহরে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের পৃথক পৃথক সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে। শিল্পবিচারের দিক থেকে এ জাতীয় বিভাজন

খুবই যুক্তি সঙ্গত। ফ্রান্সের আর্ট গ্যালারীগুলি পরে ঐ প্রথানুসরণ করল। সমসাময়িক শিল্পীরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি দান করে আধুনিক শিল্প সংগ্রহে প্রভূত সহায়তা করেন। এই বিভাজনের প্রবর্তক হুগো বার্লিন থেকে মিউনিখের মিউজিয়মের অধ্যক্ষ হলে সেখানেও একই ঘটনা ঘটল। এমনকি সেখানে তিনি ইম্প্রেশনিস্ট-পরবর্তীকালের শিল্পীদের চিত্র সংগ্রহ প্রদর্শনে সক্ষম হওয়ায়, আধুনিক শিল্প যে ঐতিহাসিক কারণে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হওয়া দরকার শেষাবধি সে সত্য সমাজকে বোঝান গেল। হুগো ও হামবার্গ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ লিস্টওয়ার্কের এই দৃষ্টিভঙ্গীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে, বিশ্বের নানা শহরে, বিংশ শতাব্দীতে বহু মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট গড়ে তোলা হয়েছে। জার্মানী শিল্পসংগ্রাহালয় সম্বন্ধে আর একটি তথ্য জানিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। একমাত্র পশ্চিম জার্মানীতেই, যে দেশের আয়তন পশ্চিমবঙ্গের সমান, মোটামুটি ১৫০টি আর্ট মিউজিয়ম আছে।

১৯৬১ সালের এক পরিসংখ্যান অনুসারে শুধুমাত্র পশ্চিম জার্মানীতে প্রায় ৬০০টি আঞ্চলিক সংগ্রহশালা (Local and Regional Museums) রয়েছে। প্রায় সকল শহরেই এক বা একাধিক সংগ্রহশালা আছে। শহরে সিনেমা, থিয়েটার, নৃত্যমঞ্চ, স্টেডিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত একটি সংগ্রহশালা না থাকাকে নগরবাসীরা নগরীর অনগ্রসরতা ও অনাধুনিকতা মনে করে। অভিজাত পরিবার বর্গের প্রাসাদ ও দুর্গ-প্রাসাদে যে সমস্ত চিত্র, ভাস্কর্য্য, প্রতিকৃতি, আলংকারিক কাজ, পুঁথি, মেডেল, মুদ্রা প্রভৃতির সংগ্রহ রয়েছে সেগুলিতে বর্তমানে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। বিভিন্ন মনীষীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত জীবনী ও স্মারক বিষয়ক সংগ্রহালয়ের মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত। যেমন ফ্রাঙ্কফার্টের গ্যেটে মিউজিয়ম। মেইঞ্জের গুটেনবার্গ মিউজিয়ম মুদ্রনের উপর একটি অনন্য সাধারণ সংগ্রহশালা। সিবুলের নোল্ড মিউজিয়ম নোল্ড ও তাঁর সমসাময়িক খ্যাতিমান শিল্পীদের রচনা সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা। রেম্‌সিঘডের রন্টজেন মিউজিয়ম প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর উপর সংগ্রহশালা। প্রায় আটটি সংগ্রহশালায় বিশেষীকৃত বিষয়ের (typical) উপর বিস্ময়কর সংগ্রহ আছে। বার্লিনে সঙ্গীত-যন্ত্র, অফেবার্কে চামড়ার জিনিস, উল্‌মের রুটি-পাউরুটি, স্পেয়ের এবং মীর্সবার্গে মদের উপর সংগ্রহশালা ছাড়াও, জুতো, বাইসাইকেল, ব্লেড-ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি জিনিসের অসাধারণ সংগ্রহ আছে। বার্লিন ও মিউনিখের ড্রইং ও প্রিন্টের সংগ্রহ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর ১৮১৭ সালে ফ্রাঙ্কফার্টে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত Natur museum and Forschungs Institut Senckberg, যেটি পৃথিবীর একটি অন্যতম ন্যাচারাল সাইন্স মিউজিয়ম। এই বিষয়ে আরও কুড়িটি সংগ্রহশালা পশ্চিম জার্মানীতে আছে যার মধ্যে ব্রান্‌সউইকের Naturhistorisches Museum প্রাচীনতম, প্রতিষ্ঠা ১৭৫৪ সাল।

পশ্চিম জার্মানীতে প্রায় এক ডজন নৃতত্ত্বের উপর সংগ্রহশালা আছে। তার মধ্যে ব্রেমেনের Ubersee Museum প্রাচীনতম। ১৭৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয়। বার্লিনের Museum for Volker Kunde ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্ব-

পূর্ণ, কেননা এই সংগ্রহের আকার বিশাল এবং তার একটি অংশ সপ্তদশ শতকের ব্রান্ডেনবার্গের ইলেক্টর পরিবারের Kunst Kammar থেকে এসেছে। Kunst Kammar ১৮২৯ সাল পর্যন্ত একটি পৃথক সংগ্রহশালা ছিল। নৃতত্ত্বের আর একটি বৃহৎ সংগ্রহ মিউনিখের Staatlisches Museum fur Volker Kunde। স্টুটগার্ট, কোলোন, হামবার্গ, হ্যানোভার, ফ্রাঙ্কফার্ট প্রভৃতি শহরের নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালাগুলিও উল্লেখযোগ্য।

নেদারল্যান্ডের পরিচিত নাম হল্যান্ড। মধ্যযুগে ইওরোপের অন্যান্য রাজ্যের মত সে দেশেও সংগ্রহ ভান্ডারের চরিত্র ছিল রাজকীয় ও সামন্ততান্ত্রিক। বৈদেশিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের ফলে যে ধনী বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে. সেই বণিক শ্রেণীও বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। উনবিংশ শতকে অনেক সাধারণ সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়। ১৭৯৮ সালে হারলেম শহরে Teylers Museum নামে যে সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত হয়. সেটি আজও টিকে আছে। প্রিন্স অব অরেঞ্জ, চতুর্থ উইলিয়ম ও পঞ্চম উইলিয়ম অষ্টাদশ শতকে নেদারল্যান্ড সংযুক্ত প্রজা তন্ত্রের Stadtholder থাকার সময় যে বিপুল শিল্প সংগ্রহ গড়ে তোলেন, তাকে অবলম্বন করে পবরর্ত্তীকালে হেগ শহরে Mauritshuis Art Gallery এবং রাজধানী আমস্টারডামে Rijksmuseum প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সালে ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় নেদারল্যান্ডে বাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কর্পোরেশন ও রাজন্যবর্গের সকল রকম সংগ্রহ বাজেয়াপ্ত করা হল। বাজেয়াপ্ত করা সকল শিল্প ও ঐতিহাসিক নিদর্শন একত্রিত করে ১৮০০ সালে হেগের Mauritshuis Art Gallery স্থাপিত হল। ফরাসী বিপ্লবী বাহিনী কিন্তু ১৭৯৫ সালে ইংল্যান্ডে পলাতক নেদারল্যান্ডের রাজা পঞ্চম উইলিয়মের ঐ চিত্র সংগ্রহের একটি অংশ প্যারিসে নিয়ে যায়। সেই লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত আসে নেপোলিয়নের পতনের পর, ভিয়েনা চুক্তির মাধ্যমে ১৮১৫ সালে। ১৮২১ সালে Mauritshuis-এর সংগ্রহ জাতীয় সংগ্রহশালা বলে ঘোষিত হয়। উইলিয়মের রাজত্বকালে প্রকৃতি বিজ্ঞানের জাতীয় সংগ্রহশালা (১৮২০), পুরাবস্তুর জাতীয় সংগ্রহশালা (১৮১৮) লেডেনে, এবং মুদ্রা, মেডেল, কাটস্টোন প্রভৃতি দ্রব্যের রয়্যাল ক্যাবিনেট হেগ শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ১৯৩টি চিত্র ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়নি সেগুলি হেগ শহরে ১৮০০ সালে Ten Bosch House এ সাধারণের জন্য প্রদর্শিত হল। নেপোলিয়নের সময় তাঁর ভাই প্রথম লুই হল্যান্ডের রাজা হলে, তিনি রাজকীয় সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় হেগ থেকে ঐ চিত্রগুলি রাজধানী আমস্টারডামে সরিয়ে আনেন। এই সঙ্গে নিলাম থেকে কিনে এই সংগ্রহশালার চিত্র সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ করে চিত্র সংগ্রহটি Tripenhuis প্রাসাদে রাখা হল। তখন এর নাম ছিল Tripenhuis কালেকশন। পরবর্ত্তীকালে ১৮৮৫-১৮৮৭ সালে এই সংগ্রহকে ভিত্তি করে হল্যান্ডের বিখ্যাত শিল্প সংগ্রহালয় Rijksmuseum স্থাপিত হল। এখানে স্মরণীয় যে রেনেশাঁ ও তৎপরবর্ত্তীকালে ডাচ রীতির শিল্পশৈলীর খ্যাতি সমগ্র ইওরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রখ্যাত শিল্পী Rembrant ডাচ শিল্পীদের পুরোধা। সঙ্গত কারণে হল্যান্ডের

সকল আর্ট মিউজিয়মে ডাচ শৈলীর প্রাধান্য। অবশ্য শিল্পানুরাগী ও শিল্প শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে ইওরোপের অন্যান্য রীতির চিত্রে হল্যাণ্ডের শিল্প সংগ্রহালয়-গুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়েছে। জার্মানীর মতন হল্যাণ্ডের বাণিজ্য সম্পদে সমৃদ্ধ নাগরিক মণ্ডলী নিজ নিজ শহরে, উপযুক্ত শিল্প সংগ্রহ গড়ে তোলায় যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দেখাতেন। হল্যাণ্ডের পৌরসভা কর্তৃক শিল্প সংগ্রহ-শালা স্থাপনে সংগ্রহশালার সুহৃদ নামক (Friends of the museum) নাগরিক মণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখযোগ্য।

পৌরসভাই নয়, নানা সোসাইটি ও ফাউণ্ডেশনও এই কাজে এগিয়ে আসেন এবং তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালাগুলি বিভিন্ন বিষয়ের আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সংগ্রহ শালা হয়ে ওঠে।

ভিয়েনা চুক্তিতে হল্যাণ্ডের সঙ্গে বেলজিয়াম যুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৩৫ সালে বেলজিয়াম আলাদা হয়ে গেলে হল্যাণ্ডের সংগহশালা আর্থিক দুর্দশার জন্য অবহেলিত হতে থাকে। তখন সরকারী অনাগ্রহ ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে Victor de Stuers তাঁর এক প্রবন্ধে তীব্র সমালোচনা করতে, সরকার এই ব্যাপারে একটি উপদেষ্টা পর্ষদ নিয়োগ করেন এবং ১৮৭৫ সালে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের অধীনে শিল্প ও বিজ্ঞান কে গ্রহণ করে এই বিভাগের দায়িত্ব দেন Victor de Stuers কে, যাঁর প্রথম কাজ হল কতকগুলি সংগ্রহশালাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরাসরি সরকারের আর্থিক দায়িত্বাধীনে আনা। তাঁরই প্রযত্নে Trippenhuis সংগ্রহটি স্থানান্তরিত করে ১৮৮৫ সালে আমস্টারডামে Rijksmuseum স্থাপিত হল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে বিভিন্ন ছোট ছোট শহরে বহু সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যন্ত্র বিদ্যা, নৌ-পরিবহন, নৃতত্ত্ব, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিষয়ের উপরও নানান সংগ্রহশালা নেদারল্যাণ্ডে আছে। ১৯৩৫ সালের কিছু পরে শিল্পী ভ্যান গগের ২৭০ টি চিত্র Mrs, Kroller Muller জাতির উদ্দেশ্যে দান করলেন এবং Kroller Muller National Museum স্থাপিত হল। এখানে উল্লেখ্য যে বর্তমানে এই সংগ্রহশালায় পনের হাজার একর উন্মুক্ত জমিতে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি সাধারণ স্থাপত্য সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় Arnhem এর Netherlands Open Air Museum সরকারী সংগ্রহশালায় পরিণত হল। Zuider zee Museum প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৫০ সালে, সেখানকার যে সংস্কৃতি দ্রুত বিলুপ্ত হতে চলেছে তার সংরক্ষণের জন্য। লেডেনে অবস্থিত প্রাকৃত বিজ্ঞানের সংগ্রহ-শালাটিও জাতীয় সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করে, Rijksmuseum for the History of Natural Sciences নামকরণ করা হল। Arnhem-এর Open Air Museum ও Leyden Rijksmuseum for the History of Natural Science দুটি জাতীয়করণের আগে সোসাইটি পরিচালিত ছিল। পরিশেষে জানাই পোষাক পরিচ্ছদের উপর হেগে একটি সংগ্রহশলো গড়ে উঠেছে। Netherlands Maritime History Museum নামে ডাচদের কয়েক শতক ব্যাপী নৌবাণিজ্য, নৌযুদ্ধ

এবং সামুদ্রিক পরিবহন ব্যবস্থার ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করে সমুদ্রাভিযানের উপর একটি অনন্য সাধারণ সংগ্রহশালা আমস্টারডামে গড়ে উঠেছে ১৯১৩ সালে। এই বিষয়ে প্রাচীনতম সংগ্রহশালা রটটারডামের Prince Henry Maritime Museum (১৮৫২ খৃঃ)। Groninpen শহরের Northern Maritime Museum এবং Sneek শহরের Frisian Maritime Museum এই বিষয়ের উপর দুটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত সংগ্রহশালা।

উত্তর ইওরোপে বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত সাতকোটি মানুষের দেশ সুইডেন। স্বাধীন সুইডেনের ইতিহাসের শুরু ১৫২৩ সাল থেকে, যখন Gustavus Vasa ডেনমার্কের কাছ থেকে স্বদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেন। ঐ ষোড়শ শতক থেকেই সুইডেনে রাজকীয় সংগ্রহভাণ্ডার গড়ে তোলার সূত্রপাত হল, কেননা একদিকে দক্ষিণ থেকে রেনেশাঁর ঢেউ লাগল সে দেশে, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হল নবলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করার উদ্যমে। প্রোটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে দেশে এল ধর্মীয় সংহতি। অবশ্য এজন্য সুইডেনের রাজাদের অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহের জয়, পরাজয় ও সন্ধির মধ্যে কাটাতে হয়েছে। আর এর ফলেই সুইডেনে গড়ে উঠল এক অসাধারণ যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ-সম্ভারের সংগ্রহ ভাণ্ডার, রাজকীয় অস্ত্র-ভাণ্ডার, Kangl Livrust Kammeren—নান্দনিক, ঐতিহাসিক ও কারিগরী গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র-শস্ত্র, বর্ম, বিজয়স্মারক, রণকেতনের অসংখ্য নিদর্শনের সংগ্রহালয়—যেখানে বিজিত রণকেতন ছিল চার হাজার। ষোড়শ শতকে আর একটি সংগ্রহ ভাণ্ডার স্থাপনের ইতিহাসটি একটু বিচিত্র। সুইডেন যখন ডেনমার্কের অধীনে নরওয়ে-ফিনল্যাণ্ড-সুইডেন সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে এল, তখন ডেনমার্ক ও সুইডেনের মধ্যে কোর্ট অফ্ আর্মসের ত্রিমুকুট ব্যবহারের অধিকার কে পাবে, তাই নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। রয়্যাল রেকর্ড অফিসের ইনচার্জ তখন রাজবংশের পারিবারিক মুদ্রা-মেডেল সংগ্রহ ঘেঁটে এই বিবাদের মীমাংসা করে দেন। এর ফলে রয়্যাল রেকর্ড অফিসে বহু মুদ্রা ও মেডেলের সংগ্রহ এনে গচ্ছিত রাখা শুরু হয় এবং ১৬৩০ সালে Gustavus Adolphus II তাঁর মুদ্রার সংগ্রহটি শুধু যে দান করলেন তাই নয়, এই দানের পূর্বে "তিরিশ বছরের যুদ্ধে যোগদান করতে যাবার আগে, স্টেট অ্যান্টিকুয়োরিয়ান নিয়োগের জন্য পদ সৃষ্টি করে গেলেন। এখনও সেই পদ আছে। ১৫৩০ সালে ঐ জাতীয় পুরাতত্ত্ব ও সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদসৃষ্টি ও লোক নিয়োগ বিশ্বের প্রথম না হলেও, বেশ প্রাচীন নজির। সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় ঘোষণা সে যুগের বিরল দৃষ্টান্ত বলতে হবে বৈকি। যতদূর জানা যায় ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী (১৫০৯-১৫৪৭) প্রথম অ্যান্টিকুয়োরিয়ানের পদ সৃষ্টি এবং লোক নিয়োগ করেন। ১৬৭৯ থেকে ১৬৯৩ সাল পর্য্যন্ত যিনি স্টেট অ্যান্টিকুয়োরিয়ান ছিলেন, সুইডেনের সেই বিখ্যাত গবেষক ও সংগঠক Johan Hadorph-এর প্রযত্নে পরিপুষ্ট হল ঐ পুরাবস্তু সংগ্রহ। ১৭৮৬ সালে ফরাসী দৃষ্টান্ত অনুসারে সুইডেনে রয়্যাল একাডেমী অফ্ লিটারেচর, হিস্ট্রী এণ্ড অ্যান্টিকুইটি প্রতিষ্ঠিত হল এবং স্টেট অ্যান্টিকুয়োরিয়ান

হলেন তার সচিব। এই একাডেমির উপর পুরাবস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও গবেষণার দায়িত্ব দেওয়া হল। ১৭৯২ সালে শিল্প রসিক রাজা তৃতীয় গুস্তাভ একটি সাধারণ সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করলেও, সেই বছরেই তিনি খুন হওয়ায়, সেই সংগ্রহশালা আর স্থাপিত হল না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ১৭৯২ সালে, রিজেন্সী সরকার রাজদুর্গের চিত্রসম্ভারের সঙ্গে রাজমাতার চিত্র, মুদ্রা ও মেডেলের সংগ্রহটি ক্রয় করে রাজপ্রাসাদে রাজকীয় সংগ্রহশালা, Kangl museum-এর উদ্বোধন করেন। পরে মেডেল ও মুদ্রার সংগ্রহটি স্টেট অ্যান্টিকুয়েরিয়ানের মূলে সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রীয় পুরাবস্তু বিভাগের কাজকর্ম ও সংগ্রহের গুণগত মান ও পরিমাণ স্টেট অ্যান্টিকুয়েরিয়ান Bror Emil Hildebrand এর কার্যকালে (১৮৩৭-'৭৯ খৃঃ) এত উন্নত হয় যে ঐ বিভাগের প্রত্ন-সংগ্রহশালাটি গুরুত্ব ও আধুনিকতার দিক থেকে, ইওরোপের অন্যতম আর্কিয়োলজি মিউজিয়মে পরিণত হল। রয়্যাল আর্মারি, রয়্যাল মিউজিয়ম অফ আর্ট এবং স্টেট এ্যান্টিকুইটি বিভাগের প্রত্ন-সংগ্রহ ইতিমধ্যে যার নাম দেওয়া হয়েছে ন্যাশান্যাল হিস্টরিক্যাল মিউজিয়ম, Kangl Historiska Museum, একই সঙ্গে রাজধানী স্টকহোমের রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হওয়ায়, প্রচন্ড স্থানাভাব দেখা দেয়। এই কারণে একটি নবনির্মিত ভবনে জাতীয় সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হল ১৮৬৬ সালে। ১৮৮৪ সালে রয়্যাল আর্মারি সংগ্রহটি পুনরায় রাজপ্রাসাদে সরিয়ে এনে জাতীয় সংগ্রহ শালায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বিভাগ খোলা হল। ১৯৪৩ সালে স্থানাভাবের কারণে জাতীয় সংগ্রহশালা ভবন থেকে ন্যাশান্যাল হিস্টরিক্যাল মিউজিয়মের সংগ্রহটি আর একটি নবনির্মিত ভবনে সরিয়ে নিয়ে গেলে ন্যাশন্যাল মিউজিয়মের ভবনে রয়্যাল আর্ট মিউজিয়মের সংগ্রহটি থেকে যায় এবং ভবনের নামে ন্যাশন্যাল মিউজিয়ম নামে অভিহিত হতে থাকে। এইভাবে ইতিহাসের নানা আঁকা বাঁকা পথ ধরে সুইডেনের তিনটি বৃহৎ জাতীয় সংগ্রহশালা—অস্ত্র-শস্ত্র, চারুকলা, ও পুরাবস্তু সম্বন্ধীয় ক্রমশ পৃথক সংগ্রহশালা হয়ে উঠল।

লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ছকে ১৭৩৯ সালে সুইডেনে রয়্যাল একাডেমি অফ সাইন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার সদস্যদের দেওয়া দান থেকে এখানে গড়ে উঠল কৌতুহলোদ্দীপক প্রাকৃত বস্তুর সংগ্রহ, সেটি ক্রমশ তথ্যভিত্তিক ন্যাচারাল হিস্টি মিউজিয়মে পরিণত হল। অবশেষে ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল প্রকৃতি বিজ্ঞানের জাতীয় সংগ্রহশালা Naturhistoriska rijksmuseet। সাইন্স একাডেমি ভবনে স্থানাভাব হওয়ায় ১৯১৫ সালে একটিনবনির্মিত ভবনে একাডেমির অধীনে জাতি-সংস্কৃতি বিষয়ক নিদর্শনগুলি সরিয়ে এনে জাতীয় নৃ-সংস্কৃতি সংগ্রহশালা (Statens Ethnografiska Museum) স্থাপিত হল। সাইন্স একাডেমির তত্ত্বাবধানে আরও একটি সংগ্রহশালা আছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ক এবং বিখ্যাত রাসায়নিক জে. জে. বার্জেলিয়াস (১৭৭৯—১৮৮৪) সংক্রান্ত। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে আজ সংগ্রহশালার সংখ্যা পঁচিশের কম নয়।

স্টকহোমের সংগ্রহশালার ইতিবৃত্তে Artur Hazelius (১৮৩৩-১৯০১) এর

নাম স্মরণীয়। হ্যাজেলিয়াস ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ এবং পেশায় শিক্ষক। ১৮৭২ সালে গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামে বেড়াতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন শিল্পোন্নতির ফলে কৃষি নির্ভর গ্রাম্য সংস্কৃতির দ্রুত অবলুপ্তি ঘটে চলেছে। তখনই কৃষি সংস্কৃতির সকল উপকরণ সংরক্ষণের আশু প্রয়োজনে কোনও সঙ্গী বা অর্থ সাহায্য ছাড়াই তিনি একা কাজ শুরু করে দিলেন। তার একক চেষ্টায় কয়েক বছরের মধ্যে গ্রাম্য জীবনের নানা উপকরণ সংগৃহীত হল এবং তিনি সেগুলি ১৮৭৮ প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলায় দেখাতে সারা ইওরোপে সাড়া পড়ে গেল, সংগ্রহের বৈচিত্র্যের জন্য এবং বিশেষভাবে যে অভিনব পদ্ধতিতে তিনি গ্রাম-সংস্কৃতির পরিবেশটিকে প্রদর্শনীতে তুলে ধরেন, তার জন্য। চাষীর গৃহ, খামার বাড়ী, ঘরকন্নার সামগ্রী, চাষবাসের যন্ত্র, গোয়াল ঘর সব যেখানে যেমন ভাবে গ্রামে থাকে ঠিক সে ভাবেই সেগুলি পুনর্বিন্যাস করে স্টক হোমের Skansen অঞ্চলে ১৮৯১ সালে উন্মুক্ত আকাশের তলে হ্যাজেলিয়াস গ্রাম-সংস্কৃতির অভিনব সংগ্রহশালা গড়ে তুললেন। ফলে Skansen যে শুধু রাজধানীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য হয়ে উঠল তাই নয়, হ্যাজেলিয়াসের এই সংগ্রহশালাটি বিশ্বের সকল ওপেন এয়ার মিউজিয়মের পথিকৃৎ ও মডেলহিসাবে স্বীকৃত হয়। সংগ্রহশালা আন্দোলনে একটি নোতুন ধারা যুক্ত করলেন হ্যাজেলিয়াস তাঁর সৃজনশীল কল্পনা ও উদ্যোগী কর্ম প্রচেষ্টায়। বছরে কুড়ি লক্ষের বেশি দর্শক সমাগম হয় Skansen-এ, যার মধ্যে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা কম নয়। Skansen এখন সুইডেনের পর্যটন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। হ্যাজেলিয়াস কর্ত্তৃক সংগৃহীত নিদর্শনের একাংশ ১৮৮০ সালে জাতীয় সম্পত্তি বিবেচনায়, সরকার অধিগ্রহণ করে তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০৪ সালে রয়্যাল আর্মারি ভবনের আধুনিকতম পদ্ধতিতে সাজান হয়। পরে ঐ সংগ্রহের জন্য রয়্যাল আর্মারি সংলগ্ন নোতুন একটি ভবন নির্মিত হয় এবং আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে সেখানে প্রদর্শগুলি সাজান হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের আর্ডিনান্স (সমরাস্ত্র) মডেলগুলি নিয়ে ১৮৭৮ সালে স্থাপিত হয় Arme museum। এই সংগ্রহশালার সংগ্রহ আন্তর্জাতিক মানের। জাতীয় নৌ বাহিনী সংগ্রহশালা Staten Sjohistoriska Museum, সমুদ্র ও সমুদ্রাভিযান সংক্রান্ত সংগ্রহের সম্মিলন, ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই সংগ্রহশালাটি ১৯৩৪ সালে স্থাপিত কারিগরী সংগ্রহশালার (Techniska Museum) পাশে অবস্থিত হওয়ায় এর শিক্ষাগত গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এছাড়া স্টকহোমে আছে সিটি মিউজিয়ম (১৯৩১), পোস্ট মিউজিয়ম (১৮২০), টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, ট্রাম, সুরা তৈরী, স্কি, মিউজিক, জীববিদ্যা এবং মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত পৃথক পৃথক সংগ্রহশালা। সেখানে স্কুল মিউজিয়মও আছে। স্টকহোমের কাছে Drottingholm এ রাজকীয় বাগান বাড়ীতে ১৭৬৪ সালে যে রঙ্গমঞ্চ তৈরী হয় সেখানে গড়ে উঠেছে অভিনয় সংগ্রহশালা (Drottingholms Teater museum) ১৯২২ সালে। ঐ যুগের অভিনয় শিল্পের ইতিহাস সংক্রান্ত সকল উপকরণসহ তিরিশটি মঞ্চ দৃশ্য সেখানে সাজানো রয়েছে। এই থিয়েটার মিউজিয়ম সহ রাজা তৃতীয় গুস্তাভের ১৭৮৭ সালে নির্মিত মনোরম হাগা (Haga) প্রাসাদ, রোমে ডাল প্রাসাদ প্রভৃতি

প্রাসাদ সংগ্রহশালা, রাজসভার নিয়ন্ত্রণাধীন। রাজা পঞ্চম গুস্তাভের ছোট ভাই, ইউজেন (Eugen) সুইডেনের নাম করা চিত্র শিল্পী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর Waldemarsuddc প্রাসাদ ও উদ্যানসহ অসামান্য চিত্র সংগ্রহটি ১৯৪৭ সালে সাধারণ সংগ্রহশালা বলে ঘোষিত হয়। এখানে সুইডেনের রাজ শিল্পীদের রচনার একটি অসাধারণ সংগ্রহ আছে।

সুইডেনে নবোদ্ভূত বণিক সম্প্রদায় কিছু শিল্প সংগ্রহ গড়ে তোলেন এবং সেগুলি বর্তমানে সাধারণ সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে। ব্যাঙ্কার ই. জে. থেইলের (Theil) বিংশ শতকের গোড়ার দিকে সমসাময়িক শিল্পীদের আঁকা সুন্দর আধুনিক চিত্রের সংগ্রহটি ১৯২৪ সালে সরকার অধিগ্রহণ করে Theilska Galleriet নামে একটি শিল্প-সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা করেন। ধনী শিল্পপতি Count W. Von Mallwyl এর ১৮৯৪ সালে নির্মিত অট্টালিকায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্টকহোমের শিল্প পতিদের ঐশ্বর্য্যময় জীবন যাপনের চিত্রটি ধরে রাখা হয়েছে। শিল্পপতি পরিবারের সংগ্রহশালাটির বর্তমান নাম Mallwylska Museet এবং ১৯৩৮ সাল থেকে এটি একটি পাব্লিক মিউজিয়ম।

ইতালী ভূমধ্যসাগরীয় দক্ষিণ ইওরোপের এমন একটি দেশ যার টানা তিন হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। প্রত্ন-উপকরণ ও শিল্পবস্তুতে ইতালীর প্রতিটি শহর ও গ্রাম-গঞ্জ ঐশ্বর্য্যময়। এদেশের প্রতিটি শহরে, এমন কি ছোট ছোট শহরেও, এক বা একাধিক সংগ্রহশালা আছে। এগুলির বেশির ভাগই প্রত্ন-বস্তু, শিল্পকলা ও ইতিহাস সংক্রান্ত এবং বেশ কিছু সংগ্রহশালা যথেষ্ট প্রাচীন। ভ্যাটিক্যান মিউজিয়মস এর কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া রোমের Mussi Capitolini (পঞ্চদশ শতকে স্থাপিত) ও নেপলস মিউজিয়ম (১৮২২ সালে স্থাপিত) বেশ পুরাতন সংগ্রহশালা। Museo Nazionale alle Terme রোমের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা। গত শতকের শেষ ভাগে এবং এই শতকের গোড়ায় প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগ পরিচালিত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত বহু জাতীয় প্রত্ন-শালা স্থাপিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এদের মধ্যে সিসিলি দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের প্রত্নবস্তু পালার্মো ও সাইরাকুজের সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে, সার্দিনিয়ার পুরা-সংস্কৃতিকে দেখা যায় কাগলিয়ারির (Cagliari) মিউজিয়মে। আপুলিয়া অঞ্চলের টরেণ্টোতে, মার্চেসের আঙ্কোনাতে, ক্যালাব্রিয়ার রেগিওতে আঞ্চলিক প্রত্ন-সংগ্রহশালায় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ ইট্রুরিয়ার পুরা-সংস্কৃতির সংগ্রহশালা যথাক্রমে ফ্লোরেন্স মিউজিয়ম ও রোমের ভিল্লা গিউলিয়া মিউজিয়ম। রোম এবং ল্যাটিন সাংস্কৃতিক প্রত্ন উপকরণ রয়েছে থার্মি ডিওক্লেটিয়ান মিউজিয়মে। চিয়েতির ন্যাশনাল আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ম অফ দি আব্রুজ্জি ঐ রকম আর একটি আঞ্চলিক প্রত্ন সম্ভারের জাতীয় সংগ্রহশালা।

সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসকে পুরোপুরি ক্রম বিকাশের ধারায় চিত্রিত করে C. Q Giglioli রোমে মিউজিয়ম অফ রোমান সিভিলিজেশন স্থাপন করেন। রোমান

সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন ধারাকে সামগ্রিক ভাবে ফুটিয়ে তোলার অভিনব প্রয়াস দেখা যায় এই সংগ্রহশালার প্রদর্শনী কক্ষগুলিতে।

ইতালীর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সপ্তদশ শতক পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অবশ্য বহু নগর ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রে খণ্ড বিখণ্ড ইতালী এই সময় ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থেকেছে। তবু তুরিন ও মিলান, পিসা ও বোলোগনা, ফ্লোরেন্স ও সিয়েনা, নেপলস ও পেস্টারাম এবং পালার্মো ও সাইরাকুজের মত সম্পদশালী নগরীর উদ্ভব ও বিকাশে বাধা হয়নি। বাধা হয়নি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির, ফলশ্রুতিতে ঐ সব নগরীকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প-সাহিত্যের নবজাগরণ বা রেনেশাঁর আবির্ভাব ও বিকাশে। রেনেশাঁ কালীন সংগ্রহ ও সৃজন থেকে ইতালীর সকল প্রধান নগরে গড়ে উঠেছে দুর্লভ পুঁথি ও চিত্র, মূর্ত্তি ও অন্যান্য হাতের কাজের অসাধারণ সংগ্রহ আর সেই সংগ্রহ ভাণ্ডার থেকে কালে কালে সংগ্রহশালা। ফ্লোরেন্সের Biblioteca Laurenziana এবং মিলানের Biblioteca Ambrosiana কে দুর্লভ পুঁথি পুস্তকের গ্রন্থাগার না বলে মিউজিয়ম বলাই উচিত। ইতালীর শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন ডাইরেকশন ফর অ্যান্টিকুইটিস অ্যাণ্ড ফাইন আর্টস সকল রকম প্রত্ন-উৎখনন, সমীক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, ও সংগ্রহশালাগুলি পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে ইতালীতে পাঁচশর অধিক সংগ্রহশালা রয়েছে। বিদেশী পর্য্যটক আকর্ষণে ইতালীর শিল্প সংগ্রহশালাগুলির যথেষ্ট অবদান আছে।

গ্রীসের পুরাবস্তু রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকে তুর্কি সাম্রাজ্য কাল পর্য্যন্ত প্রায় দুহাজার বছর ধরে বার বার পরজাতির দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। এ রকম একটি কলংকজনক লুণ্ঠন ঘটে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে যখন, আর্ল অফ এলগিন ইংরেজ রাজদূত হয়ে কনস্টান্টিনোপলে আসেন। সে সময় গ্রীস তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীন। আর্ল অফ এলগিনের নাম টমাস ব্রুস, জাতে স্কট, জন্ম ১৭৬৬, হ্যারো ও উইন্চেস্টারে শিক্ষিত। ১৭৯৯ সালে ইংরেজ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন তুরস্কের অটোম্যান রাজসভায়। এই চাকরিই তার জীবনে কাল হল। এর ফলে তাকে হারাতে হল মানসম্মান, অভিজাত্য, সম্পদ, স্ত্রী এবং নাকের নিম্নাংশ। নাকের বদলে নরুণ পাবার মত পেলেন পার্থেননের এথেনা মন্দির থেকে খসানো এক জাহাজ অনিন্দ্য সুন্দর গ্রীক ভাস্কর্য্য। এসব কিছুই হতনা, যদি না তুরস্ক যাত্রাকালে, পার্থেননের মন্দিরের ভাস্কর্য্যের প্ল্যাস্টার ছাঁচে তোলা প্রতিরূপ পাঠানোর ব্যবস্থা করার কথা, তাঁকে কথা প্রসঙ্গে, তাঁর বন্ধু বলত। তিনি ১৮০০ সালে গ্রীসে পৌঁছে অবহেলায় পড়ে থাকা প্রাচীন গ্রীক সৌধগুলি দেখলেন। তুর্কী রাজ কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে যে কোনও পর্যটক সেখান থেকে যা খুশি নিয়ে যেতে পারে তা' জানলেন। তুরস্কের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক তখন খারাপ যাচ্ছে, কেননা নেপোলিয়ন অটোম্যান সাম্রাজ্যভুক্ত মিশর দখল করে নিয়েছেন। কিন্তু ইংরেজ নৌ সেনাপতি নেলসনের নৌ বাহিনীর তাড়ায় ফরাসী সেনা মিশর ছাড়তে বাধ্য হল, ১৮০১ সালে।

সম্রাট খুশী। ইংরেজ রাষ্ট্র দূতকে ধন্য বাদ জানালেন। ঠিক সেই সময় এলগিন সম্রাটের কাছে কিছু গ্রীক প্রত্ন-বস্তু দেশে পাঠানর অনুমতি চেয়ে নিলেন। ফরমানে লেখা হল 'Qualche' ইতালী ভাষায় যার অর্থ 'কিছু'। ব্যস্, আর দেরি না করে তিনশ' লোক লাগিয়ে এক বছরে পার্থেনন মন্দির ও সমাধিস্থল থেকে খুলে জাহাজে তুলে দিলেন শতাধিক শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি, স্তম্ভশীর্ষ, খোদাই কাজ, শিলা লেখ প্রভৃতি এবং অসংখ্য ছোট ছোট খোদাই করা মূর্ত্তি, চিত্রিতমৃৎপাত্র ইত্যাদি। ইতিমধ্যে এলগিন অসাধারণ সুন্দরী এক অভিজাত মহিলাকে বিবাহ করেছেন এবং পৈতৃক ভিটায় নোতুন প্রাসাদ তৈরীর পরিকল্পনা পাকা হয়ে আছে। ফলে এতসব পার্থেনন সম্পদ খুলে আনার শুরুতে, দেশের শিল্পীরা এই অনুপম শিল্প সৌন্দর্য্য দেখে ভাস্কর্য্য !শিল্পের মান উন্নত করার সুযোগ পাবে, এ জাতীয় যে সব ভাবনা তাঁর মনে ছিল, সে সম্পদ দেশের মুখে পাড়ি দেবার পর, তাঁর মনের ইচ্ছা পাল্টে গেল। শ্বেত পাথরের শিল্প কর্মে সাজান নোতুন প্রাসাদ ও সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে যে জীবন অপেক্ষা করছে মন তখন সেই সুখস্বপ্নে বিভোর।

এলগিনের এই কাজে স্থানীর সহযোগী Lusieri-র দেওয়া বিবরণে পাওয়া যায় যে কুলিরা যখন এথেনা মন্দির থেকে মূর্ত্তি ভর্ত্তি বাক্স নামাচ্ছিল তখন নাকি একটি বাক্সের মূর্ত্তিগুলি প্রতিবাদে নড়ে ওঠে এবং কুলিদের হাত থেকে বাক্সটি ছিটকে যায়। ১৮০২ সালে মূর্ত্তিভর্ত্তি বাক্স নিয়ে জাহাজ ইংল্যাণ্ডমুখী হল। এলগিন কিন্তু আক্রান্ত হলেন নিদারুণ চর্মরোগে. তাঁর মুখে বিকৃতি দেখা দিল এবং নাকের তলার দিক ক্ষয়ে খসে গেল। সেই বছরই ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের স্বল্প কালীন শান্তি চুক্তির সময় এলগিন প্যারিসে থাকা অবস্থায় শান্তিচুক্তি ভেঙ্গে যায় এবং নেপোলিয়ন বন্দী করলেন এলগিনকে। তিনবছর বন্দী জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে দেখেন সুন্দরী স্ত্রী প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যাভিচারিনীর জীবন যাপনে মত্ত। তিক্ত ও বিশ্রী বিচ্ছেদের মামলা চলল বছরের পর বছর। ১৮০৭ সালে হাউস অফ লর্ডসের আসনটি হারালেন এলগিন। সকল দিক থেকে বিপর্য্যস্ত এলগিনের সম্বল তখন সেই মার্বেলের পুরা সম্পদ। সাত তাড়াতাড়ি এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন লণ্ডনের পার্কলেনেব এক ছাউনিতে। সেখানেও ঝঞ্ঝাট। গ্রীক ধ্রুপদী শিল্পে পণ্ডিত রিচার্ড পেইন নাইট সেগুলি দেখে কাগজে লিখলেন, মূর্ত্তিগুলি রোমান আমলের কপি. পার্থেননের শিল্পীদের কাজ নয়। অপর পক্ষে শিল্পী বেঞ্জামিন রবার্ট হেডন সে সব মূর্ত্তি দেখে বিমোহিত। তাঁর ডাইরীতে লিখলেন—"গ্রীকেরা ভগবান ছিল!" না হলে এমন রূপময় শিল্প তাদের হাত দিয়ে বেরয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই নিয়ে তর্কের ঝড় বয়ে গেল। দেউলিয়া হয়ে পড়েলেন এলগিন। অবশেষে ১৮১৫ সালে সরকার সেগুলি নামমাত্র মূল্যে, মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ডে কিনে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রাখার ব্যবস্থা করলেন। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী কবি বায়রণ লিখেছিলেন, 'গথরা যা ছেড়ে দিয়েছিল, স্কটরা তাকে ধ্বংস করল।' অবশ্য স্মরণীয় যে কবির মা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে। তবু তিনি বললেন "আমি এ কাজের প্রতিবাদ করি এবং চিরদিন

করব। ইংল্যাণ্ডের শিল্পীদের ভাস্কর্য শিক্ষার জন্য এথেন্সের ধ্বংসাবশেষ লুণ্ঠন? সেই সব শিল্পীদের শিক্ষা দেওয়া মিশরীদের স্কেটিং শেখানোর মতই।" এলগিন মার্বেলের ঘটনাটি ঘিরে নোতুন করে ঝড় উঠল কবি বায়রণের গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গের শত বার্ষিকীতে, ১৯২৪ সালে। একদল বুদ্ধিজীবী বললেন যে এগুলি গ্রীসকে ফেরত দেওয়া উচিত। জাতীয়তাবাদী গ্রীকেরা সোচ্চার হলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বললেন "ঐ জিনিষগুলি যদি ইংল্যাণ্ডে রক্ষিত না হত তবে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (তুর্কী কামানের গোলায়) সেগুলি ধ্বংস হয়ে যেত। কোহিনুর ফেরতের মত এলগিন মার্বেল ফেরতের দাবী আজও মাঝে মাঝে ওঠে। পার্থেননের অপসৃত সম্পদ ফেরতের দাবী আপাতত চাপা পড়লেও তৎকালীন রাষ্ট্র সঙ্ঘের (League of Nations) অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা সংস্থা, আই. এম. ও, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশান্যাল মিউজিয়মস অফিস গ্রীস সরকারের সহযোগিতায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করলেন, যার আলোচ্য বিষয় ছিল "ঐতিহাসিক ও নান্দনিক সৌধের রক্ষা ও সংরক্ষণের সমস্যা"। একাডেমি অফ এথেন্সে অনুষ্ঠিত ১৯৩১ সালের এই সম্মেলনে পুরাবস্তু ও শিল্প কলার নিরাপত্তার প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং দেশের বাইরে জাতীয় প্রত্ন ও শিল্প নিদর্শন পাচারের বিরুদ্ধে কোন দেশে কি ব্যবস্থা আছে তার সমীক্ষা হয়।

কিন্তু অনেক দেশই মনে করে যে শিল্প-উপভোগের একটি বহুজনের দিক (collective) আছে। সুতরাং Bona-fide শিল্প সংগ্রহ অনুমোদিত হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে অযথা বাধা নিষেধ আরোপ যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন গ্রীস, ইতালী তুরস্ক প্রভৃতি এতাবৎ ক্ষতিগ্রস্ত জাতির দাবীতে সেই সম্মেলন অন্যায়ভাবে বিক্রীত, অপহৃত বা অপসৃত শিল্প ও প্রত্ন-সম্পদ ফেরত চাইবার অধিকার স্বীকার করে নেয়। ঐ অধিকারটুকুই স্বীকৃত হল, কিন্তু হাজার হাজার ঐ জাতীয় দ্রব্য প্রত্যর্পণের কোনও ব্যবস্থা হল না। আজও হয়নি, যদিও এ ব্যাপারে আরও বেশ কয়েকটি সম্মেলন হয়েছে। তবে গত কয়েক দশকে বে-আইনী পাচার, অননুমোদিত রপ্তানী বা আমদানি, অপহৃত বস্তু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এবং কোনও সংগ্রহশালায় সে রকম জিনিস পেঁছিলে বা বিক্রীত হলে তা' প্রত্যর্পণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা (Interpol), আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পর্ষৎ (ICOM বা International Council of Museums) এবং এই সব সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র ও সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আইকম ও ইণ্টার পোল এ বিষয়ে যথেষ্ট সক্রিয়।

পিরামিড লুণ্ঠন খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতক থেকে চলে আসছে এমন, প্রামাণিক তথ্য আছে। তবে সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক এই তিনশ বছরে ইওরোপের বেশির ভাগ রাজকীয় সংগ্রহ ও জাতীয় সংগ্রহশালায় যে পরিমাণ মিশরীয় পুরাবস্তু এসে পেঁছেছে তা' তুলনাহীন। নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের পর মিশরের বিবরণ (Description de Egypte) গ্রন্থটি প্রকাশের পর এবং Champolloin কর্তৃক

Rosetta Stone নামক মিশরীয় শিলালেখের চিত্রলিপি পাঠোদ্ধার সম্ভব হওয়ায় উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই মিশরীয় প্রত্ন-সম্পদ লুণ্ঠন এবং ইওরোপে পাচার ও বিক্রয়ের বল্গাহীন কারবার চালু হল। সকল ইওরোপীয় দূতাবাসগুলি হয়ে উঠল মিশরীয় প্রত্ন-বস্তু পাচারের ও ব্যবসার বৃহত্তম কেন্দ্র। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় মিশরীয় পুরা নিদর্শনের বড় বড় ব্যবসায়িক সংগ্রহ গড়ে উঠল যেমন Salt, Drovetti, Pashalequa, Anastase, Athanasti, Thedemat du vent এবং Belzoni সংগ্রহ, সেগুলি সময়মত ইওরোপের সংগ্রাহকদের কাছে বিক্রয় করা হয় এবং কালে কালে প্যারিস, বার্লিন, লণ্ডন, লেডেন, ভিয়েনা, তুরিন প্রভৃতি সংগ্রহশালায় স্থান পায়।

মিশরের প্রাচীন চিত্রলিপির পাঠোদ্ধারকারী Champollion এ জাতীয় প্রত্ন-নিদর্শন অপসারণের প্রতিবাদ করে মিশরের শাসক পাশাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করলেন। ১৮৩৪ সালে পাশা ইউসেফজিয়া নামক এক রাজকর্মচারীর উপর পুরানিদর্শন সংরক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। শিক্ষামন্ত্রী শেইখ রিফফার (Riffa) তত্ত্বাবধানে Ezbekieh সরোবরের নিকটস্থ একটি স্কুল বাড়িতে একটি সংগ্রহশালাও প্রতিষ্ঠিত হল। ইউশেফজিয়া ও তার সহকারীরা বিভিন্ন প্রত্ন-স্থান থেকে পুরা বস্তু সংগ্রহ করে আনতে শুরু করলেন। লিপিটাপট বে সেগুলির তালিকা নথীবদ্ধ করে প্রত্ন-বস্তু পাচার বন্ধ করতে প্রয়াসী হলে হবে কি, মিউজিয়মের সংগ্রহ আর বিশেষ বাড়ল না। ইউসেফ প্রত্নস্থলে পৌঁছনর আগেই সেখানকার নিদর্শন ফাঁকা হয়ে যেতে থাকল অথবা দেখা গেল কোনও সরকারী কর্মচারী দর্শকদের সেগুলি বিলি বণ্টন করে দিয়েছে; অবশ্যই নিঃস্বার্থ বদান্যতা নয়। স্কুল বাড়ী থেকে মিউজিয়ম স্থানান্তরিত হল শিক্ষা মন্ত্রকের কোয়ার্টার্সে, দুর্গের অভ্যন্তরে। ১৮৫২-'৫৪ সালে সকল সংগৃহীত বস্তুর তালিকা তৈরী করা হল। ১৮৫৫ সালে অস্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ম্যাক্সিমিলান কার্য্য ব্যপদেশে কায়রোর পাশ দিয়ে যাবার সময় কি মনে করে এই সংগ্রহশালা দেখতে এসে পাশা আব্বাসকে কটি জিনিস মিউজিয়ম থেকে দেবার অনুরোধ জানাতে সদাশয় পাশা মহাশয় পুরো সংগ্রহশালাটি তাঁকে দান করে দিলেন। পৃথিবীতে এমন ঘটনা বোধ হয় আর ঘটেনি। একটি দেশের সমগ্র সংগ্রহশালা দান করে দিলেন সেই দেশেরই রক্ষা কর্ত্তা পাশা। এখন সেই দানকৃত সংগ্রহটি ভিয়েনা জাতীয় সংগ্রহশালার সম্পদ।

অষ্টাদশ শতকে যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় ক্রমশ তা' ইউরোপের গণ্ডী ছাড়িয়ে উত্তর আমেরিকা, জাপান, ভারত, চীন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া—বিশ্বের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সংগ্রহশালার উপর শিল্প বিপ্লবের পরোক্ষ প্রভাব অভাবনীয়—সংগ্রহশালার বিকাশ, স্থাপত্য রীতি, প্রয়োগ পদ্ধতি সকল রকম কার্য্য-ক্রম, প্রচার ও প্রসার সকল ক্ষেত্রেই শিল্প বিপ্লব সরাসরি নানা ধরনের আধুনিকীকরণ ঘটিয়েছে। সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হল পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত ও কিছু কিছু উন্নতিকামী দেশে যন্ত্র-শিল্প ও কারিগরি বিষয়ের উপর ছোট-বড় সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা ও ক্রম-প্রসার। সবচেয়ে প্রাচীনতম সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি মিউজিয়ম, Musee des Techniques du Conservatoire National des

Arts et Metiers এ যন্ত্রশিল্প সংক্রান্ত প্রায় সকল রকম ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ঊনবিংশ শতকে প্যারিসের একটি জনপ্রিয় সামাজিক কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। কিন্তু ঐ অঞ্চল নগরীর ঘিঞ্জি পাইকারী বাজারে পরিণত হওয়ায় এবং কলাপ্রেমী প্যারিসবাসীদের যন্ত্র-শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে ঔদাসীন্য থাকায় এটির আধুনিকীকরণ আর সম্ভব হয়নি। অবশ্য সাম্প্রতিককালে এই Musee de Techniques (বর্তমান নাম) দীর্ঘ দিনের আলস্য ঝেড়ে ফেলে সরকারী শিক্ষা মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে আধুনিক সংগ্রহশালা হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ১৯৩৭ সালে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা হয়, তাকে কেন্দ্র করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযত্নে Palais de la Decouverte নামে একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার অকারিগরী বিজ্ঞান সংস্থা গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের উদ্দেশ্য জানাতে গিয়ে বলেন ঃ "আমাদের মূল লক্ষ্য দর্শকদের বিজ্ঞান সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধে পরিচিত করা ; গবেষণার মানের অবনমন না ঘটিয়ে বড় বড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যাপক জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বার বার দেখান।" এর ফলে আজ ঐ প্রতিষ্ঠানে অংক, জ্যোতির্বিজ্ঞান. পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা এবং ডাক্তারি বিষয়ে ব্যাবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখিয়ে ঐ সব বিষয়ের নিয়ম ও তত্ত্ব সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। Musee de Techniques-এ যন্ত্র-শিল্প ইতিহাসের উপর একপেশে ঝোঁকের পরিপূরক হয়ে উঠেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার এই প্রদর্শন ভবনটি। যুবক-যুবতীদের মধ্যে গবেষণা ভিত্তিক বিজ্ঞান সচেতনতা বাড়িয়ে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনী ও কার্যক্রমের উদ্দেশ্য।

লণ্ডনের সাইন্স মিউজিয়মের পোষাকী নাম National Museum of Sciencc and Industry, ইংল্যাণ্ডের প্রিন্স কনসর্ট-এর উৎসাহে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ১৮৫১ সালের Great Exhibition-কে ভিত্তি করে ১৮৫৭ সালে গড়ে ওঠে। প্রথমে এটি সাউথ কেনসিংটনের Museum of Manufacturers (পরে যার নাম হয় Victoria and Albert Museum)-এর মার্লবরো হাউসে অবস্থিত ছিল। ১৮৬৪ সালে এটি এক্সিবিশন রোডের অপর দিকে একটি ভবনে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই ভবনটি ও তার সম্প্রসারিত অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মিউজিয়মটির জন্য ১৯৬২ সালে একটি বিশাল ভবন তৈরী হয়। সংগ্রহশালাটির প্রায় সত্তর ভাগ প্রদর্শ শিল্পেতিহাসের নিদর্শন। মেঝের মোট আয়তন ৩ লক্ষ বর্গ ফুট এবং বার্ষিক দর্শক সংখ্যা ২০ লক্ষের মত। নানা রকমের শিক্ষা-কার্যক্রমের ব্যবস্থা (ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী সহ) এই দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিজ্ঞান সংগ্রহশালাটিতে আছে। বার্মিংহাম সিটি মিউজিয়ম এণ্ড আর্ট গ্যালারীর অধীনে, ১৯৫০ সালে, সিটি মিউজিয়ম অফ সাইন্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি পুরানো কারখানায়। বর্তমানে সেই একই স্থানে একটি নোতুন ভবনে মূলত Proof House Collection of Small Arms-এর জিনিসগুলি নিয়ে সংগ্রহশালাটি পুনর্বিন্যস্ত হলেও, বার্মিংহামের Beultion

and Watt সংস্থাটির সহযোগিতায় এখানে বাষ্প চালিত যন্ত্রের সংগ্রহ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ট শহরে হাঙ্গেরিয়ান এগ্রিকালচারাল মিউজিয়মটি সে দেশের খ্যাতনামা কৃষিবিজ্ঞানীরা ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে প্রাণী-ইতিহাস এবং পশুখাদ্য, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, অরণ্য-বিজ্ঞান, এবং পশু ও মৎস্য শিকার সম্বন্ধীয় বিচিত্র সব নিদর্শন প্রদর্শিত। কৃষি ও পশুপালন সংক্রান্ত সংগ্রহশালা হিসাবে এটি একটি অনন্য সাধারণ সংগ্রহালয়, যেটি আজ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি লোক দেখেছেন। সুইডেনে স্টকহোমের Tekniska Museet বা কারিগরী সংগ্রহশালাটি প্রধানত ছাত্র ও গবেষকদের জন্য তৈরী। এখানে কারিগরী পরিবেশের মধ্যে বর্তমান জীবন ধারণে আবশ্যক নিদর্শন, যন্ত্রের ঐতিহাসিক পটভূমি, বর্তমান কালে যন্ত্র বিজ্ঞান ও শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধীয় উপকরণ ব্যাখ্যা সহ প্রদর্শিত হয়।

শিল্পনগর হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ নগরের খ্যাতি আছে, কেননা এখানে Brahe ও Keplar এর মত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কাজ করে গেছেন। মোটরগাড়ী, উড়োজাহাজ, প্রভৃতি ভারী শিল্প থেকে আরম্ভ করে সুস্বাদু ধূমায়িত মাংস ও প্রকাশনা শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র প্রাগ শহর। ইউরোপের একদা এই দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরে বহু কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। ফলে ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত National Technicke Muzeum বিজ্ঞান ও শিল্পের বহু বিষয়ের উপর সংগ্রহ ও প্রদর্শনী গড়ে তুলেছে যেমন—খনি বিদ্যা, ধাতু বিজ্ঞান, পরিবহন, আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র বিজ্ঞান, বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান, রশ্মি বিকীরণ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্থাপত্য এবং মৌলিক বিজ্ঞানসমূহ। কিছু কিছু নিদর্শনের ঐতিহাসিকতা ও প্রাচীনতা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ১ লক্ষ ৬৫ হাজার গ্রন্থ, ৮০ হাজার চিত্র নিদর্শন, ৫০ হাজার যন্ত্র ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত ক্যাটালগ এবং স্থাপত্য নক্সার এক বিশাল সংগ্রহ ভাণ্ডার এই অভিনব সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

পশ্চিম জার্মানীর মিউনিখ শহরটি হিটলারের সোসালিষ্ট পার্টির হেডকোয়ার্টার ছিল এ কথা হয়ত অনেকের জানা নেই। মিউনিখের Oskar Von Miller-এর নাম কেই বা শুনেছেন? ১৯০৩ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত Deutsches Museum-এর খ্যাতি আজ বিশ্ব জোড়া। সাড়ে চার লক্ষ বর্গফুট প্রদর্শনী কক্ষ জুড়ে রয়েছে যন্ত্র ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত। পাঁচ লক্ষ গ্রন্থে সমৃদ্ধ এই সংগ্রহশালার গ্রন্থাগার এবং নানা বিষয়ে বিদগ্ধ-মণ্ডলীর সম্মেলন, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের উপযুক্ত পাঁচটি কনফারেন্স হল, যেখানে পাঁচহাজার লোকের স্থান সংকুলান হতে পারে। পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন স্থান থেকে ছ'-আটশ ছাত্র-ছাত্রী সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের জন্য এখানে আসে। শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক শিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে।

রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সংস্থা সোসাইটি অফ নেচর, অ্যানথ্রোপলজি ও এথনোগ্রাফির উদ্যোগে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে Polytechnical Museum স্থাপিত

হয়, গত শতকের ১৮৭২ সালে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে জনপ্রিয় করে তোলা এই সংগ্রহশালার মূল লক্ষ্য এবং এ কাজ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে করা হয়। ফলে গত একশ বছরের অধিককাল ধরে এই মিউজিয়মটি সে দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে রাশিয়ার All Union Society Znanye, যার সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি, সেই বিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক গুণীজনের সংস্থার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই বহু-মুখী কারিগরী সংগ্রহালয়টি। All Union Society Znanye-র সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য "জনগণের জন্য জ্ঞান"। এই গণমুখী বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক এবং যন্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা নোতুন প্রয়োগ-পদ্ধতির উদ্ভাবক, তারা সকলেই এই সংগ্রহশালার জন্য প্রদর্শ (exhibits) তৈরী করে দেন এবং নিজেরা দর্শকদের সামনে উপস্থিত থেকে সে সব প্রদর্শ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে এ'রা বিশেষ গুরুত্ব দেন। বর্তমানে এই সংগ্রহশালায় বারোটি বিভাগে শক্তি-উৎপাদক প্রায়োগিক যন্ত্র বিজ্ঞান, রসায়ন, ধাতু-বিজ্ঞান, যন্ত্র-বিজ্ঞান, খনি বিজ্ঞান, মোটর ও ট্রাক্টর উৎপাদন ও ব্যবহার বিদ্যা, অটোমেশন, তড়িৎ বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান, কম্প্যুটেশন, মহাকাশযান সংক্রান্ত বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়, বহু রকমের যান্ত্রিক মডেল, মূল নিদর্শন, মুদ্রিত ও আলোক চিত্র, ব্যাখ্যা চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রদর্শিত। বছরে বারটি অস্থায়ী প্রদর্শনী হয়, দু হাজার নোতুন নিদর্শন সংগৃহীত হয় এবং কুড়ি লক্ষ দর্শক আসেন এই সংগ্রহশালায়। রাশিয়াতে বয়স্ক শিক্ষার জন্য বহু গণ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং মস্কো পলিটেকনিক মিউজিয়ম সহ অন্যান্য কারিগরী সংগ্রহালয়গুলি ঐ সব গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায়োগিক বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি ভুমি। একমাত্র মস্কো পলিটেকনিক মিউজিয়ম থেকে বছরে চার-পাঁচ হাজার প্রায়োগিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ তৈরী হন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালাগুলি বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠছে। অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার মত সেই শিক্ষা-কার্যক্রম সরকারী নিয়ন্ত্রণে যেমন নেই, তেমনি অত ব্যাপক ও গণমুখী নয়। মিউজিয়ম অফ হিস্ট্রি এণ্ড টেকনোলজি অফ দি স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন একটু ভিন্ন ধরনের সংগ্রহশালা। দেশের জাতীয় সংগ্রহশালা হিসাবে বিজ্ঞান ও যন্ত্র-বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে সংশিলষ্ট নিদর্শনসমূহ এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়। যন্ত্র শিল্পের ইতিহাস প্রদর্শনের প্রবণতা এই সংগ্রহশালায় বেশি। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের হিস্ট্রি এণ্ড টেকনোলজি মিউজিয়ম এবং এয়ার এণ্ড স্পেস মিউজিয়ম দুটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এই দুটি সংগ্রহালয়ের জন্য ষাটের দশকেই সাড়ে সাত কোটি ডলার খরচ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্মিথসোনিয়ান সংস্থা শুধুমাত্র শিল্প ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত সংগ্রহশালা চালান না। এই সংস্থার অধীনে

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে নানা ধরনের কাজকর্ম চলছে। এর পরিচালনাধীন অন্যান্য সংস্থাগুলি হল : Freer Gallery of Art, National Gallery of Art, National Zoological Park, International Exchange Service, Bureau of American Ethnology, Astro-Physical Observatory, U. S. Regional Bureau of International Catalogue of Scientific Literatures, Division of Radiation and Organisms এবং আট লাখের উপর গ্রন্থসহ একটি গ্রন্থাগার। এ ছাড়া নানা বিষয়ের উপর পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, প্রভৃতি প্রকাশন ও গবেষণার কাজে সকল রকম সহায়তা করে এই বিশালায়তন সংস্থা, যার উদ্ভব আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৮৪৬ সালে।

চিকাগো শহরে ১৯০৩ সালে যে ওয়ার্লড এক্সপোজিসন নামে বিশ্ব শিল্পকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, সেই প্রদর্শনীর চারুকলা বিভাগের ভবনটিতে জুলিয়াস রোসেন ওয়াল্ড (১৮৬২-১৯৩২) নামক এক ধনী ব্যবসায়ী তার বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সংক্রান্ত বিশাল সংগ্রহটি রাখেন। তাঁর অর্থে প্রতিষ্ঠিত জে আর ফাউণ্ডেশন তাঁর মৃত্যুর পরের বছর ১৯৩৩ সালে সংগ্রহশালাটির কিছু অংশ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ১৯৪০ সালে রোজেন ওয়াল্ডের সকল সংগ্রহ নিয়ে মিউজিয়ম অফ সাইন্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী সম্পূর্ণভাবে খোলা হল। আজ সেই ছ' লক্ষ বর্গ ফুট প্রদর্শনী এলাকায় বছরে তিরিশ লক্ষের বেশি দর্শক ঘুরে ফিরে দেখেন পৃথিবীর অন্যতম আন্তর্জাতিক শিল্প ও বিজ্ঞান সংগ্রহালয়। রোসেন ওয়াল্ড ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত মেল অর্ডার হাউস Sears, Roebuck and Co.-র সর্বাধ্যক্ষ। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরবরাহের ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং শিক্ষা ও মানব কল্যাণের জন্য প্রচুর দান ধ্যান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য সমরাস্ত্র সরবরাহ করে যিনি ধনী হন, সেই ব্যক্তি যুদ্ধ শেষে, ইওরোপে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের কল্যাণের জন্য প্রচুর দান করেন। ব্যাপারটি মানবতাবাদীদের কাছে কৌতুকপ্রদ। বুর্জোয়া বদান্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটনকারী এক দৃষ্টান্ত। ধান ভানতে শিবের গীত ছেড়ে মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। চিকাগোর সাইন্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী সংগ্রহশালার অভিনবত্ব এর প্রদর্শনী পদ্ধতি। যুক্তিসঙ্গত ও ঘটনানুক্রমিক ভাবে প্রদর্শ-বিন্যাসের দ্বারা বিজ্ঞান ও শিল্পকে ছ'টি দিক থেকে পরিবেশন করা হয়েছে। ধরা যাক দূরভাষিণী টেলিফোনের কথা—সেখানে দেখান হয়েছে বিজ্ঞানের কি নিয়মে টেলিফোন কাজ করে, টেলিফোন সংক্রান্ত মূল আবিষ্কার কাহিনী, মৌলিক আবিষ্কারকে কি কারিগরী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক কাজে লাগান গেল, কতদূর পর্যন্ত টেলিফোনকে কাজে লাগান যায়, ব্যাপক উৎপাদন পদ্ধতি এবং টেলিফোনের সামাজিক ও অন্যান্য ফলাফল। যন্ত্রের মাধ্যমে সক্রিয় ও ব্যবহার উপযোগী প্রদর্শ এবং সহায়ক চিত্র, চার্ট, লেবেল, প্রদর্শ সম্বন্ধে কানে শোনার যন্ত্র, প্রদর্শক-বক্তা, উপযুক্ত আলোক সম্পাত, বর্ণারোপ প্রভৃতি সহযোগে, এমনকি প্রয়োজনে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় ও

মনোরম করে তোলা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষা সহায়ক নানা ধরনের কার্যক্রম এই সংগ্রহশালায় আছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় সহায়ক অনেক বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে The Pacific Science Centre of Seatle, ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত Seatle World's Fair-এর কিছু প্রদর্শনীকে স্থায়ী রূপ দিয়ে গড়ে তোলা এবং সেখানে এখন শিক্ষার্থীরা প্রদর্শিত বস্তুর মাধ্যমে গাণিতিক-যুক্তিশাস্ত্র, শুদ্ধ গণিত, প্রায়োগিক গণিত, এমনকি অঙ্কের রোমান্স বিষয়ে অনেক কিছুই জানতে পারে। ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলে ইউনিভার্সিটির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক Ernst O Lawrence-এর স্মৃতিতে লরেন্স হল অফ সাইন্স নামে যে পদার্থ বিদ্যার উপর সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে, সেখানে প্রদর্শের সাহায্যে পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ বিষয়কে সহজবোধ্য করে ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের বোঝান হয়। পোর্টল্যান্ডে পোর্টল্যাণ্ড মিউজিয়ম অফ সাইন্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীতে একইভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, গণিত, যন্ত্রবিদ্যা এবং শিল্পবিজ্ঞান শেখান হয়। সমুদ্রোপকূল, পর্বত ও আগ্নেয়গিরির উপর পঠন-পাঠনের জন্য তিনটি প্রদর্শ কক্ষ এবং একটি প্ল্যানেটোরিয়াম এখানে আছে। এই সংগ্রহশালাটি (পোষাকী নাম Oregon Museum of Science and Industry, Portland) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে বিজ্ঞান মেলার অনুষ্ঠান করে সেখানে লক্ষাধিক মডেল আসে। Tennesse-তে ওক রিজে অ্যাটমিক এনার্জি মিউজিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পরমাণু বিজ্ঞান বিষয়ক সংগ্রহশালা। স্কুল ও কলেজে গিয়ে যন্ত্রপাতি ও মডেলের সাহায্যে পরমাণু বিজ্ঞান শেখায় এই মিউজিয়ম। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল আইন সংশোধন করা হয়েছে, যার জন্য ক্লাস ঘরে সে শিক্ষাকে আবদ্ধ না রেখে, বাধ্যতামূলকভাবে শিল্পকলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংগ্রহশালাগুলিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কিছু কিছু অংশ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সম্পূরক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তা' মূলত স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে এবং যে সব সংগ্রহশালা ইতিমধ্যে সে কাজ করছে, তাদের পরিবর্দ্ধনের কাজে লাগছে। সমস্ত ম্যাসাচুসেটস রাজ্য থেকে বছরে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী বোস্টনের মিউজিয়ম অফ সাইন্সের শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশ নেয় এবং এর ব্যয় বহন করে মেট্রোপলিটন জিলা কমিশন এবং রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ। ফিলাডেলফিয়া বোর্ড অফ এডুকেশন সাইন্স টিচিং মিউজিয়ম অফ দি ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউটকে অর্থ সাহাযা করছেন। সেই অর্থে স্কুলের শিক্ষকদের সেমিনার-ওয়ার্কশপের মাধ্যমে শেখান হচ্ছে, কিভাবে বিদ্যালয় ও সংগ্রহশালার মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্কুলের শিক্ষায় কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা যায়। এই সংগ্রহশালাটি অবশ্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার একটি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠা কাল ১৯৩৪ এবং প্রথম থেকেই এদের দর্শকের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র। এখানে যথেষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মডেলের সাহায্যে শিক্ষা

দেওয়া হয় এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে 'চাকার উপর সংগ্রহশালা' নামে ভ্রাম্যমান মিউজো-ভ্যান পাঠান হয়। নিউইয়র্কের রচেস্টার শহরটিতে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা ও গবেষণাগার আছে। স্বভাবতই সেখানে ১৯১২ সালে গড়ে ওঠে রচেস্টার মিউজিয়ম অফ সাইন্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী, যেটি সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম ও কর্মব্যস্ত আঞ্চলিক সংগ্রহশালা। এখানে ভূ তত্ত্ব, জীব বিজ্ঞান, যন্ত্র-কলা (mechanical art), নৃ-বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রায় তিন লক্ষ নিদর্শন আছে এবং ২৭৪টি স্থায়ী গোষ্ঠীবদ্ধ প্রদর্শের (Group exhibits) মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষক গবেষক ও সাধারণ দর্শকদের বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহলী ও আগ্রহী করে তুলছে। বছরে চার হাজার প্রদর্শ স্কুলে পাঠিয়ে দু' লক্ষের বেশি ছাত্রের শিক্ষায় সহায়তা করা হয়। পূর্বে কথিত সরকারী সম্পূরক শিক্ষা কার্যক্রমে এই সংগ্রহশালা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়। ভবিষ্যতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছোটখাট শিল্প ও বিজ্ঞান সংগ্রহশালা, বিজ্ঞান কেন্দ্র, ফার্ম মিউজিয়ম, মিল্ মিউজিয়ম, উন্মুক্ত সংগ্রহ প্রাঙ্গণ, ঐতিহাসিক স্থানিক সংগ্রহশালা প্রভৃতি যত না বাড়বে, তার চেয়ে অনেক বেশি বড সড় আয়তনে এবং বহু সংখ্যায় গড়ে উঠবে, বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গীত রেখে চলতে পারে, এমন সব বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালা। ভবিষ্যতে এসব সংগ্রহ-শালায় যন্ত্রচালিত ধ্বনি ও আলোক প্রক্ষেপণ, বর্ণারোপ এবং টেলিভিশন, ভিডিও ক্যাসেট, কম্পিউটর প্রভৃতি নানান যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞান প্রদশনীকে আরও সহজবোধ্য করে তোলার সাথে সাথে প্রদর্শনীকে নাটকীয় ও আবেগানুভূতি উত্তেজক করে তোলা হবে।

অতিরিক্ত -যান্ত্রিক এবং তথ্য ও তত্ত্ব ভারাক্রান্ত বিজ্ঞান ও শিল্প সংগ্রহা-লয়ে আবেগ, অনুভূতি ও আনন্দের অনুপ্রবেশ ঘটাতে এবং বিজ্ঞানবোধকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে পেঁৗছে দিতে বিজ্ঞান সংগ্রহশালাকে ভবিষ্যতে ঐ পথেই এগোতে হবে। ১৯৬৯ সালে এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমীক্ষিত ২৮৮৯ টি সংগ্রহশালার মধ্যে ৭৭৬টি বিজ্ঞান সংগ্রহশালা অথবা এমন সংগ্রহশালা যেখানে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রদর্শ বস্তুর সংখ্যাধিক্য। এ থেকে অনুমিত হয় যে আগামীকালের অধিকাংশ সংগ্রহশালা যুগের প্রয়োজনে বিজ্ঞান বিষয়ক হবে।

ভবিষ্যতের পূর্ব চিন্তা ছেড়ে আবার বর্তমানে ফিরে আসা যাক। কানাডার টরেণ্টো শহরে Centre of Science and Technology নামে একটি বিশালাকার বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালা ও শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে, তিন কোটি ডলার খরচ করে। এখানে তিন হাজার ছেলেমেয়ে একসঙ্গে মিউজিয়ম দেখতে পারে। দূর থেকে আসা ছেলেমেয়েদের ডর্মিটারীতে থাকার ব্যবস্থা আছে। মিউজো ভ্যানে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী দূর দূরান্তে পাঠিয়ে যে সব অঞ্চলে বিজ্ঞান সংগ্রহালয়ের সাহায্যে বিজ্ঞান শেখার সুযোগ নেই, সেই সব অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বিজ্ঞান সংগ্রহশালা গুলি এক ধরনের জানার ও শেখার সুযোগ করে দেন। তবে সে সুযোগ বড় সীমিত ও আংশিক। সংগ্রহশালার স্থায়ী প্রদর্শকক্ষে যে পরিবেশে, যে পদ্ধতিতে এবং যে

জাতীয় প্রদর্শবস্তু দিয়ে এই কাজ করা হয়, ভ্রাম্যমান মিউজো-ভ্যানের সাহায্যে তার কণামাত্র করা সম্ভব নয়। এই কথা ভেবেই টরেণ্টো সাইন্স সেণ্টার ডর্মিটারীতে প্রয়োজন মত থাকার ব্যবস্থা করেছেন যাতে অণ্টেরিও প্রদেশের যে কোন অঞ্চল থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীর থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা না হয়। মিউজিয়মের মাধ্যমে শিক্ষা দান কার্যক্রমের এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত।

উন্নত দেশগুলিতে কোন কোন ব্যবসায়িক ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসছেন। এদের মধ্যে সুইডেনের Falun এ অবস্থিত Stora Kopparbargs Works এর সংগ্রহশালাটি প্রাচীনতম কোম্পানী মিউজিয়ম ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত। মূলত তামার খনির কাজের জন্য এই কোম্পানী ১৭৩৫ সালে স্থাপিত হলেও, পরে লোহার খনির কাজ এবং বর্তমানে অরণ্যোৎপাদন, কাগজের মণ্ড তৈরী ও নিউজ প্রিণ্ট তৈরী এবং অন্যান্য জিনিসের উৎপাদনের কাজও এই কোম্পানী করে। এদের সংগ্রহশালায় এই সব বিষয়ের উপর প্রদর্শনী আছে। বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার দর্শক আসেন এই সংগ্রহশালা দেখতে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবী বিখ্যাত Corning Glass কোম্পানীর Corning Glass Museum এবং ইংল্যাণ্ডের Pilkington Glass কোম্পানীর Pilkington Glass Museum (১৯৬৪ সালে স্থাপিত) দুটিতে কাঁচের তৈরী প্রাচীন ও আধুনিক জিনিসের সুন্দর সংগ্রহ আছে। পিলকিংটন গ্লাস মিউজিয়মটি সেণ্ট হেলেনা (U. K) নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ দ্বীপে অবস্থিত। শুধু নেপোলিয়নের নির্বাসন ও মৃত্যু স্থান বলে নয়, এর গুরুত্ব কাঁচ উৎপাদন ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। এখানে যে র‍্যাভেন হেড গ্লাস ওয়ার্কস সংস্থাটি ছিল সেটির সাহায্যে ইংরেজরা ১৭৭৬ সালে প্লেট গ্লাস উৎপাদনে ফরাসী মনোপলি ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছিল। Dupont কোম্পানীর অর্থানুকুল্যে ওয়াশিংটনে স্থাপিত হয়েছে হেগলে মিউজিয়ম। এজাতীয় সংগ্রহশালার প্রসঙ্গে নেদারল্যাণ্ডের Eindoven এ অবস্থিত The Philips Evolution নামে বিশ্ব-বিখ্যাত বৈদ্যুতিক বাতি ও যন্ত্র নির্মাণকারী ফিলিপস্ কোম্পানীর সংগ্রহশালাটি উল্লেখযোগ্য। এই আন্তর্জাতিক উৎপাদক ও বাণিজ্যিক সংস্থাটির সভাপতি ফেডরিখ ফিলিপস্ কোম্পানীর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে The Evolution শিরোনামায় আশি লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৬৬ সালে একটি অভিনব শিল্প-বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন করেন। সংগ্রহশালাটি ফিলিপস কোম্পানীর উৎপাদিত দ্রব্যের শো-রুম নয়. আর পাঁচটি বিজ্ঞান বিষয়ক সংগ্রহশালা নয়, বিশেষজ্ঞের বোধগম্য এমন যন্ত্র বিজ্ঞানের সংগ্রহ নয়, শিল্পের অতি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি দেখিয়ে মানুষের শ্রম-দক্ষতাকে ছোট করে দেখানর সংগ্রহশালা নয়, রোবোটের সমাহারে মানুষের মনে অবিক্রীত শ্রম সম্বন্ধে ভয় পাইয়ে দেবার উদ্দেশ্য এখানে নেই। দক্ষ শ্রমিক, কুশলী পরিচালক, উৎপাদনের গুণগত প্রয়োজনে যে ধরনের যান্ত্রিক উন্নয়ন দরকার হয়েছে তার ইতিহাস ও নিদর্শন, ছোট বড় সকল কর্মীর সরাসরি শ্রমের উপযুক্ত মূল্যায়ন, শ্রমিকের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি, ফিলিপস্ কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আড়াই লক্ষ মানুষ কিভাবে এই

কোম্পানীর ক্রমাভিব্যক্তি ও অগ্রগতিতে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করছে তারই সচিত্র ইতিবৃত্ত ও বাস্তব সত্যটুকু তুলে ধরা হয়েছে, নানা ধরনের প্রদর্শ ও নিদর্শনের মাধ্যমে। এক গিল্ডার প্রবেশ দর্শনী দিয়ে বছরে লক্ষাধিক দর্শক এই সংগ্রহশালাটি দেখে যান। মনে রাখতে হবে যে শহরে এই প্রদর্শনীটি আছে তার মোট লোক সংখ্যা মাত্র একলক্ষ সত্তর হাজার। নিয়মিত প্রদর্শিত বস্তুর পরিবর্তন করা হয় কেননা ক্রমাভিব্যক্তির প্রান্তিক সীমা নেই। একজন সাংবাদিক প্রদর্শনী উদ্বোধনের আগে লিখেছিলেন "এটির কাজ শেষ হবে না, যেহেতু মানবজাতির কাজের শেষ নেই।"

উন্নতিকামী কোন কোন দেশে শিল্পায়ন ও নগরায়নের অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে শুরু করছে। ইজিপ্টে কায়রো নগরীতে ১৯৬২ সালে যে সাইন্স মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে এ পর্যন্ত সেচ ব্যবস্থা, মৌলিক ও প্রায়োগিক রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, পারমাণবিক শক্তি, বেতার যোগাযোগ, ভূ-তত্ত্ব, আবহাওয়া তত্ত্ব, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রদর্শ কক্ষ খোলা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী ও উদ্যোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয়, সহজ যান্ত্রিক মডেলের মাধ্যমে ঐ সব বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য প্রয়োজন মত প্রদর্শনীতে ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দৃষ্টান্ত-জ্ঞাপক বস্তুও সেখানে আছে।

ভারতে মৌলিক বিজ্ঞান, প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও শিল্প-কারিগরী বিজ্ঞানের সংগ্রহ-শালা গড়ে উঠতে আরম্ভ করে স্বাধীনতা (১৯৪৭) পরবর্ত্তী কালে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি (১৯৫৫) দিল্লীতে ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়, বিজ্ঞান ভবনে এবং তার সঙ্গে একটি ছোট বিজ্ঞান সংগ্রহালয়ও গড়ে উঠল। যথেষ্ট-সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর সংগ্রহালয়টি উঠে গেল। ঐ একই সময়ে রাজস্থানে পিলানিতে বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সংলগ্ন সেন্ট্রাল মিউজিয়মে কারিগরী বিদ্যার অগ্রগতি ও সাফল্য মডেল প্রভৃতির সাহায্যে প্রদর্শিত হয়।

১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হল শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা পরিষদ, সংক্ষেপে সি. এস. আই. আর। এই পরিষদ একটি স্বয়ং শাসিত সংস্থা যার কাজ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণাগার চালান। এই সংস্থা ১৯৫৯ সালে ২রা মে কলকাতায় বিড়লা পরিবার কর্তৃক দান করা একটি বাড়ী ও একখণ্ড জমির উপর বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রথম স্থাপনের সময় এই সংগ্রহশালাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল সি এস আই. আর-এর বিভিন্ন গবেষণাগারে যে বৈজ্ঞানিক গবেগণা ও শিল্পোন্নয়নে উদ্ভাবনী কাজ হচ্ছে সেগুলি সম্বন্ধে এই সংগ্রহশালার মাধ্যমে উৎপাদক, বিজ্ঞানী, ব্যবহারকারী ও সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করে তোলা। কিন্তু একে একে প্রদর্শনী কক্ষগুলির উদ্বোধন হলে দেখা গেল যে বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত নানা রকম যন্ত্রপাতি, মডেল, ঐতিহাসিক নিদর্শন, আলোকচিত্র, চার্ট,

ডায়রামা প্রভৃতির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বিভিন্ন বিভাগের ক্রমোন্নয়ন, কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে যে সব নব নব পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলির কিছু কিছু, বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে, প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শনীর প্রকৃতি ও চরিত্রে ঐতিহাসিক ধারা তুলে ধরার প্রবণতা থাকলেও, বিজ্ঞানের প্রায়োগিক ও ব্যাবহারিক দিকগুলোকে উপেক্ষা করা হয়নি। প্রায় বিশ হাজার বর্গফুট ভিত্তিভূমি সমন্বিত তিনতলা বাড়িটিতে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রদর্শনী কক্ষ আছে: পরমাণু কেন্দ্রিক পদার্থবিদ্যা, শক্তি, জনপ্রিয় বিজ্ঞান, খনিবিদ্যা, তামা, লৌহ ও ইস্পাত, খনিজ তৈল. বিদ্যুত, দূরদর্শন ও বিদ্যুতিক (electronics) বিদ্যা, যোগাযোগ বিজ্ঞান (কম্যুনিকেশন) ও পরিবহন। এছাড়া নবনির্মিত ভবনের ভূগর্ভে কয়লা খনির বাস্তব উপস্থাপনা করা হয়েছে। সংগ্রহশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গন সর্পাগার, বামন গাছ (Bonsai) ও ক্যাক্টাসের প্রদর্শনী দিয়ে সাজিয়ে চত্বর সজ্জাকে শিক্ষামূলক ও তৃপ্তিদায়ক করা হয়েছে।

প্রায় একই সময় বাঙ্গালোরের একটি বিদগ্ধ মণ্ডলী পূর্বতন মহীশূর রাজ্যের প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, নগর পরিকল্পনা বিশারদ ও প্রশাসক প্রয়াত ডঃ.এম. বিশ্বেশ্বরাইয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবনটি ১৯৬২ সালে বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পরিষদের হাতে তুলে দেন, একটি শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্য। ১৯৬৫ সালে সেখানে বিশ্বেশ্বরাইয়া ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম নামে শিল্প ও কারিগরী বিষয়ে সংগ্রহশালার প্রথম প্রদর্শনী কক্ষের উদ্বোধন হয়। ধীরে ধীরে সেখানে চল্লিশ হাজার বর্গফুট গৃহাভ্যন্তর এলাকায় একটি আধুনিক শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহালয়ের উদ্ভব হয়। এই সংগ্রহশালায় প্রয়োগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলিকে মডেল ইত্যাদি মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে বোম্বাই শহরে নেহরু সাইন্স সেণ্টারের উদ্বোধন হয় ১৯৭৭ সালে। অবশ্য নেহরু সাইন্স সেণ্টার গড়ে তোলার কাজ এখনও চলছে।"শব্দ ও শ্রবণ", "বিজ্ঞান ও শিশু" এবং "অজানাকে জানা" নামে তিনটি এক্সিবিশন গ্যালারীতে প্রদর্শ তৈরীর কাজ এগিয়ে চলেছে। এর সঙ্গে সেখানে গড়ে উঠছে পাঁচ একর জমির উপর চিলড্রেনস সাইন্স পার্ক। সেখানে চৌষট্টিটি বৃহাদাকার মডেলের সাহায্যে বিজ্ঞানের মজাদার দিকগুলি তুলে ধরা হচ্ছে।

১৯৭৩ সালে যোজনা কমিশন দেশের বিজ্ঞান ও শিল্প সংগ্রহালয়গুলি সম্বন্ধে উপযুক্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নেবার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেন। এই টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ অনুসারে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের অধীনস্ত সকল সংগ্রহশালা ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়মস (NCSM) গঠন করেন, তার পরিচালনাধীনে নিয়ে আসা হয় ১৯৭৮ সালে। জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহশালার মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের সকলদিকে অভাবনীয় উন্নতি যে দ্রুততার সঙ্গে সাধিত হচ্ছে তার সঙ্গে তাল রেখে অজ্ঞ, অর্ধশিক্ষিত শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী জনসাধারণ,

যাঁরা বিজ্ঞানে অশিক্ষিত বা বিশেষজ্ঞ নন, তাঁরা যাতে বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে চাক্ষুষ সচেতনতা ও জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন সে বিষয়ে জাতীয় উদ্যোগ সৃষ্টি করা। ১৯৮১-৮২ সালে এন সি এস. এম পরিচালিত সকল সংগ্রহশালা, সাইন্স সেণ্টার ও ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী-গাড়ী পঁচিশ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছতে পেরেছে বলে তারা দাবী করেন। সে বছর মোট খরচ হয়েছে প্রায় দু' কোটি টাকা।

পরিষদ তিনটি কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা ও ছ'টি মোবাইল ভ্যানে প্রদর্শনী ছাড়াও, ছ'টি সাইন্স সেণ্টার চালাচ্ছেন। সেগুলি ক্ষুদ্রায়তন সংগ্রহশালা ও তৎসম্বন্ধীয় আঞ্চলিক কর্মকেন্দ্র। এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ান - যেমন, পুরুলিয়া ও মালদার জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং পাটনার শ্রীকৃষ্ণ সাইন্স সেণ্টার, এগুলি কাজ করছে এবং কর্ণাটকে গুলবার্গ, গুজরাটে ধরমপুর এবং তামিলনাড়ুর তিরুনেলিভেলি জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্র, এগুলি এখন গড়ার পথে। এছাড়া এই পরিষদের আছে পরিকল্পনা ও নক্সা কেন্দ্র এবং প্রদর্শ তৈরী ও সংগ্রহ কেন্দ্র। সেমিনার, বক্তৃতা, আলোকচিত্র প্রদর্শন, কুইজ কনটেস্ট, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা, হবি সেন্টার, বাৎসরিক বিজ্ঞান মেলা, অস্থায়ী প্রদর্শনী শিক্ষক-শিক্ষণ, সংগ্রহশালা, বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি এদের নিয়মিত কার্যক্রম। সব মিলিয়ে আধুনিক সংগ্রহশালার বহুমুখী কাজকর্ম এই সংগ্রহশালাগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে ভারতে সংগ্রহশালা আন্দোলনে এদের স্থান সর্বাগ্রে। এই পরিষদ শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার সেকেন্দ্রাবাদে, বিহার সরকার পাটনায় এবং কেরল ও তামিলনাড়ু সরকার সাইন্স মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং (NCERT) ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাইন্স এডুকেশন সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সবকটি সংস্থার কাজ যদি পরিকল্পনা মাফিক শেষ হয় তবে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্প ও কারিগরীবিজ্ঞান সংগ্রহশালার ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তৃতি ঘটার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। আর একটি বিষয় পাঠকদের জানান দরকার। যন্ত্রশিল্প ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত আধুনিক সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক কালে। কিন্তু ১৮৮৮ সাল থেকেই এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে লর্ড রি (Lord Reay) ইণ্ডাস্ট্রীয়াল মিউজিয়ম স্থাপিত হল ঐ বছর। সে সময় পুনে শহরে একটি শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই মেলা থেকেই ঐ সংগ্রহশালার জন্ম। ঠিক একইভাবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্থাপিত হল মাদ্রাজে ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট সংলগ্ন ইন্ডাস্ট্রীয়াল মিউজিয়ম। ১৯২৭ সালে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার ষাট বছর জন্মবার্ষিকীতে ত্রিবান্দ্রমে শ্রীমুলম ষষ্টি অব্দ পূর্ত্তি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট নামে একটি দারু ও হস্তীদন্ত শিল্পের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। পি. কে. সেনগুপ্ত নামে এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বিহার কমার্শিয়াল মিউজিয়মটি ১৯৩৬ সালে গড়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সে সংগ্রহালয়টি বেশিদিন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে, ১৯৩৯ সালে, গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এণ্ড কমার্শিয়াল মিউজিয়ম নামে একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করে সেখানে বাংলার শিল্প দ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এর চরিত্র ত্রিবান্দ্রমের সংগ্রহশালাটির মত হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগ্রহে পরিণত হয়। ভারতীয় যাদুঘরের ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ও ইকনমিক বোটানি বিভাগটি মূলত বোটানি বিষয়ক সংগ্রহশালা। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের অধীন জুট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী সংলগ্ন জুট মিউজিয়মটি পাটশিল্প ও পাটজাত দ্রব্যের নিদর্শনাগার। এটি কলকাতায় স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালে। ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের অধীন রিজিওনাল লেবর ইনস্টিটিউট-এর ইণ্ডাস্ট্রীয়াল সেফটি মিউজিয়মে শিল্পে দুর্ঘটনা পরিহার ও দুর্ঘটনা ঘটলে কি করণীয় সেই সংক্রান্ত নিদর্শন আছে। ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টের ইনস্টিটিউট অফ পোর্ট ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত একটি বন্দর পরিচালনা সংক্রান্ত ছোট সংগ্রহশালাকে বর্তমানে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা বন্দর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে চলেছেন। শ্রীরামপুরের কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজির টেক্সটাইল মিউজিয়মে বয়ন শিল্পে সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ছোট একটি সংগ্রহ আছে।

পাকিস্তানের একমাত্র শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহালয়, মিউজিয়ম অফ সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি, সরকার প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংশাসিত সংস্থা। লাহোরে এর অবস্থান এবং এর উদ্বোধন হয় ১৯৭৬ সালে, তখন তার প্রদর্শনী কক্ষে মোট ৮৮টি প্রদর্শ বস্তু ছিল। বর্তমানে সম্প্রসারিত এই সংগ্রহশালায় ফ্লুইড মেকানিক্স, আলো ও যন্ত্র, অ্যানিমেটেড মানবদেহ, শক্তি, শব্দ, ব্যবহার কেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব এবং বিদ্যুতের উপর ১৫০টি প্রদর্শবস্তু প্রদর্শিত হয়। সংগ্রহশালা ভবন নির্মাণ শেষ হলে গৃহাভ্যন্তর স্থানের আয়তন হবে ৭৫ হাজার বর্গফুট।

ফিলিপন্স সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি মিউজিয়মের বর্তমান নাম Tuklasang Agham ng Philipines, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, TAP যার প্রতিষ্ঠা ১৯৬৮ সালে। তখন TAP Science Foundation of Philipines এর কাছে বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। ফিলিপিনের সাইন্স ফাউণ্ডেশন এই কাজের দায়িত্ব দেয় ঐ সংস্থার রিসার্চ এণ্ড ডেভলপমেণ্ট ইউনিটের উপর এবং ১৯৭৪ সালে রিসার্চ ইউনিট তাদের তৈরী প্রদর্শবস্তু ও অন্যান্য নিদর্শন সহ একটি প্রদর্শনী দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখায়। এখন এই রিসার্চ এণ্ড ডেভলপমেণ্ট ইউনিট ফিলিপিনস সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি মিউজিয়মের প্রদর্শ তৈরী ও নিদর্শন সংগ্রহের কাজ করে। সংগ্রহশালাটি TAP এর পরিচালনাধীন। বর্তমানে শিল্প ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে একশটির উপর প্রদর্শ তৈরী করা হয়েছে এবং সেগুলি অস্থায়ীভাবে এক্সপ্লোরেটোরিয়ম গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। ১৫ হাজার বর্গমিটার গৃহায়তন বিশিষ্ট একটি ত্রিতল ভবনে, যখন পুরো সংগ্রহশালাটি নির্মাণের কাজ শেষ হবে, তখন সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, মানব শরীর-বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও শিল্প, বৈজ্ঞানিক অভিযান, বিজ্ঞানে বিশেষ ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক সাফল্যের উপর প্রদর্শনী বিভাগ খোলা হবে। এ ছাড়াও

পরীক্ষাগার, প্রেক্ষাগৃহ, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও বিদ্যুতিন (electronics) বিষয়ে প্রদর্শনীকক্ষ অদূরে ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে। সব মিলিয়ে ফিলিপিনস সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি মিউজিয়ম একটি পরিপূর্ণ, আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প ও যন্ত্র বিজ্ঞান সংগ্রহশালা হয়ে উঠবে।

শ্রীলংকার কলম্বো ন্যাশন্যাল মিউজিয়মের ভবনে ন্যাশন্যাল মিউজিয়ম অফ সাইন্স এণ্ড টেকনোলজির কাজ এগিয়ে চলেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় এগারটি সাইন্স মিউজিয়ম রয়েছে, যেগুলি বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। এর মধ্যে সিওলে অবস্থিত ন্যাশন্যাল সাইন্স মিউজিয়ম অফ সিওল এবং একটি এডুকেশন ফাউন্ডেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত কোরিয়ান চিল্ড্রেন সাইন্স সেন্টার। অবশিষ্ট নটি স্টুডেন্টস সাইন্স সেণ্টার ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে নটি প্রাদেশিক রাজধানীতে সরকারী শিক্ষা মন্ত্রক কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েছে। এগুলির উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা বাড়ান এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা। সিওলের ন্যাশন্যাল সাইন্স মিউজিয়ম ২২০টি প্রদর্শ বস্তু নিয়ে ২৯ হাজার বর্গফুট গৃহায়তন বিশিষ্ট ত্রিতল ভবনে ১৯৭২ সালে কাজ শুরু করে। এই সংগ্রহশালায় দর্শকেরা নিজেরা যন্ত্রপাতি ছুঁয়ে,—নিজেদের হাতে চালিয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনে যন্ত্রপাতির অংশগুলি নিজেরাই লাগিয়ে প্রদর্শ বস্তুর সঙ্গে কাজে কর্মে জড়িয়ে যেতে পারেন। সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় দর্শকের সঙ্গে প্রদর্শের নিবিড়ভাবে হাতে কলমে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। ন্যাশন্যাল সাইন্স মিউজিয়মে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর প্রদর্শনী আছে এবং তার মধ্যে যন্ত্র শিল্প ও কারিগরী প্রদর্শের প্রদর্শনী কক্ষ একটি। সুতরাং এটি পুরোপুরি শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা নয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার মতই থাইল্যান্ডে পৃথক কোনও শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা নেই। ব্যাংককে অবস্থিত, ১৯৭৯ সালে স্থাপিত, সে দেশের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে ব্যাংকক সাইন্স মিউজিয়ম শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহের সম্পদ কেন্দ্র (Resource Centre) হিসাবে কাজ করে। সেখান থেকে প্রদর্শসমূহ স্কুলে স্কুলে পাঠান হয়।

শিল্প বিপ্লবের ফলে মজুর শ্রেণীকে যে আর্থিক শোষণ ও অবর্ণনীয় জীবন সংগ্রামের মধ্যে পড়তে হয়, তার সুরাহার পথ সন্ধান করতে গিয়ে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৪), চার্লস ফুরিয়ার, সাঁৎ সিমো, উইলিয়ম টমসন প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তাধারায় জন্ম নিল সমাজতন্ত্রবাদ অর্থাৎ উৎপাদন শক্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মতাদর্শ। এই সমাজতন্ত্রবাদকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে। তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস-এর সহযোগিতায় কম্যুনিস্ট ইস্তাহার প্রকাশ (১৮৪৮) এবং মার্কস কর্ত্তৃক 'দাস-ক্যাপিট্যাল' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা কয়েক দশকের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টি করল। মার্কসের মতাদর্শকে বাস্তবে রূপ দিলেন লেনিন, তাঁর সাম্যবাদী

দলের বিপ্লবী সোভিয়েট অর্থাৎ সৈনিক ও শ্রমিকদের স্থানীয় কমিটিগুলির সহায়তায়, ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা এই শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে আজ বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনসাধারণ ও এক পঞ্চমাংশ ভূ-খণ্ডে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংগ্রহশালার উপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং তার সকল কার্যক্রম গণমুখী। এইজন্য সোভিয়েট রাশিয়ার সংগ্রহশালাগুলির একটু পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি। মার্কস তাঁর জীবনের শেষ তেত্রিশ বছর ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে তাঁর মতবাদকে পরিপুষ্ট ও তথ্যমূলক করে তোলেন। মার্কসের যুগান্তকারী দার্শনিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় বৃটিশ মিউজিয়মের অবদান পরোক্ষ হলেও নগণ্য নয়। ঐ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন কালেই তাঁর 'দাস ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থটি রচিত হয়।

জার শাসিত রাশিয়াতে ১৮২টি সংগ্রহশালা ছিল, বেশির ভাগই পেট্রোগ্রাড ও মস্কো অঞ্চলে। সামান্য কটি সংগ্রহশালা ছিল উরাল ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চলে, মধ্য এশিয়ায় এবং কাজাকস্তানে। অধিকাংশ সংগ্রহশালায় তখন সাধারণের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। ১৯১৭ সাল অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত মস্কো হিস্ট্রি মিউজিয়মে ১৯টি গ্রুপ শ্রমিক, কৃষক এবং অফিস কর্মচারী ঢুকেছিলেন। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তীকালে একমাত্র ১৯২২ সালে এ রকম ২২২টি গ্রুপ ঐ সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন। পেঞ্জা (Penza) নগরীর মিউজিয়মটি ১৯১১ সালে প্রায় ন'শ দর্শক দেখেন, সে ক্ষেত্রে ১৯২৩ সালে ঐ একই সংগ্রহশালায় দর্শক হয় তেইশ হাজার। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে প্রদেশগুলিতেই ২৫০টি নোতুন মিউজিয়ম স্থাপিত হল এবং ১৯২৭ সালে রুশ বিপ্লবের দশ বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় মিউজিয়মের সংখ্যা দাঁড়াল আটশ'র বেশি। দর্শকের সংখ্যা? লক্ষের বদলে কোটি কোটি। ষাটের দশকে রাশিয়ায় মিউজিয়ম দর্শকের সংখ্যা বছরে ছ'কোটি; যেখানে মোট লোক সংখ্যা ২০ কোটি। সংগ্রহশালা পৃথিবীর কোথাও যদি প্রকৃত অর্থে গণশিক্ষা ও গণসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনজীবনের অংশ হয়ে থাকে, তা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ায়। ১৯৬৭ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়ায় ন'শর বেশি স্বীকৃত সংগ্রহশালা আছে এবং এই সংখ্যার মধ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, কলকারখানা ও রাষ্ট্রীয় খামারের সঙ্গে যুক্ত অজস্র সংগ্রহশালা ধরা হয় নি। ঐ ন'শটি সংগ্রহশালায় দু কোটি পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি প্রকৃতি বিদ্যা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত নিদর্শন রয়েছে। এছাড়া জাতীয় প্রজাতান্ত্রিক প্রদেশগুলিতে, যেখানে বিপ্লবপূর্বকালে মাত্র ৩১টি সংগ্রহশালা ছিল, এখন সেখানে এর দশগুণ সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। প্রতি বছরই বেশির ভাগ সংগ্রহশালায় নোতুন নোতুন প্রদর্শকক্ষ যুক্ত হচ্ছে। এইভাবে রাশিয়ায় অব্যাহত গতিতে এগিয়ে

চলেছে সংগ্রহশালার ক্রম প্রসারণ ও উন্নয়ন। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা হয় সংগ্রহশালা সে দেশে কেন এবং কিভাবে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে সংগ্রহশালা সম্বন্ধে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ধারণা কি এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংগ্রহশালার গুরুত্বকে রাষ্ট্রপরিচালকেরা কি পরিমাণ স্বীকৃতি দিয়েছেন তা' জানা দরকার।

অক্টোবর বিপ্লবের এক মাসের মধ্যে রাশিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের জনশিক্ষা মন্ত্রক থেকে জনগণের কাছে আবেদন করে জানান হয় যে, রাশিয়ার জনগণ দেশের সকল প্রাকৃত সম্পদ ছাড়াও বিপুল পরিমাণ সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী হয়েছে, যেমন মনোরম প্রাসাদ ও অট্টালিকা, দুর্লভ ও দামী ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ মিউজিয়ম, শিক্ষা-সংস্থা, বড় বড় গ্রন্থাগার প্রভৃতি। সেই আবেদনে বলা হল এগুলি যেন সযত্নে রক্ষা করা হয় এবং প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেন জনগণের নান্দনিক মানোন্নয়ন ও নোতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যবহার করে গণশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে গণশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সরকারী বিভাগগুলি সংগ্রহশালাগুলির উপর বিশেষ নজর দিল। প্রথম জনশিক্ষা কমিশনার আনাতোলি লুনাচার্স্কি সংগ্রহশালা বিষয়ে তাঁর ধারণা ঘোষণা করে জানালেন "আমরা যদি শ্রদ্ধাহীনভাবে এর দিকে তাকাই, তবে আমরা মানব সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ ঘটাব, কেননা, Mnemosyne, স্মৃতির দেবী হচ্ছেন মিউজ কন্যাদের মা এবং মিউজিয়ম হচ্ছে মানব জাতির ঐশ্বর্যময় স্মৃতি-গ্রন্থ।" ফলে ১৯১৭ সালেই সংগ্রহশালা ও স্মৃতি-সৌধগুলি সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠন করা হল। এই সংস্থায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও সংস্কৃতিবিদদের কাজে লাগান হল। প্রদেশগুলিতেও এ রকম সংস্থা গড়া হয়। পেট্রোগ্রাড, বর্তমান লেনিন গ্রাড হল ঐ সংস্থার কেন্দ্রস্থল। সঙ্গে সঙ্গে সকল রকম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহ এবং সৌধ নথিভুক্ত করা হল। ঐ সব সংগ্রহ ও সৌধগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে ঘোষিত হওয়ায় সরকার এ গুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও জনশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে কাজে লাগান শুরু করে দিল। ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের ঘর, বাড়ী, খামার এস্টেট প্রভৃতি স্মৃতি-সংগ্রহালয়ে রূপান্তরিত করা হল। চিত্র ভাস্কর্য্য ও অন্যান্য আলংকারিক শিল্পবস্তুর সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা শিল্প নিদর্শনের রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করে তোলে। প্রদর্শনীর জন্যও অর্থের দায় নিল রাষ্ট্র। যে সমস্ত সংগ্রহ ভাণ্ডার ব্যক্তি মালিকানায় ছিল, রাষ্ট্র সেগুলিরও রক্ষণাবেক্ষণের সার্টিফিকেট দিল। ১৯২৩ সালে এরকম প্রায় ছ'শ সার্টি-ফিকেট ইস্যু করা হয়। বিপ্লব-পূর্ব সংগ্রহশালাগুলিতে নোতুন নোতুন সংগ্রহ সংযোজিত হওয়ায় সেগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। যেমন ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সাল এই চার বছরে মস্কো আর্ট গ্যালারি, যার অন্য নাম ট্রেটিয়াকভ (Tretyakov) গ্যালারী, ১২২টি জিনিস সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল এই চার বছরে ঐ গ্যালারীর নোতুন সংযোজনের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭৫০। বিপ্লবোত্তর প্রথম পাঁচ বছরে লেনিনগ্রাডের

হারমিটেজ (Hermitage) নামক মিউজিয়মের সংগৃহীত বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এক লক্ষেরও বেশি। মিউজিয়ম বিভাগ অভিজাত পরিবারের ৫২০টি এস্টেট নথীভুক্ত করলেন। বিপ্লবোত্তর প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র কয়েকটি সম্পূর্ণ নোতুন ধরনের মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করলেন, যেগুলি হিস্টরিক্যাল রেভল্যুশনরী মিউজিয়ম, যেমন মিউজিয়ম অফ দি রেভল্যুশন, সোভিয়েট আর্মি মিউজিয়ম, মস্কোর কার্লমার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স মিউজিয়ম প্রভৃতি। ১৯৩৬ সালে সেন্ট্রাল লেনিন মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩৭ সালে অল ইউনিয়ন পুস্কিন এক্জিবিশনের অনুষ্ঠান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জনশিক্ষা বিভাগের অধীনে যে ১২২টি সংগ্রহশালা ছিল তার মধ্যে ১১৪টি লুণ্ঠিত অথবা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বহু সংগ্রহশালা বন্ধ করে দিতে হয়। সে সময় অনেক সংগ্রহশালা কর্মী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নানা ধরনের বস্তু ও নিদর্শন সংগ্রহ করার কাজে লেগে গেলেন, যার ফলে শুধুমাত্র সোভিয়েট আর্মি মিউজিয়ম নয়, অন্যান্য অনেক স্থানীয় ও প্রাদেশিক ঐতিহাসিক সংগ্রহশালায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক বাহিনী ও জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসের বাস্তব নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। প্রবহমান ঘটনার লভ্য সাক্ষীসমূহ পরম যত্নে সংগ্রহ করে রেখে জাতির সাম্প্রতিক ও অনতি অতীত বাস্তব ইতিহাসে মিউজিয়মকে সমৃদ্ধ করার এরকম সমাজ ও ইতিহাস সচেতন দায়িত্ব আর কোন দেশের সংগ্রহশালার কর্মীরা এমন গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন? যুদ্ধোত্তর কালে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত সংগ্রহালয়গুলির পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যুদ্ধকালীন অবস্থার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে U. S. S. R. কাউন্সিল অফ মিউজিয়ম ১৯৪৮ সালে সাংস্কৃতিক সৌধগুলির সংরক্ষণের উন্নতিসাধন এবং সংগ্রহশালাগুলির সম্পদ-সামগ্রীর উন্নত পদ্ধতিতে তালিকা তৈরী এবং স্টোরেজের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। পঞ্চাশের দশক থেকে সোভিয়েট রাশিয়ায় সংগ্রহশালা প্রসারণে এক নোতুন অধ্যায় শুরু হ'ল। মস্কোতে ক্রেমলিনের মিউজিয়ম ও স্মৃতি সৌধগুলি সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল। কালুগাতে প্রথম মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মস্কোর অ্যান্ড্রোনিয়েভ্স্কি যাজকীয় বিহারে আন্দ্রেই রুব্লেভ মিউজিয়ম অফ ওল্ড এর দ্বারোদ্ঘাটন করা হ'ল। মিউজিয়ম অফ দি ইউ. এস.এস. আর আর্মড ফোর্সের নোতুন গৃহ নির্মাণ করা হল। আলংকারিক ও প্রয়োগ শিল্পের উপর নোভগোরোড, ভ্লাডিমির, সুজডাল, কস্ট্রোমা, গোর্কি, ইয়ারোশ্লাভ্ল্ প্রভৃতি স্থানে নোতুন কয়েকটি মিউজিয়ম স্থাপিত হয়। কিঝি, কস্ট্রোমা, তাল্লিন্ আর্চেঞ্জেল প্রভৃতি স্থানের মুক্তাঙ্গন সংগ্রহালয়গুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিপ্লব ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত নানা জায়গায় নোতুন নোতুন স্মৃতি সংগ্রহালয় গড়ে উঠেছে। সাহিত্য, নাটক ও সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সংগ্রহশালার বিস্তৃতি ঘটেছে। তিরিশটির বেশি নোতুন চারু ও কারুকলা বিষয়ক মিউজিয়ম খোলা হয়েছে। ১৯৬৫ সালের ২রা জুন সোভিয়েট সরকারের ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টারস সে দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা, মিউজিয়ম ফাণ্ডস অফ দি ইউ. এস. এস. আর নামে এক আইন জারী করে

মিউজিয়মগুলির অর্থ সচ্ছলতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ এক দুর্লভ উদাহরণ। দেশের সংগ্রহশালা সম্বন্ধে ভাবছেন সরকারে কোনও একটি মন্ত্রক নয়, খোদ মন্ত্রীসভা। ইউ. এস. এস. আর সংস্কৃতি মন্ত্রক লোক সাহিত্য, শিল্প ও স্মৃতি সংগ্রহালয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় নোতুন বিধি রচনা করেছেন। একথা মনে করলে ভুল হবে যে শুধুমাত্র মিউজিয়ম নামধেয় মৃত বা অবরুদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেই সোভিয়েট রাষ্ট্র দায়মুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্র এই সব প্রতিষ্ঠানের সকল দায় বহন করে এবং সে কাজ করে ব্যাপকতর জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানোন্নয়ন এবং নোতুন বিপ্লবী সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। স্মরণীয় ১৯১৮ সালের মিউজিয়মের উপর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট-ডিক্রিতে ঘোষিত হয়েছে যে সকল স্মৃতি সৌধ, সেগুলির মালিক যারাই যোক না কেন, রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে রাখা হল এবং রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পদের রক্ষণ ও সে বিষয়ে পঠন-পাঠন এবং সেগুলি ব্যাপকতম জনগণের নজরে আনার জন্য এই সৌধগুলি গ্রহণ করা হল। বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় বহু শহর ও গ্রামে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালাগুলিকে কি ভাবে ব্যাপকতম জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাজে লাগান যায়, সে বিষয়ে মিউজিয়ম কর্মী ও পরিচালকদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় ১৯১৯ সালে, পেট্রোগ্রাডে অনুষ্ঠিত, অল রাশিয়া কনফারেন্সে। রাশিয়ায় বিষয়কেন্দ্রিক ও বস্তুভিত্তিক প্রদর্শনীর উপর জোর দেওয়া হয় এবং বিষয় ও প্রদর্শগুলিকে সহজবোধ্য করার জন্য চার্ট, ম্যাপ, ফটো, চিত্র, মডেল, ডায়াগ্রাম, লেবেল প্রভৃতি ব্যবহারের উপর প্রয়োজনমত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯২৮ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংগ্রহশালার উপর প্রচার অভিযান চালান শুরু হল। সংগ্রহশালার উপর গণ প্রচার বিশ্বের সংগ্রহশালার ইতিহাসে এই প্রথম সংগঠিত হল। বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হল। স্কুল কলেজ কারখানা থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ দর্শক সংগ্রহ করে আনার উপর জোর দেওয়া হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংগ্রহশালাগুলি জনমনে জাতীয়তাবোধ ও বিপ্লবী চেতনা বৃদ্ধির কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। বক্তৃতা ও প্রচার-পুস্তিকার মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করার কাজ হাতে নিল সংগ্রহশালা। সমস্ত স্থানিক ও আঞ্চলিক সংগ্রহশালাগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে কি কি প্রাকৃত সম্পদ আছে যা প্রতিরক্ষা শিল্পের কাজে লাগবে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে সরকারকে সে বিষয়ে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ ও স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ ও সম্পদের উপর তথ্যানুসন্ধান করে যুদ্ধকালীন অভাবের অবস্থায় জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও খাদ্য সম্পদ বৃদ্ধির কাজে হাত লাগাল মিউজিয়মের কর্মীর দল। সংগ্রহশালাগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উপকরণের নানা দিক নিয়ে গবেষণার জন্য ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট। এদের প্রথম কাজ হল সংগ্রহশালার উপাদানকে কিভাবে প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এর ফলে স্কুল, কলেজের শিক্ষায় সংগ্রহশালার প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেল। স্থানীয় সংগ্রহশালাগুলি সোভিয়েট জনগণের ইতিহাস রচনার কাজে ক্রমান্বয়ে গবেষণা

করে যাচ্ছে এবং ইতিহাস রচনায় সহায়ক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। ভাবলে অবাক হতে হয় যে রাশিয়ায় সংগ্রহশালাগুলি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর জন্যে যেমন মিউজোবাস ব্যবহার করে, তেমনি মিউজো-ট্রেন ও মিউজো-শিপ ব্যবহারও করে থাকে। এরকম একাধিক রেলগাড়ী ও জাহাজ আছে যার মধ্যে সাজান গোছান প্রদর্শিত বস্তু সম্ভার নিয়ে সে সব যান দেশের এক প্রান্তে থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যথাক্রমে স্থলপথে ও জলপথে। সংগ্রহশালা নিয়ে যে দেশে এত বড় গণমুখী কর্মকাণ্ড চলেছে সে দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ প্রতি বছর সংগ্রহশালার দর্শক হবেন এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে উত্তর আমেরিকাস্থ তেরটি ব্রিটিশ উপনিবেশের জন-সংখ্যার বৃহত্তম অংশ ছিল ইংরেজ। স্বভাবতই মূল ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঐ সব উপনিবেশগুলিতে অনুপ্রবেশ করে। অবশ্য উত্তর আমেরিকার সাধারণ ঔপনিবেশিকেরা স্বভূমি ও স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। একমাত্র ভার্জিনিয়া ও ক্যারোলিনা অঞ্চলে ইংরেজ অভিজাত উপনিবেশকারীরা ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনচর্চা ও ধ্যান-ধারণাকে অনেক বেশি অনুসরণ করতেন। বোধহয় এই কারণেই উত্তর আমেরিকা বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মিউজিয়মটি দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লসটন শহরে অবস্থিত লাইব্রেরী সোসাইটি অফ চার্লসটন কর্তৃক ১৭৭৩ সালে স্থাপিত হয়, সাউথ ক্যারোলিনার প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও ইতিহাস সংক্রান্ত সমীক্ষা, অনুসন্ধান, নিদর্শন-সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য। ১৭৮৪ সালে চার্লস উইলসন পিয়েল নামে এক ব্যক্তি ফিলাডেলফিয়া শহরে একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে তোলেন। তাঁর সংগ্রহশালায় ছিল বৃহদাকার জীব জন্তুর অস্থি, পশু-পক্ষীর ছালে কাঠের গুঁড়ো পুরে সজীব ভাবে দাঁড় করান নিদর্শন এবং তাঁর আঁকা স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত নেতৃবর্গের প্রতিকৃতি।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ঘাঁটি ছিল ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ উপনিবেশ। এই ম্যাসাচুসেট্‌সে অবস্থিত সেই বিখ্যাত বোস্টন বন্দর, যেখানে ঔপনিবেশিকদের প্রথম বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, ১৭৭৩ সালে। ফলে উপনিবেশকারী ও ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে লড়াই বেধে যায়। অবশেষে উত্তর আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। ফলত এই বোস্টন বন্দরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ঐতিহাসিক সমিতি 'ম্যাসাচুসেটস হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ১৭৯১ সালে। ঐ সোসাইটির প্রধান উদ্যোক্তা রেভারেণ্ড জার্মি বেল্‌ক্‌ন্যাপ ঘোষণা করেন "আমরা নিষ্ক্রিয় নই, সক্রিয়, আমরা সাহিত্যানুরাগী সংগঠন (literary body) গড়তে চাই, শুক্তির মত শুয়ে শুয়ে জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করে থাকব না, পুঁথি পত্র দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধান করব, খুঁজে বার করব, সংরক্ষণ করব এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে অন্যকে জানাব। তাঁর কথা "কোলের উপর এসে পড়বে ভেবে ঘরে বসে না থেকে, শিকার সন্ধানী নেকড়ের মত ঘুরে বেড়ান, একটি ভাল সংগ্রহ ভাণ্ডার গড়ে তোলা

এবং চতুর্দিকে ভালমত নজর রাখার চেয়ে ভাল কিছু আর নেই।" রেভারেণ্ড বেলক-ন্যাপের অত্যুৎসাহী উক্তি থেকে নোতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত, সংগ্রামী ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি বিদগ্ধ জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সচেতনতা এবং ঐতিহাসিক নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যবহারের সঠিক দৃষ্টিকোণের আভাস পাওয়া যায়। সংগ্রহশালা সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বেলকন্যাপের "To Seek and Find, to Preserve and Communicate" উক্তিটির মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে উপস্থিত। আজকের আধুনিক সংগ্রহশালাগুলি এখনও ঐ লক্ষ্য সাধনে নানা ভাবে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে সংগ্রহশালার নিদর্শনগুলিকে লোক শিক্ষার জন্য হাজারো পদ্ধতিতে সর্বজন গ্রাহ্য ও সহজ বোধ্য করার চেষ্টা চলছে। শিক্ষামূলক ও চিত্ত বিনোদক 'কম্যুনিকেশন' এ যুগের মিউজিয়মগুলির মূল লক্ষ্য।

রেভারেণ্ড বেলকন্যাপকে যে ব্যক্তিটি প্রথমে উৎসাহিত করেন তার নান জন পিণ্টার্ড, নিউ ইয়র্কের অধিবাসী। পিণ্টার্ড নিজেও ১৮০৪ সালে নিউইয়র্ক হিস্টরিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় বেলকন্যাপ ও পিণ্টার্ডের সহযোগী ঈশাইহু টমাস (Isaih Thomas) অ্যামেরিকান অ্যাণ্টিকুয়োরিয়ান সোসাইটি গঠন করে তার প্রথম সভাপতি হন। অষ্টাদশ শতকে ইওরোপে যে জ্ঞান দীপ্তির অভ্যুদয় হয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হিস্টরিক্যাল সোসাইটি গড়ে তোলার ব্যাপারে যাঁরা উদ্যোগ নেন, তাঁরাও সেই জ্ঞানদীপ্তির আদর্শে আস্থাবান ছিলেন এবং সোসাইটি অফ অ্যাণ্টি-কুয়োরিয়ান অফ লণ্ডন বা এডিনবরার সমজাতীয় সোসাইটি এবং ফ্রান্সের L' Academic des Inscriptions et Belles-Letters-এর সদৃশ জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু বিদগ্ধ সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ঐ সব হিস্টরিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। অবশ্য উৎসাহ খুব গভীর ও দৃঢ় ছিল এমন বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক হিস্টরিক্যাল সোসাইটির প্রথম দিকের দু একটি সভার মজাদার বিবরণী পেশ করি। একদিন এক বক্তৃতা সভাতে বক্তা যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন, তখন দেখা গেল সভাপতি কবি উইলিয়ম ব্রায়াণ্ট নিদ্রামগ্ন। বক্তা যখন তার বক্তৃতার উপসংহারে সভাপতি ব্রায়াণ্টের Thantopsis কবিতার কটি পংক্তি পাঠ করছেন, তখন নিজের কবিতা শুনে এবং শ্রোতাদের হাত তালিতে সভাপতির ঘুম ভাঙতে, তিনিও শ্রোতাদের সঙ্গে হাততালি দিতে শুরু করলেন। একবার এক যুবতী ঐ সোসাইটির সভায় যান। তার দেওয়া প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ঃ "সে গুলিতে খুব সামান্য কিছু লোক বক্তৃতার সময় ঘুমানর জন্য যেতেন......এবং হঠাৎ বক্তার চকচকে চোখ (জাগ্রত) দর্শকের উপর পড়তে, তাঁর স্বরের কোনও রকম পরিবর্ত্তন না করে, তিনি বললেন—যেহেতু আপনি একা এই ঘরে জেগে আছেন, সেজন্য আপনার অনুমতি নিয়ে আমি পরবর্ত্তী দশ পাতা বাদ দিয়ে দিলাম।"

নিউইয়র্ক হিস্টরিক্যাল সোসাইটির চরিত্র ঠিক স্থানিক ছিল না। সমস্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমিতিকে যুক্ত করার উচ্চাশা সমিতি কর্তৃপক্ষের ছিল। যা কিছু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্রশাসন, সাহিত্য এবং ধর্মীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত, তার জন্য ঐ সমিতি এক আবেদন জানাল। জানান হল, আমেরিকা মহাদেশ এবং

প্রতিবেশী দ্বীপগুলির নানা ধরনের দ্রব্য যথা জীবজন্তু, গাছ-গাছালি এবং খনিজ পদার্থ, যেগুলি সংরক্ষণ যোগ্য, সবই সমিতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করবে।" ১৮১৭ সালে নিউইয়র্ক হিস্টরিক্যাল সোসাইটি কয়েকটি বিশেষ কমিটি তৈরী করলেন, যাদের কাজ হবে জীববিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, উদ্ভিদ-শারীরী-বিদ্যা, খনিজ পদার্থ বিদ্যা ও জীবাশ্ম তত্ত্ব এবং মুদ্রা ও মেডেল সংক্রান্ত নিদর্শন সংগ্রহ। ফলে সমিতির সংগ্রহের পরিধি ও কলেবর বাড়তে লাগল। ক'বছর পর ডঃ ন্যাথ্যান জারভিস আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের অস্ত্র-শস্ত্র, তৈজস-পত্র, পোষাক-আসাক এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দ্রব্যের এক অসাধারণ সংগ্রহ নিউইয়র্ক হিস্টরিক্যাল সোসাইটিকে দান করেন। এরপর ১৮৫১ সালে লেনক্সের নিনেভ ভাস্কর্য্যের সংগ্রহ ঐ সমিতি পেল। দুবছর বাদে ডঃ হেনরী অ্যাবটের মিশরীয় পুরাবস্তুর সংগ্রহে সমিতির সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৮৬৪ সালে হল যুক্ত টমাস জেফরসন ব্রিয়ানের খৃষ্টান শিল্পকলার অনন্য সংগ্রহ-সম্পদ। ইতিমধ্যে সমিতির সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে অ্যামেরিকান শিল্পীদের আঁকা প্রতিকৃতি ও অন্যান্য চিত্র সম্ভার। ফলে ১৮৭২ সালে নিউইয়র্ক শহরে মেট্রোপলিটন মিউজিয়ম অফ আর্টের উদ্বোধনের আগে পর্যন্ত নিউইয়র্ক হিস্টরিক্যাল সোসাইটির সংগ্রহশালাটি হয়ে উঠে আমেরিকা ও ইউরোপের শিল্পকলার সে দেশের বৃহত্তম সংগ্রহালয় ও চিত্রবীথি।

হিস্টরিক্যাল সোসাইটি অফ মিশিগান ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠার সময়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সমিতির উদ্দেশ্য হবে "(মিশিগান) লেক অঞ্চলের, বিশেষ করে মিশিগান রাজ্যের প্রকৃতি, প্রশাসন, সাহিত্য, গীর্জা এবং উপজাতি ইতিহাস সম্বন্ধীয় যে কোনও বস্তু আবিষ্কার, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ।"

এখানে লক্ষ্যণীয় যে Communication ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়নি। ইতিমধ্যে মোটামুটি একই উদ্দেশ্যে ১৮২৩ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ার এবং ১৮২৪ সালে পেনসিলভেনিয়া হিস্টরিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পেনসিলভ্যানিয়া সোসাইটির সংগ্রহ অবশ্য ঐ রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ১৮৬৪ সালে লিম্যান কোপল্যাণ্ড নামক একজন সংগ্রাহক স্টেট হিস্টরিক্যাল সোসাইটি অফ উইসকনসিন স্থাপন করেন। পূর্ববর্ণিত সোসাইটি গুলিতে সীমিত সংখ্যক সদস্য নেওয়া হত। লিম্যান প্রথম থেকেই সদস্যপদ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। সদস্যপদ লাভের একমাত্র শর্ত হল ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ। ফলে উইসকনসিনের অধিবাসীদের মধ্যে এই সোসাইটি সম্বন্ধে বেশ সাড়া পড়ে যায় এবং রাজ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে ভালমত অর্থ সাহায্য করে। শুধু এককালীন অনুদান নয়, ধারাবাহিক আর্থিক পৃষ্ঠ-পোষকতার দায় নিল রাজ্য সরকার। পরবর্ত্তীকালে উইসকনসিন রাজ্য সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে এগিয়ে আসে। এইজন্য লিম্যান কোপল্যাণ্ডকে প্রশংসা-সূচক পরিহাস করে বলা হয় ইতিহাসের ধুরন্ধর বিক্রেতা। মিশৌরীর রাজধানী সেণ্ট লুই শহরের গণ্যমাণ্য নাগরিকেরা ১৮৬৬ সালে এক গ্রীষ্মকালীন বিকেলে বসে ঠিক করলেন যে, মিশৌরী অঞ্চলের ইতি-

হাসকে রক্ষা করতেই হবে। যেমন সংকল্প তেমন কাজ—আর দেরী না করে সেই দিনই প্রতিষ্ঠিত হল মিশৌরী হিস্টরিক্যাল সোসাইটি। ব্যক্তিগত দান ও উৎসাহের উপর নির্ভর করে সেই সোসাইটি, সেণ্ট লুই, লুইসিয়ানা এবং মিশৌরীর ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিণ্ট সকল কিছু রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছিল। কিছুকালের মধ্যে সেই সোসাইটি গড়ে তুলল এক বিশাল লাইব্রেরী ও একটি সংগ্রহশালা—ঐতিহাসিক ভবন প্রেসিডেণ্ট জেফারসন মেমোরিয়াল বিল্ডিংএ। এখানে Famous Barr Company'র দেওয়া আর্থিক সাহায্যে বছরে প্রায় তিরিশ হাজার শিশু ও তরুণ-তরুণীদের "চোখে দেখে ও হাতে ছুঁয়ে" ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়, ও বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাৎসরিক শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। ওহিও রাজ্যের ক্লিভল্যাণ্ড শহরে ১৮৬৭ সালে স্থাপিত হল ওয়েস্টার্ন রিসার্ভ হিস্টরিক্যাল সোসাইটি সহ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা। একটি ঘরে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রারম্ভ এবং দীর্ঘ শত বৎসরে ১৯৬৭ সালে দেখা গেল এই সংস্থার ঘরের সংখ্যা সত্তরটি যার চারপাশে সুন্দর বাগান। এ ছাড়াও সোসাইটির পরিচালনাধীনে আছে প্রেসিডেণ্ট James A Garfield-এর বসত বাটি লনফিল্ড শতাধিক বছরের পুরাতন আসবাব পত্তরে সজ্জিত, ওয়েস্টার্ন রিসার্ভের গঠনরীতি বিশিষ্ট শ্যাণ্ডি হল এবং Jonathan Hale Homestead নামে একটি খামার মিউজিয়ম। থমসন অটো অ্যালবাম অ্যাণ্ড অ্যাভিয়েশন মিউজিয়মটি সোসাইটি মিউজিয়মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ১৯৬৫ সালে একটি আধুনিক অট্টালিকায় ফ্রেডরিক সি, ক্রফোর্ড অটো-অ্যাভিয়েশন মিউজিয়মটি হল সোসাইটির নোতুন সংযোজন। নিউইয়র্ক শহরে আমেরিকান নিউমিসমেটিক সোসাইটির মুদ্রা, মেডেল প্রভৃতির একটি অসাধারণ সংগ্রহশালা আছে। অল্প দিনের মধ্যেই সোসাইটিগুলি বুঝতে পারলেন যে প্রকৃতি বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিদর্শনগুলি তাঁদের আলোচনা ও গবেষণার বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। ত.৲ ম্যাসাচুসেট্স হিস্টরিক্যাল সোসাইটি ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি বিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল নিদর্শন বোস্টন মিউজিয়ম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রিকে এবং নিউইয়র্ক হিস্টরিক্যাল সোসাইটি তাদের সংগৃহীত ঐ জাতীয় জিনিস লাইসিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রিকে দান করে দেন। এইভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও মানব বিজ্ঞানের দুটি ভিন্ন ধারার জন্য ভিন্ন ধরনের বিদগ্ধ সমাজ ও সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার আধুনিক প্রবণতা দেখা দিল এবং সমিতির নামকরণের সঙ্গে উপকরণের বিষয়গত সাদৃশ্য দেখা গেল। ১৯৩৮ সালের গণনানুসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০০ সংগ্রহশালার মধ্যে দেখা যায় ১২৩৫ টি ইতিহাস সংক্রান্ত মিউজিয়ম। এই জাতীয় অধিকাংশ সংগ্রহশালা আয়তনে ছোট, দরিদ্র এবং কাজকর্মে ও প্রদর্শনে পুরাতনপন্থী, প্রায় সেই অষ্টাদশ শতকের ক্যাবিনেট অফ কিউরিওসিটিস থেকে যায়। আধুনিকতার কোন ছোঁওয়াই তাদের গায় লাগেনি। ১৮৮৪ সালে পেনসিলভেনিয়া হিস্টরিক্যাল সোসাইটিকে জন ব্যাক ম্যাকমাস্টার যে কথা বলে যান তার থেকে ১৯৩৮ সালের হিস্টরিক্যাল সোসাইটি সংগ্রহশালাগুলি এমন কিছু এগোয়নি। তাঁর কথা ঃ লোকেরা মনে করে এর বাড়ীটি হবে আলো

বাতাস হীন, নোংরা ও পুরোনো ঘরের সমষ্টি এবং এর সম্পদ হচ্ছে বাংকার হিলের বুলেট, ইয়র্ক টাউনের কামান, টিপেক্যানোর তীরের ফলাকা, এমন সব বই যা কেউ কখনও পড়েনি এবং জোড়া মোটর দানার মত দেখতে এ রকম সব (দাম্পত্য) প্রতিকৃতি চিত্র। এ সব সোসাইটিতে যে প্রাণবন্ত এবং মানবীয় কিছু থাকতে পারে তা' বিশ্বাস করা হয় না।"

গত শতকের মাঝামাঝি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক নোতুন ধরনের ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার উদ্ভব হতে থাকে, গুরুত্বপূর্ণ বা স্মরণীয় ঐতিহাসিক অট্টালিকা বা গৃহে যথা নিউইয়র্কের নিউবার্গে ১৭২৭ সালে নির্মিত হাসব্রাউক হাউসে ১৮৫০ সালে স্থাপিত সংগ্রহশালা। বাড়িটি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকালে জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটনের মূল ঘাঁটি ছিল। ১৮৫৯ সালে মাউণ্ট ভারনন্ লেডিস অ্যাসোসিয়েশন অফ দি ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা ও প্রথম প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনের বাগিচা কুটীর, যেখানে তার ভিটে ও সমাধি আছে, সেইস্থান আসবাব পত্তর ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও ভার্জিনিয়ার কমনওয়েল্‌থ্ এই কাজে এগিয়ে আসতে আগ্রহ প্রকাশ না করায় লেডিস অ্যাসোসিয়েশনের মহিলা সদস্য ও সমর্থকরা ঐকান্তিক উৎসাহে কঠিন পরিশ্রম করে এই ঐতিহাসিক স্মৃতিমণ্ডিত সংগ্রহশালাটি গড়ে তোলেন। মহিলা সমিতির দ্বারা স্থাপিত দ্বিতীয় কোনও সংগ্রহশালার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই। ১৭৭৬ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্স হলে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই হলঘর এবং তৎসহ লিবার্টি হল সংগ্রহশালায় পরিণত হয়। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে এ রকম কুড়িটি ঐতিহাসিক গৃহ, প্রাসাদ ও অট্টালিকা সাধারণ সংগ্রহালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই জাতীয় ইতিহাস খ্যাত স্থানকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক স্মৃতি সংগ্রহালয় গড়ে তোলার এক ব্যাপক ও জাতীয় গণ-প্রয়াস দেখা দেওয়ায়, পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই রকম সাতশ ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাসাদ ও অট্টালিকার দ্বার জনগণের কাছে উন্মুক্ত হল এবং এগুলির সবকটিই একেকটি সংগ্রহশালা।

অতীত অনুসন্ধিৎসা, সংগ্রামী ও উদ্যমশীল ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ এবং আমেরিকান জাতীয়তাবাদের গৌরব প্রকাশের ইচ্ছা এইসব স্মৃতি-সৌধ সংগ্রহশালা গড়ে তোলার কার্য্যকরী কারণ। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে বহু মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও অবসর বৃদ্ধির ফলে পর্য্যটন শিল্প গড়ে ওঠে এবং এই পর্য্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য এ জাতীয় স্মৃতিসৌধ সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে সম্পদশালী বণিক সমাজ সচেতন ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পর্য্যটক আকর্ষণের উপকরণ ঐ সব ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, গৃহ, প্রাসাদ প্রভৃতি ও তন্মধ্যস্থ সংগ্রহশালাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচারে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত হিস্টরিক্যাল মিউজিয়মের প্রদর্শন ব্যবস্থা বলতে ছিল স্থূল, গেরস্থের ভাঁড়ার ঘরের মত, মোটা ফ্রেমের ঢাউস ঢাউস শো কেসে ঠাসা জিনিস, সামনের সারির জিনিসে ঢাকা পিছনের সারির জিনিস, স্তিমিত আলো; প্রদর্শের সঙ্গে নেই কোনও

পরিচয় লিপি। জিনিস পত্রের হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ বুঝিয়ে দেবার মত প্রদর্শক দু এক জায়গায় থাকলেও তাদের টিকি দেখা ভার, ছবিগুলি বহু সারিতে একটির গায় লেগে আর একটি ঝুলছে, ঝাড় পোছ নেই। গবেষণার জন্য এই জাতীয় শো কেসে ঠাসা প্রদর্শনী ব্যবস্থা হয়ত বাধা সৃষ্টি করত না। কিন্তু সাধারণ দর্শকের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনে এদের ভূমিকা নগণ্য। কিন্তু পর্যটক আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ঐ সব পিরিয়ড এবং মেমোরিয়াল সংগ্রহশালার প্রতিটি সংগৃহীত জিনিস দর্শকের উপভোগ্য ও বোধগম্য করে তোলা হল।

বাণিজ্যিক বুদ্ধি নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দু একজন ব্যক্তি তথাকথিত মিউজিয়ম তৈরী করেন। এমন এক ব্যক্তির নাম পি. টি বার্নাম। তাঁর জীবিকা ছিল মিউজিয়ম দেখিয়ে পয়সা রোজগার। বার্নাম ১৮৩০-'৪০ নাগাদ নিছক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে একটি "হরে কর কমবা" জাতীয় সংগ্রহশালা খুলে বসেন। তাঁর সেই মিউজিয়ম দেখার দক্ষিণা সেই কালে এক ডলারে চারজন। সার্কাস পার্টিগুলি যে ভাবে high pressure barker ব্যবহার করে সশব্দে দর্শক ডাকত, বার্নাম সেই একই কায়দায় দর্শকদের ডাকতেন "দেখে যান একটি শুকরের ছ'টি পা, আর দেরী করলে মিউজিয়ম বন্ধ হয়ে যাবে।" অবশ্য 'এক শুয়োরের ছ'টি পা' জাতীয় জিনিস তখন অত্যুৎসাহী অনেক সংগ্রহশালাতেই রাখা হত। ১৮৫৫ সালে আমেরিকান অ্যাণ্টিকুয়োরিয়ান সোসাইটি দ্বিধাহীন চিত্তে মিউজিয়মে স্থান দিলেন এক মরা ধেড়ে শুয়োরের চোয়াল আর খড়্গ দন্ত। এরকম জঞ্জাল ও বাজে মাল তখনকার অনেক সংগ্রহশালায় দেখা যেত। অপর পক্ষে নামকরা গ্রন্থাগারিক Christopher Columbus Baldwin-এর মত পণ্ডিতেরা পুরোনো পোষাক, আসবাব, টুপি, জুতোকে বাজে পুরোনো জঞ্জাল বলতে দ্বিধা বোধ করতেন না। ও সবের যে কি ছাই ঐতিহাসিক বা গবেষণা মূল্য আছে তা তাঁরা বুঝতেন না। যাই হোক এই রকম নানান ঘটনা ও মানসিকতার টানা পোড়েনে ১৮৭৬ সালে আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধের শতবার্ষিকীতে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৭৮টি হিস্টরিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল এবং প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক সোসাইটির নিজস্ব সংগ্রহশালা স্থাপিত হল।

বিশাল আয়তনের জায়গা নিয়ে, হয় শহরের প্রাচীনতর অংশকে পুনঃসংস্কার করে, অথবা প্রাচীন গ্রাম্য ঘরবাড়ী, ছোট কারখানা, দোকান, যান-বাহন স্থানান্তরিত করে এনে, পর্যটক আকর্ষণকারী এক ধরনের অভিনব মুক্তাঙ্গন সংগ্রহশালা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে এই শতকে। এগুলিকে সজীব অতীতের সংগ্রহায়তন (Museum of the Living Past) বলা হয়ে থাকে। এগুলি বন্ধ ঘরে দেখা ইতিহাসের ত্রিমাত্রিক ও সচিত্র দেওয়াল বই (mural book of the past) নয়, যেমনটি আমরা ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন শিল্প সংক্রান্ত সংগ্রহশালায় দেখে থাকি। ভগ্ন বা জীর্ণ ঐতিহাসিক সৌধ নয়, যার সামনে দাঁড়িয়ে দর্শক ইতিহাসকে পিছন ফিরে দেখে। অতীতকে ঐ সব মুক্তাঙ্গন সংগ্রহায়তনে খোলা আকাশের নিচে সার্বিক নিজস্ব পরিবেশে প্রাণবন্ত করে

রাখা হয়। সেই পরিবেশের সবকিছুই কোন একটি কালকে, যেমনটি ছিল তেমনটি করে, ধরে রেখেছে। বর্তমানের দর্শক যেন সেই যুগের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে; সে সময়ের একজন কুশীলব বা পাত্র-পাত্রী হয়ে যায়। একটি ছোট্ট দ্বীপের স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ঘর বাড়ী প্রভৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য স্থাপিত হয় স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল সোসাইটির সংগ্রহশালা। দ্বীপটি নিউইয়র্ক শহরের অন্তর্গত হলেও এর ঘর, বাড়ী, রাস্তা-ঘাটে এখনও পুরোনো ধারাটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সোসাইটি প্রাচীন রীতির বাড়ীগুলির সংরক্ষণ করা ছাড়াও, দ্বীপের অন্তর্গত রিচমণ্ড টাউনের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবন-রূপটির স্থাপত্য ও বস্তুগত ধারাকে পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ যুগের মানুষ রিচমণ্ড টাউনে পা দিলে যাতে আমেরিকার বিগত দু শতকের বাস্তব পরিবেশে ফিরে যেতে পারে, এমন ভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে সেই মিউজিয়ম নগরী।

উইলিয়ামসবার্গ প্রাচীন শহরগুলির মধ্যে একটি। উইলিয়ামসবার্গে অষ্টাদশ শতকের বহু ঘর, বাড়ী, রাস্তা, খাট, ওয়ার হাউস, শপ প্রভৃতি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলেও একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। নগরীর পুরাতন অংশটি ক্রমশ পরিত্যক্ত হয় এবং অন্য প্রান্তে আধুনিক শহর গড়ে ওঠে। ১৯২৬ সালে জন ডি রকেফেলার (John D. Rockefeller) শহরের প্রাচীন অংশটির সংস্কার করাতে শুরু করেন এবং ক্রমশ পাঁচশটি গৃহ এবং আশি একর বাগিচার প্রাচীন রূপটিকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। শহরটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, কেননা ১৬৯২ সালে নগরটি স্থাপিত হয় এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের রাজত্বকালে ১৬৯৯ সালে জেমস টাউনের পরিবর্তে, উইলিয়ামসবার্গ ভার্জিনিয়ার রাজধানী হয়। নগরবাসীরা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে শহরের নাম রাখেন উইলিয়ামসবার্গ। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে রিচমণ্ডে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় উইলিয়ামসবার্গের অবক্ষয় শুরু হয়। কিন্তু বিপ্লব পূর্ব অষ্টাদশ শতকে উইলিয়ামসবার্গ ছিল সমস্ত আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ও ক্ষমতাবান রাজধানী ও নগর। পাঁচশ প্রাচীন গৃহ এখন ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে এবং সেগুলিতে পর্যটকেরা থাকতে পারেন অথবা দোকান পত্তর আছে। ছটি প্রদর্শনী বিল্ডিং ও বারটি কাজ চলছে এমন ওয়ার্ক-শপে দর্শকেরা দুশো বছর আগের উপনিবেশ নগরীর পরিবেশে ফিরে যেতে পারেন। এ ছাড়াও প্যারিস চার্চ, কলেজ ভবন এবং কোর্ট হাউস মিউজিয়মে গেলে প্রাচীনকে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অনুভব করা যায়।

গ্রীনফিল্ডের মুক্তাঙ্গন সংগ্রহশালার চরিত্র আরও লোকায়ত এবং পরিবেশ গ্রাম্য। উপনিবেশ কালের আমেরিকার খামার, ছোটখাট কারখানা, ঘরবাড়ী, দোকান-পত্তর, যান-বাহন, সেতু, এবং যন্ত্রযুগের প্রথম দিকের ছোট যন্ত্র চালিত কলকারখানা, নানান যন্ত্র, যন্ত্র-চালিত পরিবহন, ঘোড়ার গাড়ী, প্রখ্যাত যন্ত্র-বিজ্ঞানী ও কারিগরদের ওয়ার্কশপ, যন্ত্রপাতি, মডেল ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিশাল এলাকা জুড়ে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে সে সব সামগ্রী রাখা হয়েছে এই গ্রীনফিল্ড ভিলেজে। রকেফেলার

পরিবারের উদ্যমে যেমন উইলিয়ামসবার্গ মিউজিয়ম নগরী গড়ে ওঠে, তেমনি হেনরী ফোর্ডের উদ্যোগে তৈরী হয় এই গ্রীনফিল্ড ভিলেজ, গত দু শতকের গ্রাম সদৃশ মুক্তাঙ্গন সংগ্রহশালা।

ইলেক্ট্রা হ্যাভেমেয়ের ওয়েব নাম্নী এক ধনী-কন্যা এবং অভিজাত ঘরের বউ ,ভারমন্ট রাজ্যের শেলবার্ন নামক স্থানে, পঁয়তাল্লিশ একর জমির উপর এক বিচিত্র ধরনের মুক্তাঙ্গন সংগ্রহ-প্রাঙ্গণ গড়ে তুললেন, চল্লিশ বছর ধরে সংগ্রহ করা ভারমণ্ট ও নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলের লোক-জীবনের নানা উপকরণ দিয়ে। সেখানে আছে পঁয়ত্রিশটি পুরোনো বাড়ী, ১৭৩৩ সালের সল্ট বক্স হাউস থেকে শুরু করে ১৮৯০ সালে তৈরী শ্লেট পাথরের জেলখানা, বহু রকমের খামার-বাড়ী, পশুশালা, বীজঘর, ১৮৪০ সালে তৈরী গীর্জা, পুরোনো মুদি দোকান, কাঠ চেরাই কারখানা, অনন্য সাধারণ ঘোড়ার গাড়ীর সংগ্রহ, পুরোনো লেপ, কাঁথা, পুতুল, কম্বল, জাহাজ-নৌকোর অঙ্গসজ্জা ও মুখালংকার(figure heads), রেড ইণ্ডিয়ানদের চুরুট রাখার বাক্স ও থলে, টুপিরাখার বাক্স, হাতে আঁকা দেওয়ালে লাগানোর কাগজ, গ্রাম্য আসবাব পত্তর জাতীয় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক নানা সামগ্রী পর্যন্ত সব জিনিস, যার মধ্যে উচ্চকোটি চারুশিল্পের প্রভাব নেই, আছে সাধারণ মানুষের আন্তরিকতার ছোঁওয়া লাগা মোটা দাগের লোক কলা ও কারিগরী শিল্প। এই সব জিনিসগুলি, সে যুগে যে সব আনুষঙ্গিক উপকরণের সঙ্গে যে ভাবে সাজান থাকত, সেইভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে। এই সংগ্রহ প্রাঙ্গণে ঢোকার মুখে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একান্ন মিটার দীর্ঘ এক ঢাকা কাঠের সেতু যার উপর দিয়ে ১৮৪৫ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত ল্যাময়ল্লি (Lamoille) নদী পারাপার করত ভারমণ্ট-নিউ ইংল্যাণ্ডের মানুষ-জনেরা। এছাড়া লেক শ্যাম্লেন-এর একটি পাহাড়ের মাথায় ১৮৭১ সাল থেকে বসানো ছিল, এমন একটি উপকূল রক্ষী বাহিনীর বাতিঘর (light house), সেখান থেকে তুলে এনে পাঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বসানো হয়েছে শেলবার্নের এই মুক্তাঙ্গণ মিউজিয়মে। এ গুলির প্রদর্শনী ব্যবস্থার মধ্যে দর্শককে অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস নেই। যা আছে তা' হল, কালের অব্যাহত গতিতে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবার জন্য, যে সব জিনিস সরে যাচ্ছে, সে গুলি দেখে দর্শকেরা যাতে মমতা অনুভব করে, তেমন পরিবেশ। প্রাচীনে ফিরে যাওয়া নয়,প্রাচীন ফিরে আসে দর্শকের মধ্যে এই শেলবার্ন সংগ্রহ অঙ্গনে। পি· জি· উডহাউসের ভাষায় বলা যেতে পারে "তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়া"। প্রাচীনতার প্রহেলিকা যাতে সৃষ্ট না হয় সেই কারণে শেলবার্ন সংগ্রহ অঙ্গনে লাগান হয়েছে আধুনিক ফুলের গাছ, আরণ্যক ভারমণ্টের পরিবেশে সে যুগে যে প্রকৃতির প্রবেশ ছিল নির্বন্ধ। সে রকম আধুনিক প্রাকৃত পরিবেশে ক্রমশ বিলীয়মান সবে হারানো অতীত, সদ্য বিগত "আমেরিকানা" কে ধরে রাখা হয়েছে মিসেস ওয়েবের শেলবার্ন মুক্তাঙ্গনে। এখানে বলা প্রয়োজন যে মিসেস ওয়েবের পিতা মাতা দুজনেই ছিলেস মার্গীয় শিল্পের সমজদার এবং তাঁরা সংগ্রহ করতেন ইওরোপের খ্যাতিমান শিল্পীদের চিত্র ও ভাস্কর্য, রেম্ব্রাণ্ট

থেকে মনে (Monet), সকলের রচনাই, তাদের সংগ্রহে ছিল! এমন পিতামাতার মেয়ের চোখ পড়ল সাধারণ মানুষের সাধারণ জিনিসে।

১৯০৭ সাল। ইলেক্ট্রা হ্যাভমেয়ের তখন সবে কিশোরী। কনেকটিকাটের ছোট শহর স্ট্যানফোর্ডের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। চোখে পড়ল একটি রেড ইণ্ডিয়ান সিগার স্টোর। আর কথা নেই। পনের ডলার দাম দিয়ে কিনে আনলেন সেটি। তাঁর মা তো এই অতি সাধারণ অদ্ভুত দর্শন জিনিসটি দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "এটা আবার কি?" মেয়ে ইলেক্ট্রা উত্তর দিল "শিল্পকর্ম"। মা, লুইসাইন (Louisine), যাঁর স্বামী যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় চিনি কলের মালিক, সকন্যা যিনি বহুবার ইওরোপ গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ঘরে তুলেছেন ইওরোপের রেনেশাঁ ও ইম্প্রেশনিস্ট মাস্টার্সদের চিত্রকলা, মেয়ের শিল্প রুচি দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন "এটি যথার্থই ভয়াবহ"। তখনও তিনি জানতেন না যে তাঁর মেয়ে এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ আমেরিকান ট্র্যাস কিনে বাড়ী ভর্তি করে ফেলবে। পঁচিশ বছর বাদে আমেরিকার শিল্প রসিকেরা ইলেক্ট্রার সংগৃহীত জিনিসকে আর আমেরিকান ট্র্যাস বলতেন না, আদর করে বলতেন আমেরিকানা।

ওয়াল্টার এলিয়াস ডিসনি ও তার সৃষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পের মজাদার বিস্ময় মিকি-মাউসের জগৎজোড়া খ্যাতি। শিশুদের মনোরঞ্জনের জগৎটাকে ডিসনি দীর্ঘ তিনদশক ধরে স্বপ্নময় ফ্যাণ্টাসি দিয়ে ভরে দিয়েছিলেন, তাঁর নির্বাক, সবাক ও বর্ণময় কার্টুন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। ডিসনি মিকিমাউসের ফ্যাণ্টাসির বর্ণময় স্বপ্নের জগৎকে শুধু সেলুলয়েডের ফিতেয় বেঁধে রাখলে তাঁর কথা এখানে উঠত না। মুক্তাঙ্গন সংগ্রহশালার (?) এক নোতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন ওয়াল্ট ডিসনি, তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি ডিসনি-ল্যাণ্ড ও ডিসনি ওয়ার্ল্ডে, একটি লস এঞ্জেলসে, অন্যটি মিয়ামির কাছে অর্ল্যাণ্ডোতে। যারা দেখেছে ডিসনিল্যাণ্ড বা ডিসনিওয়ার্ল্ড তারা জানে এগুলি কি; যে দেখেনি তাকে বোঝান শক্ত সেখানে গেলে কি দেখা যায়। ছোট বড় সকলের আনন্দ, উত্তেজনা, আবেগ, অনুভূতি, কৌতুক, মজা, জানা না জানার স্বপ্নের বাস্তবতা, বাস্তবতার প্রহেলিকা, বিজ্ঞানের বোধ ও উপলব্ধি, ফ্যাণ্টাসি, রূপকথা, রোমাঞ্চকর রহস্য-তন্ময়তা নাটকীয় উত্তেজনা, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সব মিলিয়ে চাক্ষুষ ও অনুভব্য স্বপ্নের জগৎ। এই বিশাল (ডিসনি ওয়ার্ল্ডের আয়তন ৭৫ হেক্টর) জগতে নাটকীয়ভাবে যন্ত্রে প্রযোজিত অসংখ্য ট্যাব্লো, যে গুলির পাত্র পাত্রী জীব প্রতিম যন্ত্রমানব ও যান্ত্রিক পুতুল। এরা তখনই উপস্থিত, যে মুহূর্তে তাদের উপস্থিতি দর্শকের কল্পনার অতীত। সেগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে সদা অপ্রস্তুত দর্শকের সামনে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত। অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত অদ্ভূত কল্পনা, ভয়, ভীতি, রহস্য-রোমাঞ্চ, বাস্তব অবাস্তবে সীমারেখাহীন অবাধ মিশ্রণ, অকল্পনীয় যান্ত্রিক দক্ষতায় নাটক, চলচ্চিত্র, টেলিভিসনের জগত যেন সত্য হয়ে দর্শককে বাধ্যতামূলকভাবে অভিভূত করে। দর্শকেরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সে সব দৃশ্য ও ঘটনার 'সহিত' হয়ে পড়েন, কেননা তাঁদের সামনে সে মুহূর্তে অন্য কোনও কিছু হওয়ার বিকল্প থাকে না। মিকিমাউস, পিটার প্যান, ডুম্বো,

সিণ্ডারেলার দুর্গ, গেছো ডাইনী, কঙ্গো অভিযান, ক্যারেবিয়ান জলদস্যুদের ঘাঁটি, পরমাণুর ভেতরের জগৎ, রকেটে মহাকাশে ওঠা, অতীতের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ এবং আগামীকালের দিনগুলিতে বাধাহীন ভাবে চোখ,কান,মন খুলে ঘুরে বেড়ানর বিশ্বভূমি ডিসনিল্যাণ্ড ও ডিসনিওয়ার্ল্ড। প্রাজ্ঞ সংগ্রহশালাবিদরা একে সংগ্রহশালা বলতে আজও দ্বিধান্বিত। তবু সত্য যে, স্ক্যানসেন, উইলিয়ামসবার্গ, গ্রীনফিল্ড, রিচমণ্ড, শেলবার্ন, সাইন্সপার্ক এবং শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহাঙ্গন ও সংগ্রহশালার অত্যাধুনিক, যন্ত্র-পরিবেশিত, বিশালায়তন রূপান্তর ডিসনিল্যাণ্ড ও ওয়ার্ল্ড, অত্যুন্নত যন্ত্র-শিল্প ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের যুগোপযোগী জ্ঞান, আনন্দ ও আবেগানুভূতির জগৎ। এই শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে ওয়াল্ট ডিসনি যা গড়লেন, তা বোধ হয় ভবিষ্যতের সংগ্রহশালার রূপ ও চরিত্রের ইঙ্গিত।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সংগ্রহশালাগুলি মোটামুটি গত পঁচাত্তর বছরে গড়ে উঠলেও. এ জাতীয় সংগ্রহশালা স্থাপন শুরু হয় ১৭৫০ সাল থেকে, যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিদর্শন সংগ্রহ আরম্ভ করে। ১৮০২ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় যে খনিজ নিদর্শন সংগ্রহ আরম্ভ করে পরবর্ত্তীকালে সেই সংগ্রহ ভাণ্ডারে খাবার হলঘর ভরে যায়। সে সময় এই সংগ্রহকে বলা হত ক্যাবিনেট। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮০৫, পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৮০৮, উইলিয়ামস কলেজ ১৮১৬ এবং আমহার্স্ট কলেজ ১৮২৫-এ বিজ্ঞান বিষয়ক বস্তুর সংগ্রহ ভাণ্ডার তৈরীর কাজে হাত লাগায়। এরপর বিভিন্ন সমীক্ষা বিভাগ বা সার্ভে এই কাজ আরও ব্যাপকভাবে আরম্ভ করে এবং এ ব্যাপারে মিশিগান সমীক্ষা বিভাগ পুরোধা, ১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। আমহার্স্ট কলেজে প্রথম স্টুডেণ্টস ন্যাচার্যাল হিস্ট্রি সোসাইটি স্থাপিত হলে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ রকম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এর মধ্যে উইলিয়ামস কলেজের সোসাইটি সর্বাধিক শক্তিশালী এবং ১৮৩৫ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত খুবই সক্রিয় ছিল। আমহার্স্টে ১৮৪৬ সালে প্রাকৃত বস্তু নিদর্শনের অ্যাপলটন ক্যাবিনেট গড়ে ওঠে। ঐ শতকের পরবর্ত্তী অর্দ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান সংগ্রহশালা প্রসারের কাজ আরও দ্রুততর ও উন্নত হল। ১৮৫২ সালে হার্ভার্ডে মিউজিয়ম অফ কম্পারেটিভ জুলজি, তুলনামূলক প্রাণীবিদ্যার সংগ্রহশালা গড়া হয় এবং লুইস অগাস্সিজ, যাঁর কাছ থেকে হার্ভার্ড সংগ্রহ কেনা হয়, তিনি স্বয়ং কেম্ব্রিজে ঐ বিষয়ে বিশ্বখ্যাত একটি সংগ্রহশালা তৈরী করলেন। ষাটের দশকে হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্জ পিবডির দানে আমেরিকায় সংগ্রহশালার উন্নয়নে এনডাওমেণ্ট (এমন স্থায়ী আমানত যার সুদ খরচ করা যায়) প্রথার প্রবর্তন হল। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল মিউজিয়মের অর্থ সংস্থানের প্রধান উৎস ঐ এনডাওমেণ্ট। ইতিমধ্যে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় অর্দ্ধ থেকে চার্লস ডারউইনের জীবের ক্রমাভিব্যক্তি তত্ত্বের প্রভাবে, জীব বিজ্ঞানের সংগ্রহশালাগুলি, ঐ তত্ত্বকে বস্তু নিদর্শনের মাধ্যমে, চাক্ষুষ ও বোধগম্য করে তোলার দিকে নজর দিল এবং তদুপযোগী নিদর্শন সংগ্রহে ব্যাপৃত হওয়ায় এতদ বিষয়ে উদ্যম বাড়ল সকল উন্নত

দেশে। স্বাধীনতার শতবার্ষিকীতে (১৮৭৬) দেখা গেল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট তিয়াত্তরটি বিজ্ঞান সংগ্রহশালা রয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চারুকলা বিষয়ক সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার সূত্রপাত দেখা দেয় বিদ্যায়তন ভবনে প্রতিকৃতি চিত্র রাখার প্রথা থেকে। ১৮৩১-'৩২ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চিত্রবীথি স্থাপিত হল, ইয়েল'স ট্রুম্বুল আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠার ফলে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ঐ শতকের পঞ্চাশের দশকে শিল্প ইতিহাসের পঠন-পাঠনে সহায়ক ধ্রুপদী রীতির ভাস্কর্যের ছাঁচে তোলা নিদর্শনের একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলে। গত শতকের ষাটের দশকে হার্ভার্ড গ্রের এনগ্রেভিং শিল্প সংগ্রহটি গ্রহণ করে এবং ইয়েল পায় জার্ভিসের প্রিমিটিভ ইতালীয় শিল্প-সংগ্রহ। সত্তরের দশকে নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ম সহ আরও কয়েকটি শিল্পকলার সাধারণ সংগ্রহালয় গড়ে ওঠায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিল্প সচেতনতা বাড়ায় ওয়েলেসলি কলেজ, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্মিথ কলেজে শিল্প সংগ্রহের প্রদর্শনীর জন্য উপযুক্ত ভবন নির্মিত হল। হার্ভার্ড ১৮৯৫ সালে উইলিয়ম হেইস ফগসের দান তাঁর নামে ফগ আর্ট মিউজিয়ম স্থাপনের কাজে লাগায়। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে পিবডি মিউজিয়ম অফ আর্কিওলজি এণ্ড এথনোলজি। বর্তমানে ইউনিভারসিটি মিউজিয়মের ক্ষেত্রে বিশ্বে সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা সংগঠন রয়েছে হার্ভার্ডে। শুধু তাই নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্ব বিদ্যালয়-সংগ্রহশালা যেমন হার্ভার্ডে প্রথম স্থাপিত হল তেমনি কলা বিষয়ে সে দেশের প্রাচীনতম সংগ্রহশালা "হার্ভার্ড মিউজিয়ম রুম", ১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত, আমেরিকার প্রাচীনতম সংগ্রহশালা। ইংল্যাণ্ডে যেমন আধুনিক সংগ্রহশালার উদ্ভব হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসমোলিয়ান মিউজিয়ম স্থাপনায় (১৬৮৩); আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তেমনি প্রথম সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হল হার্ভার্ডে। সেই প্রাচীন গ্রীক আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়মকে কেন্দ্রকরে গড়ে উঠেছিল উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে। খৃঃ ষোড়শ শতকে ইংল্যাণ্ডে এবং সপ্তদশ শতকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন-গবেষণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠল ইউনিভারসিটি মিউজিয়ম। শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রহশালার যুক্তি সঙ্গত সংযোগ ঘটে চলেছে, কেননা একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক। সংস্কৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কিত বস্তুগত তথ্য ও নিদর্শনের অমূল্য ভাণ্ডার সংগ্রহশালা। তাই কোন জ্ঞান চর্চাই মূল তথ্য ভাণ্ডারকে বাদ দিয়ে বেশি দূর এগোতে পারে না। ফলে আধুনিক সংগ্রহশালা ধারণায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগ্রহশালা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সকল শহরেই ছোট ও বড় কয়েক হাজার শিল্প ও পুরাবস্তু সংগ্রহশালা আছে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন সোসাইটি ও একাডেমিতে পিকচার গ্যালারী থাকত। হিস্টরিক্যাল সোসাইটি এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ ভাণ্ডার ও সংগ্রহশালায় চিত্র ও ভাস্কর্যের সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল। এ রকম একটি আর্ট একাডেমি Boston Athenaeum ১৮০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই

সংস্থার গ্রন্থাগারে চিত্র বীথি রাখা হত। নিউইয়র্ক শহরে যে একাডেমি অফ ডিজাইন সংস্থাটি ১৮২৫ সালে স্থাপিত হল তার অন্যতম স্থাপক ও প্রথম সভাপতি ছিলেন স্যামুয়েল এফ. বি মোর্স (১৭৯১-১৮৭২), তারবার্তা প্রেরণ পদ্ধতির আবিষ্কারক। সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি যে একজন ভাল প্রতিকৃতি চিত্র শিল্পী ছিলেন এ তথ্য হয়ত অনেকের জানা নেই। একাডেমির কথা যখন উঠল তখন জানিয়ে রাখি একাডেমির উদ্ভব হয় প্রাচীন গ্রীসে, এথেন্সে। এথেন্স নগরীর কাছে যে চিত্ত বিনোদক তরুকুঞ্জে খৃঃপূঃ চতুর্থ শতকে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন তাকে বলা হত একাডেমি, ভারতীয় সংস্কৃতির তপোবন আর কি। নিউইয়র্কে কুপার ইউনিয়ন (Cooper Union) নামে চারুশিল্প ও যন্ত্র বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি সংস্থা স্থাপন করেন সে যুগের বিখ্যাত শিল্পপতি পিটার কুপার (১৭৮১-১৮৮৩) ১৮৫৯ সালে। ইনিই সেই কুপার, যিনি প্রথম ইউ. এস রেল রোড লোকোমোটিভ এবং সমসাময়িক মোর্স আবিষ্কৃত তারবার্তা বা টেলিগ্রাফ প্রেরণ সংস্থা গড়ে তুলতে অর্থলগ্নী করেন। কুপার ইউনিয়নের সংগ্রহশালাটি কিন্তু পিটার কুপারের মৃত্যুর পর তাঁর দশ হাজার স্থাপত্য ও অলংকরণ নক্সা, মধ্যযুগীয় বস্ত্র, সপ্তদশ শতকের মঞ্চ সজ্জা প্রভৃতি দুর্লভ নিদর্শন গুলিকে ভিত্তি করে ১৮৯০ সালে স্থাপিত হয় এবং ১৮৯৭ সালে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। আমেরিকান একাডেমি অফ আর্টস এন্ড পেন্টার্স-এর মিউজিয়ম স্থাপিত হয় ১৯০৪ সালে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বহু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ইওরোপ থেকে নামী, দামী দুর্লভ শিল্প ও পুরাবস্তু সংগ্রহে উৎসাহী হন এবং তাঁরা নিজ নিজ আর্ট কালেকশন গড়ে তোলেন। সেগুলি ছিল তাদের অর্থলগ্নীর পণ্য, সাথে সাথে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের উপায়, আত্ম-তৃপ্তি সাধন ও অবসর বিনোদনের মাধ্যম। বিভিন্ন আর্ট মিউজিয়মের সংগ্রহকে পরিপুষ্ট করে তুলতে এঁদের শিল্প নিদর্শন দান ও এনডাওমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। ঐ দেশের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যয় নির্বাহে ধনী শিল্পপতি. ব্যবসায়ী ও বিত্তবান মধ্যবিত্তের অবদান সরকারী ও পৌরসভার অনুদানের চেয়ে অনেক বেশি। ভূ-স্বামী নয়, পুঁজিপতিরা সে দেশে সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। ইংল্যান্ডে সরকার, রাশিয়ায় রাষ্ট্র এবং জার্মানীতে পৌর সভা মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টির জন্য অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। শুরুতে জার্মানীতে ভূ-স্বামীগণ ও ইংল্যান্ডে ভূ-স্বামী, বণিক ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ভূমিকা নগণ্য ছিল না।

রাজধানী ওয়াশিংটনের এক বিশাল সংগ্রহশালা গুচ্ছ (Museum Complex) আমেরিকার জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ খনিজধাতু-বিদ জেমস স্মিথসন (১৭৬৫-১৮২৯) আর্ল অফ নর্দাম্বারল্যান্ডের অবৈধ সন্তান হওয়ায় রাজ সম্মানের উত্তরাধিকারী হননি। অপমানিত স্মিথসন, ফলে, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, এক লক্ষ পাউন্ড দান করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে এ নিয়ে বাদানুবাদ হল। সেনেটর জন কলহুণ বললেন : "কারও কাছ থেকে এ রকম উপহার নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের

অসম্মান"। ইতিমধ্যে ১৮৩৮ সালে একশ' পনেরটি ব্যাগ ভর্তি হয়ে ঐ টাকা পৌঁছে গেল। অবশেষে আইন করে ১৮৪৬ সালে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন সংস্থাটি গড়ে তোলা হল। আজ সেই প্রতিষ্ঠান শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আমেরিকার বৃহত্তম, বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত, গবেষণা, প্রকাশনা ও সংগ্রহশালা সংস্থা। ন্যাশনাল কালেকশন অফ ফাইন আর্টস এই সংস্থার একটি অঙ্গ। এই ইনস্টিটিউশনের অধীন বিখ্যাত প্রাচ্য শিল্প সংগ্রহ ফ্রিয়ার গ্যালারীর মূল সংগ্রহ চার্লস ল্যাড ফ্রিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত। ফ্রিয়ার চুয়াল্লিশ বছর বয়সে পেনিনসুলার বেলরোড্ কার ওয়ার্ক্সের কাজে ইস্তফা দিয়ে প্রাচ্য দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সেই ভ্রমণ তাঁর পূর্বে কৃত প্রাচ্য শিল্প সংগ্রহকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলল। তাঁব দানপত্রে সর্ত লেখা হল যে তাঁর অর্থ দিয়ে যে মিউজিযম গড়া হবে, সেই সংগ্রহশালা কোনও বস্তু ঋণ দিতে বা গ্রহণ করতে পারবে না। এ ছাড়া তাব দেওয়া অর্থে একমাত্র উৎকৃষ্টমানের প্রাচ্য শিল্পবস্তু কেনা যাবে এবং যে সব দেশেব শিল্প থাকবে শুধুমাত্র সেই সব দেশের সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করা যাবে। স্মিথসোনিয়ান ইসন্স্টিটিউশনের মত সংগ্রহালয়, বহুমুখী শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের খরচে চালান হয় বলে, ওয়াশিংটনে অবস্থিত এই ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানটিকে আমেরিকা-বাসীরা ব্যঙ্গ করে বলে, "U S. Government's attic", যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ছাদের তলার ঘর। ওয়াশিংটনের এক নামকরা ব্যাংক ব্যবসায়ী উইলিয়ম উইলসন করকোরান গত শতকের মধ্যভাগে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মেক্সিকোর যে যুদ্ধ হয়, তাব সকল খরচ সরকারকে ঋণ দেন, এতই তাঁর টাকা। আমেরিকান আর্টের উৎসাহী সংগ্রাহক ছিলেন তিনি এবং তাঁর সংগ্রহ ১৮৭১ সালে করকোরান গ্যালারী অফ আর্ট নামক সংগ্রহশালায় পরিণত হল। সেই মিউজিয়মেব উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমরোহে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট (১৮৬৯-১৮৭৭) ইউলিসিস সিম্পসন গ্রাণ্ট ও তাঁর স্ত্রী। ফ্রেডরিখ ডগলাস আমেরিকান সিভিল রাইট আন্দোলনের জনক। ওয়াশিংটনে অবস্থিত তাঁর গৃহে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মিউজিয়ম অফ আফ্রিকান আর্ট। লিংকন মেমোরিয়াল ও জেফারসন মেমোরিবাল ওয়াশিংটনে অবস্থিত দুটি জীবনী ও স্মারক সৌধ সংগ্রহশালা।

নিউইয়র্ক আমেরিকার বৃহত্তম ও প্রধান বাণিজ্যিক শহর। এখানে বহু শিল্প সংগ্রহশালা, গ্যালারী, ব্যক্তিগত কালেকশন ও আর্ট ডিলারদের গ্যালারী আছে। আমেরিকার বৃহত্তম শিল্প ও প্রত্ন-বিষয়ক সংগ্রহশালা মেট্রোপলিটন মিউজিয়ম অফ আর্ট ১৮৭০ সালে জন জে নামক একজন আইনজীবী ও রিপাবলিক্যান পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে স্থাপিত হয়। পিয়ের পণ্ট মরগ্যান (পুত্র), জুনিয়ার জন ডি. রকেফেলার প্রভৃতি শিল্পপতির বদান্যতায় এবং সিটি অফ্ নিউইয়র্কের (পৌর-প্রশাসন) অনুদানে মেট্রোপলিটন মিউজিয়মের সর্বদেশীয় সংগ্রহ ও বিশাল ভবনের আয়তন ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এখন (১৯৫৪) সেখানে পঁচানব্বইটি গ্যালারীতে রিজার্ভসহ দশলক্ষ শিল্প, পুরা ও প্রত্ন সম্বন্ধীয় নিদর্শন আছে। পিয়ের পণ্ট মরগ্যান

পিতা (১৮৩৭-১৯১৩) ও পুত্র (১৮৬৭-১৯৪৩) দুজনেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক, রেলওয়ে, শিপিং, ইস্পাত কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মালিক। দুজনেই বই, পুঁথি, চিত্র প্রভৃতি বস্তুর সংগ্রহে উৎসাহী ছিলেন এবং বিভিন্ন সংগ্রহশালা গঠন ও পুষ্টির জন্য অর্থ ও শিল্প নিদর্শন দান করেন। মরগ্যান পরিবারের পুস্তক, পুঁথি, চিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ নিয়ে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পিয়ের পণ্ট মরগ্যান লাইব্রেরী। ঊনবিংশ শতকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রেলরোড ব্যবসার প্রধান পুরুষ কর্ণেলিয়াস হুইটনের (Whitney) নাতনির নাতনি শিল্পবেত্তা গার্টুড হুইটনে আমেরিকান আধুনিক চিত্র ও ভাস্কর্যের সংগ্রহে সমৃদ্ধ হুইটনে মিউজিয়ম অফ্ আমেরিকান আর্ট গড়েন। হেনরী ক্লেফ্রিক তাঁর ঠাকুর্দার মদের কারখানার কেরানী হিসাবে জীবন শুরু করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলেন কোক ওভেন। সেই শিল্প তাঁকে কোটিপতি করে। ব্যবসায় যতই ব্যস্ত থাকুন, বই পড়া ও চিত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি আজীবন উৎসাহী ছিলেন। তাঁর সংগৃহীত চিত্র থেকে গড়ে ওঠে পাশ্চাত্য চিত্রের সংগ্রহশালা ফ্রিক কালেকশন। ব্যাঙ্কের ঋণ অনুমোদনের তদন্তকারী অফিসার তাঁর সম্বন্ধে মজার মন্তব্য লেখেন, "সারাদিন কাজ করেন, সন্ধ্যেটুকু বই নিয়ে কাটে, ছবি সম্বন্ধে হয়ত বা একটু বেশী উৎসাহী, কিন্তু ক্ষতিকারক কিছু নয়......ঋণ অনুমোদনের পরামর্শ দিচ্ছি।"

উপরোক্ত শিল্প সংগ্রহশালাগুলি ছাড়াও নিউইয়র্কে বহু শিল্প, প্রত্নবস্তু ও পুঁথি পত্রের মিউজিয়ম, গ্যালারী ও গ্রন্থাগার আছে যেমন—ব্রুকলিন মিউজিয়ম (সঙ্গে আর্ট স্কুল); কুপার ইউনিয়ন মিউজিয়ম ফর দি আর্টস অফ্ ডেকরেশন, ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত আলংকারিক শিল্পের সংগ্রহশালা ; হিস্পানিক সোসাইটি অফ্ আমেরিকা, স্প্যানিস শিল্প ও সংস্কৃতির সংগ্রহশালা, স্পেন সম্বন্ধীয় পন্ডিত আর্চার হাণ্টিংটন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ; ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ম অফ্ মডার্ন আর্ট, আধুনিক চিত্র ও ভাস্কর্যের এমন একটি সংগ্রহশালা, যেখানে আধুনিকতম শিল্পীরাও উপেক্ষিত নন। বিশ্বের তিরিশটি দেশের সহস্রাধিক উচ্চমানের চিত্র ও ভাস্কর্য এখানে আছে। ১৯৩৭ সালে বিত্তবান শিল্পপতি ও সংগ্রাহক সলোমন আর. গগেনহাইম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের ব্যয়ে বিশ শতকের চিত্র শিল্পের এক অসাধারণ সংগ্রহ-ভবন গগেনহাইম মিউজিয়ম। সংগ্রহশালার নোতুন ভবনের গঠন বৈশিষ্ট্য দর্শনীয়। গগেনহাইম মিউজিয়মে উপরের তল থেকে ক্রমশ ঢালু পথ ধরে দুপাশে ছবি দেখতে দেখতে নীচে নেমে আসতে হয়, তখন মনে হয় চিত্রগুলি যেন শূন্যে ভেসে আছে এবং দর্শক অনায়াস ও অবাধ পদচারণায় সেগুলি দেখতে পান।

ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে হেনরি ই. হাণ্টিংটন লাইব্রেরী এন্ড আর্ট গ্যালারী, সংক্ষেপে হান্টিংটন মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাতা হেনরী হান্টিংটন, যিনি একাধারে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, শিল্পরসিক ও বইয়ের পোকা। তিনি বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পুস্তক যেমন সংগ্রহ করতেন তেমনি বই পড়তেন। ছবি কেনার নেশা ছিল এবং সেকথা ভালভাবেই

জানতেন সে যুগের ধুরন্ধর আর্ট এজেণ্ট দুভিন। দুভিনই তাঁকে ইংরেজ শিল্পী গেইনস্‌বরোর রচনার একটি অতি উৎকৃষ্ট চিত্র সংগ্রহ গড়ে দেন। তিনিই হান্টিংটনকে কিনিয়ে দেন বিখ্যাত আমস্টারডাম কালেকশন অফ্‌ ব্রিটিশ বুক্‌স। সেইসময় ইংল্যান্ডে সম্পদ কর ও মৃত্যু কর আরোপ করার ফলে শিল্প, পুরাবস্তু ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিক্রীর হিড়িক পড়ে যায় এবং সেই ডামাডোলের বাজার থেকে দুভিনের সহযোগিতায় তিনি ইংলিশ আর্ট ও গ্রন্থের একটি ভাল সংগ্রহ গড়ে তোলেন। কাকা রেলরোড ব্যবসায়ী কলিসের (Collis) পশ্চিমাঞ্চলের কারবার হান্টিংটন দেখাশোনা করতেন এবং বিধবা কাকীমা আরাবেলাকে বিবাহ করে অগাধ সম্পত্তির মালিক হন। মেট্রোপলিটন মিউজিয়মের প্রাইজ কালেকশন আরিস্টোটল কনটেমপ্লেটিং দি বাস্ট অফ হোমর চিত্রটি আরাবেলার সংগ্রহ থেকে কেনা।

লস এঞ্জেলস্‌ হিস্ট্রি, সাইন্স এন্ড আর্টস একটি বহুমুখী সংগ্রহশালা হিসাবে ১৯১১ সালে গড়া হয় এবং ১৯40 সালে নব নির্মিত ভবনে কলা বিভাগটি স্থানান্তরিত করা হয়। সানফ্রান্সিসকোর এম এইচ দ্য ইয়ং মেমোরিয়াল মিউজিয়ম ১৮৯৫ সালে অনুষ্ঠিত ক্যালিফোর্ণিয়া মিড-উইন্টার এক্সপোজিসনে যে জাপানী টি হাউস তৈরী হয়, সেটি কিনে ক্রনিক্‌ল্‌ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক তাঁর ভাই ও তাঁদের কিছু বন্ধু-বান্ধব এই সংগ্রহশালাটি গড়ে তোলেন। এর প্রাথমিক সংগ্রহটিও ঐ এক্সপোজিসন থেকে কেনা, দশ হাজার ডলারে আশি হাজার জিনিস। ১৯১৫ সালে অনুষ্ঠিত এক মেলাকে ভিত্তি করে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সান দিয়েগো শহরে ফাইন আর্ট গ্যালারী অফ সান দিয়েগো স্থাপিত হয় ১৯২৬ সালে। ঐ শহরের মিউজিয়ম অফ ম্যান একটি অভিনব প্রত্ন-বিষয়ক সংগ্রহশালা। ডেনভার শহরে ডেনভার আর্ট মিউজিয়ম ১৮৯৩ সালে আর্টিস্ট ক্লাব অফ ডেনভার নামে স্থাপিত হয় এবং কালক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিমের বৃহত্তম শিল্প, পুরা ও প্রত্ন সংগ্রহালয় হয়ে উঠে। এখানে সকল যুগের কিছু না কিছু শিল্প নিদর্শন আছে। ১৯৭১ সালে নির্মিত একটি বিরাট অট্টালিকায় সংগ্রহশালাটি স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

উত্তর মধ্যাঞ্চলে ওহিয়োর টলেডোতে ১৯০১ সালে এডওয়ার্ড ড্রুমণ্ড লিবে (Libbey) নামক ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং শহরের কিছু নাগরিকের চেষ্টা ও দানে স্থাপিত হল টলেডো মিউজিয়ম অফ আর্ট। মূলত সস্ত্রীক লিবে অর্থানুকূল্য ও পারিবারিক সংগ্রহ দিয়ে সংগ্রহশালাটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়ম অফ আর্ট গড়ে তোলার সূত্রপাত ঘটে, যখন জেপ্থা এইচ. ওয়েড নামক এক অতি ধনী ও শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ওয়েড পার্ক নামে একটি বিশাল ও মনোরম পার্ক চারুশিল্প সংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্য ১৮৮২ সালে দান করে যান। ঐ দশকে জন হান্টিংটনের বদান্যতায় গড়ে উঠল তাঁর নামে আর্ট এণ্ড পলিটেকনিক সংস্থা এবং হোরেস কেলে নামক আর এক ব্যক্তি নিজ অর্থে একটি আর্ট ফাউণ্ডেশন গড়ে তুললেন। মোটামুটি একই উদ্দেশ্যে গঠিত তিনটি সংস্থার কথা জানাজানি হল ১৯১৩ সালে এবং তাদের সংযুক্ত প্রচেষ্টায় ১৯১৬ সালে ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়াম অফ আর্টের দ্বারোদ্ঘাটন হল। বহু লোকের

পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংগ্রহশালাটি আমেরিকার অন্যতম চারুশিল্প সংগ্রহশালা হয়ে উঠেছে। মিশিগানের ডেট্রয়েট Plymouth, Cadilac, Chrysler, De Soto, Dodge, Ford, Mecury, Pontiac মোটর তৈরীর বিশাল বিশাল কারখানার শহর, সেকেণ্ডে পাঁচ-সাতখানা গাড়ী সে শহরে তৈরী হচ্ছে। এমন একটি যন্ত্রদানব ও যান্ত্রিক মানবের শহরে শিল্পচর্চা? ১৮৮৯ সালে শহরের এক পত্রিকা সম্পাদক লিখলেন যে বোস্টন, নিউইয়র্ক ও চিকাগোর মত ডেট্রয়েট কোনও দিন বাণিজ্য ও যন্ত্র শিল্পে গর্ব করার মত শহর হবে না. তবে এথেন্স. ফ্লোরেন্স বা মিউনিখের মত চারু শিল্পের নগর হতে বাধা কোথায়? এ কথার সাত বছরের মধ্যে তৈরী হল শহরের প্রথম মোটর গাড়ী। ফোর্ড, উইন্টন, ল্যানসিং প্রভৃতি ১৮৯৬ সালে যে মোটর কারখানা গড়ে তুললেন, তাই এখন ডেট্রয়েটের পরিচয়। সে যাইহোক, ১৮৮৩ সালে ডেট্রয়েটের বাড়ী বাড়ী থেকে প্রায় পাঁচ হাজার শিল্প সামগ্রী যোগাড় করে একটি চারু শিল্প মেলা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হল ঐ শহরের আর্ট মিউজিয়ম গড়ে তোলার ইতিহাস। ঐ মেলার উৎসাহে সেনেটর টমাস পামার ও আরও চল্লিশ জন ব্যক্তির দানে ১৮৮৫-৮৮ তে নির্মিত হল একটি আর্ট মিউজিয়ম ভবন এবং ইতিমধ্যে গড়ে উঠল ডেট্রয়েট ইনস্টিটিউট অফ আর্ট. ১৮৮৫ সালে। পৌর-সভা সংগ্রহশালার ব্যয় নির্বাহে এগিয়ে আসতে একজন করদাতা আদালতে মামলা করেন এবং মিশিগান সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হল নাগরিকদের করের টাকা ও ভাবে খরচ করা যায় না (১৯১৫)। অবশ্য পরবর্তী কালে পৌরসভা এই ইনস্টিটিউট পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ইনস্টিটিউটের ন্যাস মণ্ডলীর ভূমিকা এক্ষেত্রে পরামর্শদাতার এবং সংগ্রহ পুষ্ট হয় ব্যক্তিগত দানের টাকায়। ফলে এই মিউজিয়মের গঠন চরিত্র হল পৌরসভা, ন্যাসমণ্ডলী ও সাধারণের যুক্ত সংস্থা. যা আমেরিকার অন্য কোথাও নেই।

দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলে মিশৌরী রাজ্যে কানসাস নগরীতে নেলসন গ্যালারী অফ আর্ট এবং অ্যাটকিনসন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস সংযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ শিল্প সংগ্রহশালা। ১৯১১ সালে ম্যারি অ্যাটকিনসন তাঁর বিশাল ভূ-সম্পত্তি দান করে গেলেন কানসাসে একটি শিল্প সংগ্রহালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে। চার বছর বাদে উইলিয়াম বকহিল নেলসন একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করলেন, যার কাজ হবে সব রকমের শিল্প বস্তু সংগ্রহ করা। পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী হুস্টন নেলসন ও তাদের মেয়ে জামাই নেলসনের 'ওক হল' বসত ভবনটি দান করলেন সংগৃহীত বস্তু রক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য। মোটামুটি সম-উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত শহরের অন্যান্য ট্রাস্টকে নিয়ে পরবর্ত্তীকালে সংযুক্ত প্রচেষ্টায় আরও একটি নোতুন ভবন নির্মাণ করে ১৯৩৩ সালে ঐ যৌথ সংগ্রহশালা সাধারণের জন্য উম্ঘাটিত হয়। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আলাবামারাজ্যে বার্মিংহাম ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রোৎপাদন এবং যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের বড় এবং পুরনো ঘাঁটি। সেখানেও রয়েছে ১৯০৮ সালে স্থাপিত বার্মিংহাম আর্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ শিল্প সংগ্রহশালা, বার্মিংহাম মিউজিয়াম অফ আর্ট, যেখানে আছে বিশ্ববিখ্যাত

Kress কালেকসনের চিত্র সম্ভার এবং লোহার ঢালাই কাজের অসাধারণ আলংকারিক নিদর্শন সমূহ।

পিটসবার্গ অন্যতম ইস্পাত নগরী। শিল্প শিল্পপতি অ্যাণ্ড্রু কার্ণেগীর (১৮৩৫-১৯১৯) ভাগ্যোন্মেষ হয় এখানে। সপ্তাহে এক ডলার মাইনের চাকরী থেকে তিনি বিশাল লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সাম্রাজ্যের মালিক হন। ফলে কার্ণেগী ট্রাস্টের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠল কার্ণেগী লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম। মিউজিয়মটি গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান সংগ্রহশালা হলেও সেখানে প্রতিবৎসর বিভিন্ন শিল্পী ও শিল্প-রীতির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পিটসবার্গের কাছে ফিলাডেলফিয়াতে স্বাধীনতা যুদ্ধের শতবার্ষিকী উপলক্ষে, ১৮৭৬ সালে, যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তার থেকে শেষে জন্ম নিল মিউজিয়ম অফ আর্ট, যার শিল্পসংগ্রহের খ্যাতি আছে। ১৯২৯ সালে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসী ভাস্কর শিল্পী রঁদ্যার রচনা সমৃদ্ধ, রঁদ্যা মিউজিয়ম, ঐ শহরের গর্বের প্রতিষ্ঠান।

পিটসবার্গে যেমন কার্ণেগীর শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কলা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেই রকম চিকাগোর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির পিছনে আছেন পেট্রোলিয়াম শিল্পের প্রধান শিল্পপতি (Oil tycoon) পিতা-পুত্র জন ডেভিসন রকেফেলার (১৮৩৯—১৯৩৭ এবং ১৮৭৪)। তাঁদের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয় আর্ট ইনস্টিটিউট অফ চিকাগো। এই সংস্থা একটি বিশাল চারুকলা ও প্রত্ন বিষয়ক সংগ্রহশালাই শুধু চালায় না, সঙ্গে চলে শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা। প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার জন্য এখানে স্থাপিত হয়েছে ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট অফ চিকাগো। বিশালায়তন বিজ্ঞান ও যন্ত্র-শিল্প সংগ্রহশালা ছাড়াও চিকাগোতে আছে বিশ্ব বিখ্যাত মীনাগার জে জি. শেড (Shed) অ্যাকোয়ারিয়াম (১৯২৪-৩০), অ্যাডলার প্ল্যানেটেরিয়াম এণ্ড অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল মিউজিয়ম, মার্শাল ফিল্ড মিউজিয়াম এবং চিকাগো ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ম যেখানে নৃ-তত্ত্ব, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব ও প্রাণীবিদ্যার প্রভূত নিদর্শন রয়েছে। বহু প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ক সংগ্রহশালা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আছে। তবে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতি-বিজ্ঞান মিউজিয়ম এবং নিউইয়র্ক শহরের আমেরিকান মিউজিয়ম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শনী, গবেষণা ও প্রকাশনা বিশ্ববিখ্যাত। শেষের সংগ্রহশালাটি এ বিষয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। এখানে হেডেন (Heyden) প্ল্যানেটেরিয়াম একটি বিখ্যাত তারামণ্ডল।

ন্যাচার‍্যাল হিস্ট্রি মিউজিয়মের কথা যখন উঠল তখন আবার ফিরে আসি ইংল্যাণ্ডে, যেখানে ১৭৫৩-'৫৭ সালে প্রথম স্থাপিত হয় সাধারণ সংগ্রহশালা, ব্রিটিশ মিউজিয়ম, স্যার হেনরী স্লোনের নানা বিষয়ক সংগ্রহ থেকে যা' গড়ে ওঠে। ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার শতাধিক বছর পরে ঐ মিউজিয়মের প্রকৃতি-বিজ্ঞান-বিষয়ক সকল নিদর্শন অন্য একটি ভবনে সরিয়ে আনা হল এবং ১৮৮০ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়মের অধীনে ন্যাচার‍্যাল হিস্ট্রি বিভাগ খোলা হয়। ১৯৬৩ সাল অর্থাৎ প্রায় আরও একশ

বছর পরে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে ঐ বিভাগটিকে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ম নামে পৃথক একটি সংগ্রহশালা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

ইংল্যান্ডের সংগ্রহশালার উনবিংশ শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সে দেশে ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংগ্রহালয়গুলি গড়ে উঠেছে। ভিক্টোরিয়া যুগের রুচিবোধ, ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্যের স্থিতি হয়ত এর মূল কারণ।

১৮৫১ সালে কৃষ্টাল প্যালেসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিল্প ও কলা প্রদর্শনী থেকে লন্ডনের সাইন্স মিউজিয়ম গড়ে ওঠে। একই কারণে মার্লবরো হাউসে স্থাপিত হল মিউজিয়ম অফ ম্যানুফ্যাকচারার্স, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের জনক, ১৮৫২ সালে। নাম পরিবর্তিত হয়ে হল প্রথমে আর্ট মিউজিয়ম, কিছুকাল পরে মিউজিয়ম অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট। ১৮৫৭ সালে সংগ্রহশালাটি সাউথ কেনসিংটনে স্থানান্তরিত হলে নাম হল সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ম। ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত এই প্রাচ্য দেশীয় শিল্প নিদর্শনের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকল ব্রিটিশ শৈলীব চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, শিল্প-সামগ্রী, খাদ্য ও পশুখাদ্য দ্রব্য, পেটেণ্ট করা যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি যন্ত্র প্রভৃতি। ফলে মিউজিয়মে স্থানাভাব দেখা দিল এবং ১৮৯৯ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া নোতুন ভবনেব ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন এবং তাঁর নির্দ্দেশে এই সংগ্রহশালার নাম ভিক্টোরিয়া এণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ম হবে বলে সিদ্ধান্ত হল। অবশেষে যুবরাজ অ্যালবার্ট সপ্তম এডওয়ার্ড নাম নিয়ে সম্রাট হবার পর ১৯০৯ সালে মিউজিয়মের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। এখন সেখানে শুধুমাত্র চারু ও কারু শিল্পের সামগ্রীগুলি রাখা হয়েছে। অন্যান্য নিদর্শন অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

স্যার ফ্রান্সিস চ্যাণ্টে ব্রিটিশ শিল্প কলার জাতীয় সংগ্রহশালা গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে ১৮৪১ সালে রয়্যাল একাডেমিতে তার সকল সম্পদ দান করে দেন। পরবর্ত্তী অর্দ্ধ শতক ধরে অনেকেই ঐ উদ্দেশ্যে অর্থ ও শিল্পবস্তু দান করলেন এবং পরিশেষে হেনরী টেট নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আশি হাজার পাউণ্ড খরচ করে ঐ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে এলেন। ১৮৯৭ সালে প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্‌স টেট গ্যালারী নামে ঐ মিউজিয়মের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৯১৯ সালে লর্ড কার্জনের সুপারিশ অনুসারে টেট গ্যালারী ব্রিটিশ আর্টের ন্যাশন্যাল গ্যালারী হিসাবে ঘোষিত হল এবং ট্রাফালগার স্কোয়ারের জাতীয় শিল্প সংগ্রহালয় থেকে দুশ চিত্র টেট গ্যালারীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্যার হুগ লেন, স্যার জোশেফ দুভিন (ইয়ংগার), স্যামুয়েল কোর্টল্যাণ্ড (যিনি একা পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দেন) প্রভৃতি ব্যক্তির দানে টেট গ্যালারীতে অনন্য পাশ্চাত্য চিত্রের সংগ্রহ গড়ে উঠল। এখন অবশ্য তার অধিকাংশ ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারীতে রাখা হয়েছে। টেট গ্যালারীতে উনিশ শ' ব্রিটিশ চিত্র, এবং কিছু পঞ্চদশ শতকের ব্রিটিশ ভাস্কর্য্য-নিদর্শন আছে। ট্রাফালগার স্কোয়ারে অবস্থিত ন্যাশানাল গ্যালারী জে জে. অগার-স্টেইনের (Augerstein) পাশ্চাত্য রীতির চিত্র সম্ভার কিনে ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয়।

ওল্ড মাস্টার্সদের এই সুন্দর চিত্র সম্পদ যা একমাত্র ফ্রান্সের লুভর মিউজিয়মের সংগ্রহের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে তা, ১৮৩৮ সালে স্থায়ী ভাবে ঐ ট্রাভালগার স্কোয়ারের ভবনে রাখা হয়। বর্তমানে চৌত্রিশ খানা ঘরে ছ হাজার বর্গ গজ এলাকা জুড়ে ঐ ক্রমবর্ধমান চিত্র সংগ্রহের অবস্থান। ট্রাফালগার স্কোয়ারে অবস্থিত ভবনে প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও কৃতি ইংরেজদের পাঁচ হাজার যথাযথ প্রতিকৃতি চিত্র একত্রিত করে ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয় ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেট্ গ্যালারী। স্ট্যানপোলের আর্লের প্রস্তাবানুসারে হাউস অফ লর্ডস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাঁচ হাজার চিত্র বিশিষ্ট এই প্রতিকৃতি চিত্র সংগ্রহটি উইলিয়াম হেনরী আলেক্সান্ডারের দেওয়া অট্টালিকায় ১৮৯৬ সালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বর্তমানে সেখানেই আছে। লর্ড দুভিনের দানে ১৯৩৩ সালে একটি নোতুন গ্যালারী পোর্ট্রেট গ্যালারীতে সংযোজিত হয় এবং সম্প্রতি নোতুন প্রদর্শনী কক্ষ পার্লামেন্টের অনুমোদনে খোলা হয়েছে। ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কালের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে কেনসিংটন এলাকায় যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাকে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ১৮৯৩ সালে গঠিত হল কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট। বর্তমান ভবনটি অবশ্য ১৯৬২ সালে তৈরী। লন্ডন ইউনিভারসিটির শিল্পেতিহাস বিভাগ Courtauld Institute of Art এর সঙ্গে যুক্ত কোর্টাউল্ড ইনস্টিটিউট গ্যালারী ১৮৬৮ স্থাপিত হয়। ফেয়ারহামের লর্ড লীর দেওয়া ওল্ড মাস্টার্সদের রচিত চিত্র, স্যামুয়েল কোর্টাউল্ডের দেওয়া ফরাসী ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের রচনা এবং প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক ও নন্দনতত্ত্ববিদ রজার ফ্রাই এর চিত্র ও অন্যান্য শিল্প সংগ্রহে এই গ্যালারীটি সমৃদ্ধ। স্থাপত্য বিদ্যার উপর একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন ১৮৩৭ সাল নাগাদ স্যার জন সোন (Soane), ১৮১২ সালে নির্মিত স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য মণ্ডিত তাঁর নিজের ভবনে। এখানকার সংগ্রহটি সংগ্রাহকের সুরুচি ও রসিক মনের পরিচায়ক। ইংল্যান্ডের জাতীয় মহাফেজ খানা, নাম পাব্লিক রেকর্ড অফিস মিউজিয়ম, পার্লামেন্টে আইন পাশ করে ১৮৩৮ সালে স্থাপিত হয়। এখানে Dooms Day Book থেকে ১৯৫৫ সালের Writ and Return পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত নথি-পত্তর, সরকারী কাগজ, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। রেকর্ড অফিস মিউজিয়মের বর্তমান ভবনটি ১৮৫১ সালে নির্মিত এবং ১৯০২ সালে পরিবর্দ্ধিত হয়।

ফরাসী ও ইতালীয় শিল্প কর্মের একটি ভাল সংগ্রহ ওয়ালেস কালেকশন। হার্ট-ফোর্ডের তৃতীয় মার্কুইস ফ্রান্সিস চার্লস সেমুর-কনওয়ে (১৭৭৭-১৮৪২), চতুর্থ রিচার্ড (১৮০০-'৭০) এবং তাঁর পুত্র স্যার রিচার্ড ওয়ালেস (১৮১৮-'৯০) দীর্ঘদিন ধরে একটি সমৃদ্ধ পারিবারিক শিল্প সংগ্রহ গড়ে তোলেন। তাঁদের কালেকশনের একটি অংশ, বিশেষভাবে স্যার স্যামুয়েল মোরিকের কাছ থেকে ক্রীত শিল্প সংগ্রহটি ফ্রান্সের বাগাটেল দুর্গ প্রাসাদে রাখা ছিল। ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার যুদ্ধের পর ১৮৭৫ সালে স্যার রিচার্ড ওয়ালেস সেটি তাঁদের লন্ডনের ভবনে সরিয়ে আনেন। লেডি ওয়ালেস সমগ্র

সংগ্রহটি ঐ ভবনসহ জাতির উদ্দেশ্যে দান করে দেন এবং ১৯০০ সালে প্রিন্স অ্যালবার্ট ঐ সংগ্রহশালা উদ্বোধন করে সেটিকে জাতীয় সংগ্রহশালা বলে ঘোষণা করেন।

বিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে লণ্ডনে আরও দুটি ন্যাশন্যাল মিউজিয়ম স্থাপিত হয়, একটি ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত লণ্ডন মিউজিয়ম. যেখানে লণ্ডন নগরীর প্রথম যুগ থেকে বিশ-শতক পর্য্যন্ত ইতিহাস ও সমাজের বিভিন্ন পর্য্যায় নিদর্শন, মডেল প্রভৃতি সহযোগে দেখান হয়েছে এবং অন্যটি ন্যাশন্যাল ম্যারিটাইম মিউজিয়ম, ১৯৩৪ সালে স্থাপিত গ্রেট ব্রিটেনের সামুদ্রিক অভিযান, নৌযুদ্ধ ও নৌ-বাহিনী সংক্রান্ত সংগ্রহশালা। গ্রেট ব্রিটেন ও কমনওয়েলথের ইম্পিরিয়াল বাহিনী, প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাস ও সামরিক অভিযান সংক্রান্ত নথিপত্র, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য ১৯১৭ সালে ওয়ার ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়ম ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসে ১৯২০ সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই সামুদ্রিক যুদ্ধ মিউজিয়মটি ডিউক অফ ইয়র্কের প্রাসাদে অবস্থিত।

ঐতিহাসিক টমাসের (১৭৯৫-১৮৮১) গৃহ, ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স (১৮১২ '৭০) সস্ত্রীক যে বাড়ীতে থেকেছিলেন (১৮৩৭-'৩৯) সেই বাড়িটি, কবি জন কীটস (১৭৯৫ ১৮২১) এর গৃহ. শিল্পী উইলিয়ামের মরিস হাউস এবং অভিধান রচয়িতা, সাহিত্যিক, কাব্য সমালোচক. জীবনীকার ও সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েও ডক্টরেট. সেই বিখ্যাত ডঃ স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-'৮৪) যে বাড়ীতে বাসকালে অভিধান রচনা করেন সেই গৃহ এবং ঐসব শ্রদ্ধেয়.খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানান জিনিস লণ্ডনে জীবনী ও স্মারক সংগ্রহশালা হিসাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া ঐ শহরে রয়্যাল সোসাইটি অফ হেলথ, রয়্যাল কলেজ অফ মিউজিক, রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি বিদগ্ধ সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নানা বিষয়ক মিউজিয়ম আছে এবং সে গুলি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকেই প্রতিষ্ঠিত। ভিক্টোরিয়া এণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ম বর্তমানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থিত অনেকগুলি ঐতিহাসিক সৌধ, প্রত্নস্থান, আর্ট-কালেকশন ও মনীষী-ভবনের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধান করে। লণ্ডনের বাইরে শ' তিনেক সংগ্রহশালা আছে এবং তার মধ্যে বেশ কিছু বিচিত্র বিষয়বস্তুর উপর যেমন ট্রামওয়ে মিউজিয়ম (ক্লিফ কোয়ারি, ডার্বিশায়ার); গত শতকের বিখ্যাত প্রত্নজ্ঞ লেন্স-ফক্স পিট-রিভারস কর্ত্তৃক উৎখনিত ও সংগৃহীত প্রত্ন বস্তুর পিট-রিভারস মিউজিয়ম (ফামহাম); ট্যাঙ্ক মিউজিয়ম (অয়্যারহাম) মণ্টাগু মোটর মিউজিয়ম (বিউলিউ); কটন পাওয়েল মিউজিয়ম (বার্চিংটন), যেখানে বিখ্যাত শিকারী অভিযাত্রী কটন পাওয়েল কর্ত্তৃক সংগৃহীত আফ্রিকা মহাদেশ ও ভারত উপমহাদেশের ছ'হাজার গোত্রের বন্য প্রাণীর চর্মাস্থি ও উনিশ হাজার উপজাতীয় সংস্কৃতির উপকরণ আছে, মিউজিয়ম অফ ক্যারেজ (মেডস্টোন), যেখানে পুরাতন ঘোড়ার গাড়ীর সংগ্রহ রয়েছে; ওয়াটার ওয়েজ মিউজিয়ম (টাওশেস্টর); সেলর্স হোম এণ্ড নটিক্যাল মিউজিয়ম (নরফোক); মিউজিয়ম অফ আয়রণ ফাউণ্ডিং (স্রপশায়ার) টোটেন মিউজিয়ম (আরুণ্ডেল), যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির পরিবার,

গোত্র ও বংশ প্রতীকের সংগ্রহ আছে ; পটার্স মিউজিয়ম (সাসেক্স), যেখানে বিখ্যাত ট্যাক্সিডার্মিস্ট ওয়াল্টার পটার (জন্ম ১৮৩৫) সংগৃহীত ও সংরক্ষিত পশু পক্ষীর চর্ম ও অস্থির সংগ্রহ আছে ; গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে মিউজিয়ম (সুইণ্ডন), যেটি ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয় · ন্যারোগেজ রেলওয়ে মিউজিয়ম (মেরিওনেথ) ১৯৬৲ সালে স্থাপিত ; মিউজিয়ম অফ চাইল্ড হুড (এডিনবার্গ). শিশুর খেলনা, পুতুল ও আসবাবের অভিনব সংগ্রহালয় ; উইভার্স কটেজ (রেনফ্রিউ) ; তাঁত শিল্প সংক্রান্ত সংগ্রহ। এছাড়া আছে শ' দেড়েক কাউন্টি মিউজিয়ম ও শ' দুয়েক গ্রাম ও জাতি সংস্কৃতির উপকরণ সমৃদ্ধ মিউজিয়ম। আধুনিক যুগটি হচ্ছে বিষয় ও জ্ঞানের বিশেষীকরণের যুগ। ফলে সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে বিষয় বিভাজনও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে একালের মিউজিয়মের সংস্কৃতি ও বস্তু উপকরণের বিভাজন শুরু হয়েছে। মানুষের জিজ্ঞাসা. রুচি. প্রকৃতি ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা অনুসারে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের মিউজিয়ম। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপকরণগত বৈচিত্র্য যত বাড়ছে, ততই সংগ্রহশালার বিষয় বৈচিত্র্য বাড়ছে।

সংগ্রহশালার আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করতে বসে এই শতকের শেষার্দ্ধে এসে আমরা দেখছি বেল-শাল্টিনন্নরের সেই ছোট্ট প্রত্ন-বিষয়ক ও মন্দির সংলগ্ন স্থানিক চরিত্রের স্কুল বা ব্যক্তি সংগ্রহালয় থেকে যার শুরু ইতিহাসের সতত পরিবর্ত্তনের ধারায়, আজ সেই মিউজিয়মের কত না বিষয় ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য। এক আজ বহু। বর্তমানে পৃথিবীতে মিউজিয়মের সংখ্যা পনের হাজারের কম নয়।

মিউজিয়ম যেদিন থেকে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে সেদিন থেকেই শিশুরা বাবা মায়ের হাত ধরে মিউজিয়ম দেখছে, অবশ্য সবাই নয়, কেউ কেউ। সংগ্রহশালা মহলে শিশুদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা, তাদের উপযোগী কার্যক্রম এবং সাধারণ সংগ্রহালয়ে শিশুদের উপযোগী প্রদর্শকক্ষের ব্যবস্থা রাখা অথবা তাদের জন্য পৃথক শিশু সংগ্রহালয় গড়ে তোলা প্রভৃতি ব্যাপারগুলি বিংশ শতাব্দীর ধারা। বিশ্বের প্রথম চিল্ড্রেন্স মিউজিয়ম স্থাপিত হয় নিউইয়র্ক শহরে. ব্রুকলিনে, ১৮৯৯ সালে। ব্রুকলিন চিল্ড্রেন্স মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাত্রী আন্না বিলিংস গ্যালপ্ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, চারটি শিশু সংগ্রহালয় স্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শতাধিক সংগ্রহশালা আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আরও প্রায় কয়েক ডজন শুধুমাত্র শিশুদের উপযোগী সংগ্রহশালা আছে। এই শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে শিশু সংগ্রহালয় গড়ে তোলার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে।

এই শতকে পর পর বহু শিশু সংগ্রহালয় গড়ে ওঠার পশ্চাৎপটে আছে শিশু শিক্ষা বিষয়ে ঊনবিংশ শতকে Fricidrich August Wilhelm Froobel (১৭৮২-১৮৫২) নামক জার্মান শিক্ষাবিদের নোতুন শিশু-শিক্ষা-তত্ত্ব, যা' তিনি তাঁর Education in Man (১৮২৬) গ্রন্থে প্রকাশ করেন এবং নিজে ১৮৩৭ সালে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা. করে সেই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ আরম্ভ করেন। শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করে তোলার নানান পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করতে থাকেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত কিণ্ডার গার্টেনে

(Kinder garten), যাব অর্থ শিশু-কানন। এই শিক্ষা পদ্ধতি খেলাধুলো, হাতে কলমে কাজ, বস্তু-পরিচয় এবং সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়। ইতালীর শিক্ষাবিদ মারিয়া মন্তেসরি (১৮৭০ ১৯৫৪) যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তাব মূল লক্ষ্য শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার পরিবর্তে অভিভাবনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং উপযুক্ত অভিভাবনায় (guidance) শিশুকে আনন্দদায়ক ও সৃজনশীল কর্মে নিযুক্ত রাখা হয়। এ বিষয়ে তিনি ১৯১২ সালে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে এ জাতীয় শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয়। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধে পুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ায় বে-সামরিক কর্ম ও উৎপাদন ক্ষেত্রে মেয়েদের নিয়োগ করায় উপযুক্ত শিশু শিক্ষার জন্য বহু কিণ্ডার গার্টেন ও মন্তেসরি স্কুল চালু হয়। এই দুই শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তখন শিক্ষাবিদ ও শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কর্মীরা সচেতন হন। ফলে শিক্ষাবিদদের নজর পড়ল সংগ্রহশালায় সংগৃহীত বিচিত্র বস্তু নিদর্শনেব উপব এবং সংগ্রহশালার চিন্তাশীল পরিচালকেরা শিশু শিক্ষায় মিউজিয়মেব গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়ে উঠলেন। সাধারণ সংগ্রহালয়গুলি শিশু শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত নানা ধরনের কার্য্যক্রম নিতে শুরু করল। অন্যদিকে আধুনিক শিশু শিক্ষায় আগ্রহী অনেকেই এগিয়ে আসেন শিশুদের জন্য সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে। সাধারণ সংগ্রহশালা ও শিশু সংগ্রহশালায় ছোটদের উপযুক্ত ও তাদেব পক্ষে আকর্ষণীয় নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে থাকে। গাইড সার্ভিস, স্কুল লোন সার্ভিস. সবলভাষায় লেখা নির্দেশিকা, সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশন, নিজে কর প্রদর্শনী, কুইজ প্রতিযোগিতা, ছবি আঁকা ও মেকানো ও মডেল তৈরী ক্লাস চালান, বিজ্ঞান মেলা, ছোটদের নিদর্শন সংগ্রহ অভিযান, ট্রেলসাইড মিউজিয়ম ও ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীব ব্যবস্থা, চলচ্চিত্র ও স্লাইড প্রদর্শন, গ্যালারীতে বিস্তারিত লেবেলের ব্যবহার, সহজবোধ্য বক্তৃতা, আকর্ষণীয় বস্তুবিন্যাস, উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন. সুনির্দিষ্ট ভাবে গ্যালারী প্রদর্শন ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যক্রম চালু করে সংগ্রহশালাগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ছোটদের শিক্ষায় কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণে ক্রমশ সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠছে। সংগ্রহশালাগুলি তাদের চার দেওয়ালের গণ্ডী ছাড়িয়ে স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য সংঘবদ্ধ সামাজিক গোষ্ঠি বা জিজ্ঞাসু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে চেষ্টা করছে। শিশু সংগ্রহশালা পরিচালক মলি হ্যারিসনের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "ভাল বা মন্দ যাই ঘটুক সংগ্রহশালা শিক্ষাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। "অবশ্য অনেক সংগ্রহশালাই আগের মত জড়তা ও স্থবিরতাকে আঁকড়ে রয়েছে। অন্যপক্ষে অনেক সংগ্রহশালা শিক্ষাদানের অতি উৎসাহে একঘেয়ে, শীতল ও আনুষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে আটকে পড়েছে। তাদের কার্য্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মতই বড় বেশি নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা ও আবেগানুভূতির প্রকাশ সেখানে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে আধুনিক সংগ্রহশালাবিদরা চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। সংগ্রহশালাগুলি যাতে

বড় বড় দেওয়ালে চিত্রিত জ্ঞানের কোষগ্রন্থ না হয়ে পড়ে, সে দিকে অনেকে সংগ্রহশালা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। জ্ঞানদানের আধিক্যবশত সংগ্রহশালা যেন দর্শকদের অজ্ঞানতার হীনমন্যতাবোধকে বাড়িয়ে না তোলে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। আধুনিক সমাজ তার প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষা বিস্তার চায়—সে তাগিদ পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী উভয় সমাজেই। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে গণশিক্ষা উপেক্ষিত থাকতে পারে না। তাই সংগ্রহশালার ভবিষ্যৎ সামাজিক অস্তিত্ব নির্ভর করছে তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক ভূমিকার উপর। স্ব স্ব সমাজের পরিবর্ত্তনশীল বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মিউজিয়মকে শুধু শিশু বা ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা নয়, গণশিক্ষার আনন্দদায়ক মাধ্যম হয়ে উঠতে হবে।

গবেষণার ক্ষেত্রে আর্কাইভ ও গ্রন্থাগারের মত সংগ্রহশালা বৃহত্তর জনসমাজের অলক্ষ্যে তার জন্মলগ্ন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, কেননা আর কেউ না জানুন, বিদগ্ধ গবেষকরা জানেন সেখানে প্রকৃতি ও মানব সংস্কৃতির মৌলিক বস্তু-প্রমাণগুলি সংরক্ষিত আছে। অবশ্য বহু সংগ্রহশালার সম্পদ জানা না থাকায় বা সংগ্রহশালার পরিচালক ও কর্মীদের সংকীর্ণ মানসিকতার জন্য সংগ্রহশালার বহু সম্পদ আজও গবেষণার ক্ষেত্রে অব্যবহৃত থেকে গেছে। সংগ্রহশালা গবেষক মণ্ডলী এবং শিক্ষাসংস্থার মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে না তোলা পর্য্যন্ত এ ত্রুটি থাকবে। সংগ্রহ-শালার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ যোগ্যতানুযায়ী নিজ নিজ সংগ্রহশালার সম্পদের কোন কোন অংশের উপর গবেষণা প্রকাশ করেন। বাইরের গবেষকদের প্রতি সংগ্রহশালাগুলি আরও বেশি সহানুভূতিশীল ও উদার না হলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সংগ্রহশালা তাঁর যথাযথ ভূমিকা পালনে অপারগ থেকে যাবে। এ জন্য ভবিষ্যতে সংগ্রহশালাগুলিতে সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়াতে হবে, আধুনিক প্রয়োগ পদ্ধতি চালু করতে হবে এবং চিন্তা-ভাবনায় প্রসারিতা আনতে হবে।

যে সব দর্শক সংগ্রহশালার শান্ত, পরিচ্ছন্ন ও নান্দনিক পরিবেশে এসে মানসিক ও আত্মিক পরিতৃপ্তি চান, তাদের জন্য সংগ্রহশালার ভূমিকা হবে মন্দিরের মত। যুক্তি ও বস্তুবাদী বিদগ্ধ দর্শকের আত্মিক অপূর্ণতা দূর হয় শিল্প (Art) সংগ্রহশালায়। তাদের কাছে "আগামী কালের সংগ্রহশালাগুলি হয়ে উঠবে, গতকাল যা মন্দির ছিল তাই।"

"সংগ্রহশালাগুলি ছেলে মেয়েদের ভিজে বিকেলে ডেটিং-এ মিলিত হবার স্থান নয়; তার চেয়ে সূক্ষ্ম পথে মিলন কেন্দ্র। এখানে মূল্যবোধগুলি মিলিত হয়; বিশেষজ্ঞের মূল্যবোধ সাধারণ মানুষের মূল্যবোধে ঘর্ষিত হয়, শিশুদের পছন্দ বয়স্কদের পছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, দুর্লভ জিনিসের সংরক্ষণের সঙ্গে সেগুলি প্রদর্শনের টানাপোড়েন চলে, একজন স্বতন্ত্র দর্শকের চাহিদার বিপরীত হয়ে দেখা দেয় গোষ্ঠী বদ্ধ শিশু বা বয়স্কের চাহিদা।" এই পরস্পর বিরোধী চাহিদার টানাপোড়েন কমাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও বিষয়ের উপর সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। উনবিংশ শতক পর্য্যন্ত সংগ্রহশালা ছিল সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে উদাসীন। বিশ শতকে সংগ্রহশালা ক্রমশ জনসাধারণের

প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু আজও সাধারণ মানুষ সংগ্রহশালা সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহী বা উৎসাহী নয়। ভবিষ্যতে যেদিন একদিকে সংগ্রহশালা সাধারণের কাছে যাবে, আবার বিপরীত দিক থেকে সাধারণ মানুষ সংগ্রহশালার দিকে এগিয়ে আসবে, উভয় উভয়ের কাছে আসবে, তখনই সংগ্রহশালা সঠিক অর্থে সাধারণের হবে।

বর্তমান শতকে, প্রথমবিশ্বযুদ্ধের পর, সংগ্রহশালার ইতিহাসে এক নোতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হল। বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায়, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার মানসে এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত আর্থ-রাজনৈতিক ভারসাম্যের পুনঃস্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠিত হল আন্তর্জাতিক জাতি সংস্থা, লীগ অফ নেশনস (১৯২০)। বিশ্বশান্তি রক্ষা, বিরোধের মীমাংসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা এই ছিল লীগ অফ নেশসনএর তিনটি মূলনীতি। বিশ্বের জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে লীগ অফ নেশনস-এর কার্যক্রমের জন্য গড়া হল ইণ্টার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন। বৌদ্ধিক সহযোগিতার এই আতর্জাতিক পর্ষদ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এম লিওন বুর্জোয়া এবং তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন লর্ড বালফুর এবং অধ্যাপক গিলবার্ট মারের মত ইংরেজ মনীষী। ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গস'র প্রভাবে ফরাসী সরকারের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া গেল। ঐ পর্ষদের আবাসন হল Rue de Montpensier, Palais Royal, Paris, এবং ফরাসী সরকার এর ব্যয় নির্বাহের মূল দায়টুকু নিলেন। এই বৌদ্ধিক পর্ষদের একটি শাখা হিসাবে গঠিত হল ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়মস অফিস, সংক্ষেপে আই এম ও, যার কাজ হল বিভিন্ন দেশ ও জাতির ঐতিহ্য সংরক্ষণে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা এবং এতদ্বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠান, পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞের ভ্রমণ ও বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রভৃতি। সংগ্রহশালা সংক্রান্ত প্রতিবেদন, অভিজ্ঞতা ও তথ্য প্রকাশের নিমিত্ত Mouseion নামে একটি ফরাসী সাময়িকী প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন আই এম ও, ১৯২৩ সাল থেকে। সংগ্রহশালায় বস্তুসংগ্রহ, নিদর্শন দান ও বিনিময় সম্বন্ধীয় আইন কানুনের সমস্যা, পুরা ও শিল্পবস্তু অপহরণ, লুণ্ঠন বা দেশ বিদেশে শিল্প ও পুরা বস্তু পাচার সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের পদ্ধতি নির্ণয়ের প্রচেষ্টা, পুরা ও শিল্পবস্তু সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রসার ও প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে আই. এম ও. বিভিন্ন সংগ্রহশালা বিশারদদের আলোচনা সভা সংগঠিত করে এবং সে সব আলোচনার প্রতিবেদন প্রকাশ করে। একথা সত্য যে সে সময় আই. এম. ও প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালার পর্ষৎ হয়ে উঠতে পারে নি। ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যেই এর কাজকর্ম প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এই আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পর্ষদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না, কেননা বিশালতর অঞ্চলের সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার শুরু হল আই. এম. ও'র মাধ্যমে।

আই. এম. ও র মৌলিক উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতা লাভ করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর

কালে। ১৯৪৬ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো মিউজিয়ম অফ সাইন্সের তৎকালীন সভাপতি চাউন্সে (Chauncey) জে, হ্যামলিন ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়ম, সংক্ষেপে আইকম নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদ গঠন করেন। পরের বছর মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য (U. K), ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আইকম (ICOM) কে আই এম. ও'র পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদ বলে ঘোষণা করা হল। নব প্রতিষ্ঠিত (১৯৪৫) রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদের প্রতিষ্ঠা হলে, ক্রমশ অন্যান্য বহুরাষ্ট্র ঐ সংগ্রহশালা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে ঐ পরিষদ যথার্থই আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশ আইকমের সদস্য। পরিষদের প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রাক্তন আই এম ও'র ভবন। কার্যকরী কমিটি, উপদেষ্টা বোর্ড, সেক্রেটারিয়েট,আন্তর্জাতিক কমিটি এবং প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের জাতীয় কমিটি নিয়ে আইকমের বহু বিস্তৃত সংগঠন। সংস্থা ও ব্যক্তি দু ধরনের সদস্যপদ এই পরিষদে আছে। অবশ্য প্রত্যেক দেশের সংস্থা ও ব্যক্তি সদস্য থেকে গঠিত হয় জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় কমিটি থেকে আন্তর্জাতিক কমিটি। আন্তর্জাতিক কমিটি উপদেষ্টা বোর্ডের পরামর্শ অনুসারে স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে পরিষদের সকল কার্য পরিচালনা করেন।

সেক্রেটারিয়েটের কাজ : (১) সদস্য নথী ভুক্তি করণ ও তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দান ; (২) তথ্য সংগ্রহ, নথীভুক্তি করণ, প্রকাশনা ও জনসংযোগ ; (৩) সভা আহ্বান ও কার্যকরী সমিতি কর্তৃক আদিষ্ট কর্ম-সম্পাদন ; (৪) জাতীয়, মহাদেশীয় (আঞ্চলিক) ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগ্রহশালা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সহযোগিতা। তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য নথীভুক্তি করণের জন্য ইউনেস্কো-আইকম ডকুমেন্টেশন সেণ্টার ব্যাপক ভাবে কাজ করে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'আইকম নিউজ' নামে প্রকাশিত পত্রিকাটি নিয়মিত তথ্য, প্রতিবেদন ও সংবাদ প্রকাশ করে। এছাড়া 'মিউজিয়ম' শিরোনামায় ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ত্রৈমাসিক পত্রিকা বার করে এবং মিউজিয়মস এণ্ড মনুমেন্টস সিরিজে প্রায় দেড় ডজন সংগ্রহশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগের উপর পুস্তক প্রকাশ করেছে। প্রত্যেক আইকম সম্মেলনের প্রতিবেদন ও আলোচনাও প্রকাশিত হয়। সংগ্রহশালার শিক্ষাগত গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৬৬ সাল থেকে আইকম ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়ম এডুকেশন, সংক্ষেপে ইকমে (ICME) এবং তার অধীনে জাতীয় সমিতি (NCME) গঠন করেছে। সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন বিষয়ের সংগ্রহশালার জন্য পৃথক পৃথক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কমিটি গঠিত হচ্ছে এবং সেই সব কমিটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সংগ্রহশালার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী করে দিচ্ছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরী, জীবনী ও স্মারক, নৃ-তত্ত্ব ও জাতি-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক এ রকম কমিটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে কাজ করছে, অবশ্যই আইকমের অধীনে। আঞ্চলিক অবস্থান, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি

রেখে বিভিন্ন আইকম রিজিওন্যাল এজেন্সীর মাধ্যমে আইকম তার বিশাল কার্যক্রমের দায়িত্ব বিভিন্ন আঞ্চলিক এজেন্সীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রিজিয়নাল এজেন্সি নয়াদিল্লীর বরাখম্বা রোডে অবস্থিত সপ্রু হাউস অ্যানেক্সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইভাবে আইকম সংগঠনকে বিষয় ও অঞ্চল অনুসারে বিভাজিত করার ফলে আইকমের কাজকর্মের প্রসারতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্মেলন, আলোচনা সভা ও প্রকাশনার সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। অঞ্চল ও বিষয়ভেদ অনুসারে সংগ্রহশালার প্রকৃতি ও সমস্যা ভিন্ন হওয়ায় ঐ জাতীয় বিষয় ও অঞ্চলগত সংস্থা একই অঞ্চলে অবস্থিত বা সম-বিষয়ভুক্ত সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক যোগাযোগ নিবিড় করে তুলতে সাহায্য করছে।

সংগ্রহশালা সংক্রান্ত ধ্যান ধারণা, প্রয়োগ-পদ্ধতি, নিদর্শন ও কর্মকুশলতার আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিনিময়ের ব্যাপকতা ও গভীরতা বৃদ্ধির ফলে সু-প্রতিষ্ঠিত ও স্বচ্ছল সংগ্রহশালাগুলির রূপ ও প্রকৃতি ক্রমশ আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে—এটাই ভবিষ্যৎ।

মিউজিয়ম কাকে বলে এই প্রশ্ন দিয়ে সংগ্রহশালার ইতিহাস আলোচনা শুরু হয়েছিল। নানা নামে, নানান উদ্দেশ্যে, সমাজের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের স্তরে স্তরে সংগ্রহশালার রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। সেই ঐতিহাসিক বিবরণের অংশ বিশেষ আলোচনার পরিশেষে, মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে হচ্ছে। কেননা আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদের (ICOM) গঠনতন্ত্রের দ্বিতীয় ধারায় সংগ্রহশালার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হয়েছে ঃ শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরী নিদর্শনের সংগ্রহ, উদ্ভিদ উদ্যান, প্রাণী সংরক্ষণাগার, মীনাধার, সাংস্কৃতিক মূল্যে আছে এমন সব বস্তু ও নিদর্শনের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্য্যালোচনা ও নানা উপায়ে সম্প্রসারণ এবং বিশেষ করে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন ও শিক্ষার জন্য প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে, সাধারণের স্বার্থে প্রশাসিত, এমন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রহশালা বোঝায়। ঐ ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থায়ী প্রদর্শন কক্ষ বিশিষ্ট সাধারণ গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানা সংগ্রহশালা বলে বিবেচিত হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে সংগ্রহশালা এমন একটি স্থায়ী সংস্থা যা' সাধারণের স্বার্থে সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক গুরুত্ব আছে এমন সব বস্তু ও নিদর্শন সংগ্রহ করে, সংগৃহীত বস্তু বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে, সেগুলির উপর গবেষণা করে এবং বিশেষ করে জন সাধারণের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য সে সব বস্তু প্রদর্শন করে। কার্য্যক্রমগুলি সংগ্রহশালার মাধ্যম, কাজের সম্প্রসারণতার ও অগ্রসরতর মাপকাঠি। জনসাধারণের শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন সংগ্রহশালার লক্ষ্য। ভবিষ্যতের সংগ্রহশালা সেই লক্ষ্য সাধনের নিমিত্ত নোতুন নোতুন পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে তার অস্তিত্বের সামাজিক উপযোগিতা আরও অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। সংগ্রহশালার আন্তর্জাতিক প্রচার বৎসরে (১৯৫৭) ইউনেস্কো জনসাধারণকে সংগ্রহশালা-সচেতন করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে ঃ "সংগ্রহশালা সকলের জন্য।"

দ্বিতীয় ভাগ

শিল্পবস্তু সংরক্ষণ

মানব-সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প নিদর্শন। এগুলি ছড়িয়ে আছে দেশের নানান সংগ্রহশালায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বাড়ীতে, মহাফেজখানায়, বিদ্বজ্জনসভায়, গ্রন্থাগার ইত্যাদিতে। এ ছাড়া মন্দির, মসজিদ, গির্জা, দুর্গ, বিজয়স্তম্ভ, রাজপ্রাসাদ, গুহা, গুহাচিত্র, দেওয়ালচিত্র, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, ধ্বংসস্তূপগুলি আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক। ফলিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানান পদ্ধতিতে এই শিল্পনিদর্শনগুলি সংগ্রহ করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শিল্পবস্তুর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু আজও এগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ কিছুই করা হয়নি। তাই বহুমূল্যবান শিল্পনিদর্শনগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে দিনে দিনে, হারিয়ে যাচ্ছে মানব-সভ্যতার পরিচয়। এই শিল্পনিদর্শন ও ধ্বংসস্তূপগুলি শিল্পায়ন ও বায়ুদূষণের ফলে সাংঘাতিক পরিমাণে ক্ষয় হতে দেখা যায়। ধ্বংস ও ক্ষয়ের হাত থেকে শিল্পনিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলির সংরক্ষণ ও সুরক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পনিদর্শনগুলির গঠন অনুসারে এদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

(১) জৈব বস্তু (Organic materials)ঃ

কাগজ, তালপাতার পুঁথি, ভূর্জপত্র, জড়ানো পটচিত্র, কাপড়, কাঠ, হাড়, হাতীর দাঁত ইত্যাদি।

(২·১) অজৈব বস্তু (Inorganic materials)ঃ

লোহা, ইস্পাত, সোনা, রুপা, তামা, সীসা, টিন, ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য ধাতুনির্মিত-বস্তু।

(২·২) বালি ও মৃত্তিকা যুক্ত বস্তু (Siliceous materials)ঃ

পোড়ামাটি, কাঁচ, পাথর, সিরামিকস, মৃৎশিল্প ইত্যাদি।

কাগজ

কাগজ তৈরী হয় সেলুলোজতন্তু থেকে। বিশুদ্ধ সেলুলোজতন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া কঠিন। কাচা সেলুলোজতন্তুর সাথে মিশ্রিত চর্বি, মোম, লিগনিন ও অন্যান্য অপবস্তু কাগজের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে।

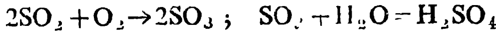
১০৫ খ্রীস্টাব্দে কাগজ প্রথম তৈরী করা সম্ভব হয় চীন দেশে। ছাপা বইয়ের আগে ছিল হাতে লেখা পুঁথিপত্র। লিপিমালা আবিষ্কার হওয়ার পর অনেক কাল পর্যন্ত পাথরের গায়ে বা মাটির ফলকে খোদাই করা হ'ত। পরবর্ত্তীকালে তালপাতায় ভূর্জপত্রে, গাছের ছালে, চামড়ার উপর খোদাই করা এবং লেখা হ'ত। এর অনেক পরে প্রচলিত হল কাগজে লেখার রীতি। আমাদের দেশে তুলট-কাগজে লেখা বহু পুঁথিপত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, এগুলি নানান ভাষায় লেখা—সংস্কৃত, পালি, বাংলা ইত্যাদি। নানান জায়গায় এগুলি দেখা যায়; যেমন—বাড়ীতে, বিশ্বজ্ঞানসভায়, গ্রন্থাগারে, সংগ্রহশালায়, মহাফেজখানায়। কিন্তু যদি এগুলি যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ না করা যায় তাহলে নানা কারণে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এইসব পুঁথিপত্রগুলি সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ক্রমিক প্রসারের সাক্ষ্য, তাই এগুলি সব নিয়েই তৈরী হয় সভ্যতার ইতিহাস।

কাগজের স্থায়িত্ব ও গুণাগুণ ঃ কাগজের পুঁথিপত্র সংরক্ষণ করার জন্য এর গুণাগুণ ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কাগজ মোটামুটি কি কি উপাদানে তৈরী তার উপর স্থায়িত্ব ও গুণাগুণ নির্ভর করে।

খুব শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী কাগজ হল হাতে তৈরী কাগজ। এটি তৈরী হয় লিনেন ও টুকরো টুকরো তুলো একসাথে মিশ্রণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই মিশ্রণের সাথে জিলাটিন মেশান হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রাউন্ড-উডের মণ্ডের সঙ্গে রোজিন এবং অ্যালুমিনিয়াম রোজিনেট মিশিয়ে যে কাগজ তৈরী হয় তা খুবই দুর্বল ও স্বল্পস্থায়ী। এ ছাড়াও নানান ধরনের কাগজ পাওয়া যায় যাতে বেশি পরিমাণ সালফাইড মণ্ড থাকে এবং এগুলি ব্যাপকভাবে বই ছাপার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কাঁচা গ্রাউন্ড-উডের তন্তুর সাথে অল্প পরিমাণে সালফাইড মণ্ড মিশিয়ে কাগজ তৈরী করা যায় কিন্তু এগুলি মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

কাগজ যে কোন ধরনের হোক না কেন সংরক্ষণ করার জন্য এদের প্রাচীনতা নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমতঃ যদি কাগজের উপর কোন লেখা পাওয়া যায় এবং সেটি পড়া সম্ভব হয় তাহলে এদের প্রাচীনতা নির্ধারিত হতে পারে। কাগজের স্থায়িত্ব অনেকখানি নির্ভর করে কাগজের অম্লতার পরিমাণের উপর। প্রশমিত কাগজ (PH7 ± 0·3) অনেক বার ভাঁজ করা যায় কিন্তু যে সব কাগজের অম্লতা স্বাভাবিকের চাইতে বেশি এদের বেশি ভাঁজ করা যায় না। আবার কিছু কাগজ আছে যেখানে অম্লতা খুব বেশি কিন্তু PH এর পরিমাণ কম, যেমন ৪-৪·৫ তখন এদের নমনীয়তা হারিয়ে যায় ও খুবই ভঙ্গুর হয়। কাগজ যত পুরানো হয় অম্লতার পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়, যদি না এগুলি পরিষ্কার, দূষণমুক্ত পরিবেশ ও পরিমিত আর্দ্রতার মধ্যে রাখা যায়।

কাগজের উপর সালফিউরিক অ্যাসিড জমলে তা কাগজের ভীষণ ক্ষতি করে। দূষিত পরিবেশে যদি কাগজ থাকে তাহলে বায়ুমণ্ডলের সালফার সালফার ডাই-অক্সাইডে (SO_2) পরিণত হতে পারে, এই সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) অক্সিজেনের (O_2) সংস্পর্শে সালফার ট্রাই-অক্সাইড (SO_3)-এ পরিণত হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে এই সালফার ট্রাই-অক্সাইড (SO_3) লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে (H_2SO_4) পরিণত হয় এবং কাগজের উপর জমা হয়।



$$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3 \; ; \quad SO_3 + H_2O = H_2SO_4$$

এছাড়া অনেক সময়, বিশেষতঃ আয়রন গলইংক (Iron gallink)-এ, সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায় এবং এই ধরনের কালিতে লেখা কোন পুঁথি বা বইয়ের কাগজ ফুটে ফুটো হয়ে যায় ও ভঙ্গুর হয়। কিছু আনুবীক্ষণিক প্রাণী আছে যেমন Aspergillus যা কাগজের উপর অ্যাসিড জমতে সাহায্য করে। তাই কাগজ ও কাগজের উপর লেখা বিষয়বস্তু সংরক্ষণ করার জন্য নানান পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত।

আর্দ্রতা (**Humidity**) ঃ কাগজ সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন কারণ কাগজ জলাকর্ষী (hygroscopic) বস্তু। তাই যদি কোনভাবে দীর্ঘদিন ধরে খুব বেশি আর্দ্র পরিবেশের মধ্যে পুঁথি বা বই থাকে তাহলে কাগজের কোষগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আনুবীক্ষণিক জীবাণুর বংশবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। কাগজটির পচনক্রিয়া আস্তে আস্তে চলতে থাকে। এই সময় কাগজ বিবর্ণ হয়ে যায় ও লেখাগুলির স্পষ্টতা হারিয়ে যেতে থাকে।

আর্দ্রতার প্রভাব ও পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সংগ্রহশালায় এক হাজার টন বই থেকে দেখা যায় যে এরা অন্ততঃ ২০,০০০ পাউণ্ড জল শোষণ করেছে যখন বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) ৫৭ থেকে বেড়ে ৬৩ শতাংশ হয়েছে, ৬০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায়। কাগজের নথি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এদের ৬০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও ৬০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা দরকার।

কাগজ তৈরী ও বই বাঁধানর সময় সেলুলোজ ও জিলাটিন জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা হয় (স্টারচ, ময়দা, ডেক্সট্রিন) যাতে ছত্রাক (fungi) জাতীয় প্রাণী সহজে বংশবিস্তার করতে পারে; এগুলি এদের প্রিয় খাদ্য। দেখা যায় যদি বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০ শতাংশের বেশি হয় তাহলে এমন কি ছত্রাক জাতীয় প্রাণীও আক্রমণ করে ও বংশবিস্তার করে। যদি কাগজে এই ধরনের প্রাণীর বংশবিস্তার ধরা পড়ে তাহলে আর্দ্রতার পরিমাণ কমিয়ে যদি শুকনো করা যায় তাহলে এরা খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু যদি এই ধরনের প্রাণীর আক্রমণ আটকানো না হয় তাহলে কাগজগুলি আস্তে আস্তে হলুদ রং-এ রূপান্তরিত হয় এবং কাগজের উপর নানান রং-এর দাগ পড়তে দেখা যায়। কিছু আনুবীক্ষণিক প্রাণী কাগজের উপরিভাগে বংশবিস্তার করতে থাকে আবার কিছু

প্রাণী কাগজের সেলুলোজ তন্তুগুলি খেয়ে ফেলে ।। যেখানে কাগজে আঠাল পদার্থ ব্যবহৃত হয় তা এরা খেয়ে ফেলে ফলে কাগজের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এবং আক্রান্ত জায়গার অবশোষণ ক্ষমতা (absorptive power) প্রায় ব্লটিং কাগজের মত হয়। এর ফলে আক্রান্ত জায়গাগুলি ভিজে যায় এবং ভেজা জায়গাগুলি শুকনো করে নিলে এই অংশগুলি বিবর্ণ ও ঈষদচ্ছ (transluscent) হয়ে যায়। যখন সেলুলোজ তন্তুগুলিকে বিশেষ ভাবে আনুবীক্ষণিক প্রাণী আক্রমণ করে তখন কাগজের উপরি-ভাগটি ক্ষয়ে যেতে থাকে ও কাগজটি ভঙ্গুর হয়। কাগজের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলিতে বাদামী রং-এর দাগ পড়তে দেখা যায় যাকে ফক্সিং (Foxing) বলা হয়।

ছত্রাক-জাতীয় প্রাণীর বংশবিস্তার ও সংরক্ষণ ঃ এরা বংশবিস্তার করতে শুরু করলেই প্রথমে কাগজের উপর খুব সূক্ষ্ম সুতো সুতো কিছু জিনিষ খালি চোখে দেখা যায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এরা সাংঘাতিকভাবে বংশবিস্তার করে ও গোলাকার উপনিবেশ (colony) তৈরি করে। এই ধরনের আক্রমণ ঘটে অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্য, এবং যে জায়গায় কাগজটি আছে যদি সেই জায়গার তাপমাত্রা বাড়ানো যায় তাহলে বংশবিস্তারের হার আরো ত্বরান্বিত হবে। এই ধরনের আক্রমণ থেকে কাগজ রক্ষা করতে হলে আক্রান্ত নথিগুলি সাবধানে পরিষ্কার জায়গায় স্থানান্তরিত করতে হবে ও বায়ুযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। এবারে আক্রান্ত জায়গার উপর একটি নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষে ছত্রাকগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া যায় ও সাময়িকভাবে এদের আক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়। এরপর এগুলিকে গরম জায়গায় রাখার দরকার যাতে আবার আক্রান্ত না হতে পারে। মুক্ত বায়ু, পরিমিত আর্দ্রতাযুক্ত ঘর কাগজ রাখার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

পোকার আক্রমণ ও সংরক্ষণ ঃ কাগজের আর এক শত্রু হল কাগজের পোকা, যেমন—সিলভার ফিস, লেপিসমা অ্যানোবিয়াম প্যানিসিকাম এবং বুকলাইস ইত্যাদি। এছাড়া অ্যানোবিয়াম প্যাটিন্যাকস্ ও অ্যানোবিয়াম স্ট্রায়াটাম বই ও কাগজকে আক্রমণ করে ও ফুটো ফুটো করে দেয়। এরা সাধারণতঃ রাত্রে বেরিয়ে কাজ করে এবং দিনে অন্ধকার জায়গায় লুকিয়ে থাকে। অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় বসবাস করে ও খুব তাড়াতাড়ি বংশবিস্তার করতে পারে। বাঁধানো বইতে যেসব পোকা বংশবিস্তার করে ও বইয়ের ক্ষতি করে সেগুলি হল টিনিয়া পেলিওনেলা টিনিওলা বাইসেলাইলা ইত্যাদি।

এই ধরনের পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য (১) অন্ততঃ ২০ দিন অন্তর নথিগুলি ধুলো, বালি, ময়লা পরিষ্কার করা দরকার এবং মধ্যে মধ্যে এগুলি অল্প সময়ের জন্য সূর্যালোকে রাখা উচিত কারণ পোকা, ডিম ও ডিম্বাণুগুলি সূর্যালোকের সংস্পর্শে এলে মারা যায়। (২) অল্প পরিমাণ ফিনাইল দিয়ে বই রাখার জায়গা পরিষ্কার করা দরকার। D. D. T. স্প্রে করে দিয়ে বই রাখার জায়গাগুলি পোকা ও কীট মুক্ত করা যায়।

এছাড়া কীটাণুনাশক হিসাবে, বই, তালপাতার পুঁথি, ভূর্জপত্র ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত যে কোন একটি দ্রবণ যে জায়গায় এইসব নথি রাখা হয় সেই জায়গাগুলিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

দ্রবণ—১. করোসিভ সাবলিমেট—১৪.১৭ গ্রাম
কার্বোলিক অ্যাসিড—১৪.১৭ গ্রাম
মেথিলেটেড স্পিরিট—০.৫ লিটার

দ্রবণ—২. রেকটিফাইড স্পিরিট—৪.৫ লিটার
মারকিউরিক ক্লোরাইড—২৮.৩৪ গ্রাম
ফিনাইল—২৮.৩৪ গ্রাম

দ্রবণ—৩. করোসিভ সাবলিমেট—অল্প পরিমাণ
ক্রিয়োজোট—৬০ ফোঁটা
রেকটিফাইড স্পিরিট—১ লিটার

দ্রবণ—৪. ম্যালাথিয়ন—১০০ মিঃ লিঃ
ডি. ডি. টি—অল্প পরিমাণ
নুভ্যান —২৫ মিঃ লিঃ
ডায়াজানাম—২৫ মিঃ লিঃ
কেরোসিন —২ লিটার

কক্ষ বাষ্পায়ন Room Fumigation)ঃ পুঁথি, বই যেখানে ব্যাপকভাবে ছত্রাক, কীট, ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেইসব ঘর বায়ুরুদ্ধ করে তাতে ফরম্যালডিহাইড (Formaldehyde)-এর বাষ্প দিয়ে সংম্পৃক্ত করতে হবে। জলীয় ফরম্যালডিহাইডের সাথে যদি পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট (Potassium Permanganate) অল্প পরিমাণ মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আরো ভালোভাবে বাষ্পায়ন হয়। পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে ৫০০ মিঃ লিঃ জলীয় ফরম্যালডিহাইড-এর সাথে ১৭০ গ্রাম পারম্যাংগানেট একটি পোরসিলিন এর পাত্রে মিশিয়ে যদি ১০০০—১২০০ ঘনফুট কোন বায়ুরুদ্ধ ঘরে রাখা হয় তাহলে এটি যথাযথভাবে নথিগুলিকে জীবাণুমুক্ত করতে পারে। অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা ঘরটি বায়ুরুদ্ধ রাখার দরকার। খোলার পর ঘরটিতে একটি ঝাঁঝাল গন্ধ থাকতে পারে, এই গন্ধকে নির্মূল করার জন্য ঘরের মেঝেতে অল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়া ছড়িয়ে দিতে হবে যা ফরম্যালডিহাইড গ্যাসকে হেক্সামেথিলিনটেট্রামাইন (hexamethylenetetramine) গ্যাসে পরিণত করে। এটি গন্ধহীন গ্যাস। বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে জীবাণুমুক্ত করার জন্য প্যারাফরম্যালডিহাইডও ব্যবহার করা যায়।

কাগজ নিবীজিত করা (Sterilization of Paper) : এছাড়াও কাগজ নিবীজিত করার জন্য দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। একটি বাষ্পায়ন (Fumigation) পদ্ধতি—কিন্তু এতে দেখা গেছে অনেক সময় নথিটি সম্পূর্ণভাবে আনুবীক্ষণিক জীবমুক্ত করা যায় না, ফলে পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর একটি পদ্ধতি হ'ল অল্প বাষ্পচাপে কাগজটিকে ছত্রাকনাশক, কীটাণুনাশক ওষুধ দিয়ে নিষিক্ত করা এবং সিক্ত কাগজটিকে আক্রান্ত নথিটির মধ্যে রেখে জীবাণুমুক্ত করা যায়।

বাষ্পায়নাগার (Fumigation Box) :

(১) **থাইমল বাষ্প :** যেখানে একটি ঘর বা কক্ষ সম্পূর্ণভাবে বায়ুরুদ্ধ করে বাষ্পায়ন করা সম্ভব নয় সেখানে মাপমত একটি কাঠের বা স্টীলের বাক্স তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। থাইমল বাষ্প দিয়ে বাষ্পায়িত করার জন্য বই বা পুঁথি বাষ্পায়নাগারে যতটা সম্ভব খুলে খুলে বাক্সের তাকগুলিতে সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে প্রতিটি কাগজ থাইমল বাষ্পে সম্পূর্ণভাবে নিষিক্ত হয়। এখন থাইমল-ভরা পাত্র দুটি নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ডের উপরে বসিয়ে দিতে হবে ; এবং স্ট্যাণ্ডের নীচে ৪০ ওয়াট-এর বাল্‌ব লাগিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটাতে হবে। এই বাল্‌ব থেকে যে তাপ নির্গত হবে তাতে থাইমল বাষ্প তৈরী হবে এবং যেহেতু এই বাষ্প বাতাসের চাইতে ওজনে হাল্কা তাই উপরের দিকে প্রবাহিত হবে। থাইমল বাষ্পয়ানাগারে তাই থাইমল স্ফটিকযুক্ত পাত্রটি নীচে রাখা দরকার। কিছুক্ষণ বাল্‌ব জ্বালিয়ে রাখার পর বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা দরকার। থাইমল বাষ্প দিয়ে বাষ্পায়নাগারটি সম্পৃক্ত করা দরকার। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ২৮·৩৪ গ্রাম থাইমল ১৬ ঘনফুটের মধ্যে রাখা নথিপত্র নিবীজিত করতে পারে। যদি প্রত্যেক দিন ৩ ঘণ্টা করে আলো জ্বালিয়ে রাখা হয় তাহলে ১০-২০ দিন লাগতে পারে নথিগুলি নিবীজিত করতে। বাক্সটি সম্পূর্ণ বায়ুরুদ্ধ হওয়া দরকার। সম্পূর্ণভাবে নিবীজিত করার পর নথিগুলি বাইরে এনে পরিষ্কার জায়গায় রেখে নরম ব্রাশ দিয়ে এগুলির উপরিভাগ পরিষ্কার করে নিতে হবে।

(২) **ফরম্যালডিহাইড বাষ্প :** ফরম্যালডিহাইড একটি শক্তিশালী পচনবারক বা বীজাণুবারক (antiseptic) ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। প্রোটিনযুক্ত কোন বস্তু (চামড়া দিয়ে অনেক বই বাঁধানো হয়) যদি বই বা পুঁথির সঙ্গে থাকে তাহলে এই জিনিসে ফরম্যালডিহাইড বাষ্প দেওয়া যায় না কারণ তাতে প্রোটিনযুক্ত অংশটি শক্ত হয়ে যায়। অন্যক্ষেত্রে আক্রান্ত নথিগুলি যতটা সম্ভব খুলে এই বাক্সে অন্ততঃ ১০-১৫ ঘণ্টা রাখা দরকার এবং বাক্সের মধ্যে তাপমাত্রা ৬৫ ফারেনহাইট ও আর্দ্রতা ৬০ শতাংশ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জলীয় ফরম্যালডিহাইড একটি পাত্রে ভর্তি করে বাক্সের মধ্যে রাখতে হবে। জীবাণুমুক্ত করার জন্য ৬০ শতাংশ আর্দ্রতা দরকার। নিবীজিত করার পর নথিগুলি পরিষ্কার করে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা দূষণমুক্ত বায়ুতে রাখা প্রয়োজন।

ছত্রাকনাশক ঔষধ নিষিক্ত কাগজ ব্যবহার (Use of fungicide-impregnated paper)

সাদা ব্লটিং কাগজ ১০ শতাংশ থাইমলযুক্ত অ্যালকোহল দ্রবণে ডুবিয়ে বার করে নিতে হবে। ব্লটিং কাগজে লেগে থাকা অতিরিক্ত দ্রাবক (solvent) বাষ্পীভূত হয়ে কাগজের উপর থাইমলের সমান একটি স্তর সৃষ্টি করবে। এছাড়াও যদি ব্লটিং কাগজের উপর থাইমলের গুড়ো ছড়িয়ে দিয়ে একটি ইলেকট্রিক ইস্ত্রি কাগজটির উপর আস্তে আস্তে চালানো যায় তাহলে থাইমল দ্রবীভূত হয়ে যাবে এবং কাগজটি তা শোষণ করে নেবে। এখন এই থাইমলযুক্ত কাগজ বই বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত কাগজগুলির মধ্যে মধ্যে রেখে দিতে হবে তাহলে আক্রান্ত নথিগুলি নিবীজিত হবে এবং পরবর্তীকালে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

এছাড়াও জীবাণুনাশক হিসাবে প্যারাডাইক্লোরোবেঞ্জিন ও শূন্য বাষ্পায়নকক্ষে ইথিলিন অক্সাইড ব্যবহার করা যায়।

পুনরায় মাখানো আঠা ও মলিনতা-অপনোদক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার (Use of resizing and bleaching chemicals) ঃ

অনেক সময় কাগজের নথিপত্রগুলি নানান কারণে দুর্বল, স্পর্শকাতর, ও ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে। ফলে কাগজের ভৌতধর্ম ও রাসায়নিক ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় ও অবশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং কাগজের উপর নানান ধরনের দাগ দেখা যায়। এই ধরনের নথিপত্র মলিনতা অপনোদক-রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে প্রথমে পরিষ্কার করা দরকার। তারপর বিশেষ ধরনের আঠা ব্যবহার করে কাগজের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলির সংরক্ষণ করা যায়।

যে-কোন ছাপানো, খোদাই (engraving), বা কার্বন কালিতে আঁকা বস্তুকে জলে নিমজ্জিত করা যায় এবং এতে এদের কোন ক্ষতি হয় না। এই পদ্ধতিতে মলিনতা অপনোদন করার জন্য বিশেষ ধরনের একটি আলমারি (Fume Cupboard) ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে মলিনতা অপনোদন করার সব পর্যায়গুলি সুসম্পন্ন করা হয়। এই আলমারির মধ্যে যথেষ্ট আলোর বন্দোবস্ত থাকা দরকার যাতে বাইরে থেকে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি দেখা যায়। এছাড়া জল জমা থাকার ও প্রবাহিত হওয়ার বন্দোবস্ত থাকা দরকার। কারণ এই কাজের সবকটি পর্যায়ই বন্ধ আলমারির মধ্যে সম্পাদিত হবে।

মলিনতা-অপনোদক দ্রবণটি তৈরী করার জন্য ৭৫ মিলিলিটার ৪০ শতাংশ ফরম্যালডিহাইড দ্রবণ এবং ১০০ মিলি. লিটার২ শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইট-এর জলীয় দ্রবণ মিশ্রিত করতে হবে। এটি একটি এনামেল করা পাত্রে রাখতে হবে। দ্রবণটি ক্রমশঃ হলুদ বর্ণে রূপান্তরিত হবে কারণ এর থেকে ক্লোরিন ডাই-অকসাইড তৈরী হয় যা সক্রিয় ভবে মলিনতা পরিষ্কার করতে পারে।

এই ধরনের কাগজের একটি পাতা কাঁচের প্লেটের উপর রেখে এটি দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ দাগগুলি পরিষ্কার না হয়। দাগগুলি পরিষ্কার

করার জন্য ৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। প্রয়োজনমত দ্রবণের গাঢ়তা (concentration) বাড়ানো কমানো যেতে পারে। এই দ্রবণের সাথে ১০ মিলি লিটার লিসাপল মিশিয়ে দেওয়া যায়।

মলিনতামুক্ত, দাগমুক্ত হওয়ার পর কাঁচের প্লেটটিকে নিয়ে প্রবহমান জলের নীচে অন্ততঃ ১৫ মিনিট রাখতে হবে যাতে সোডিয়াম লবণ সম্পূর্ণ বেরিয়ে যায় এবং এর মাঝখানে অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করার দরকার নাই। এইবারে ভেজা কাগজ কাঁচের প্লেটসহ তুলে নিয়ে শুকনো করতে হবে। এতে দেখা যায় উপরিভাগের মলিনতা, জলের দাগ (water stains), ফক্স্-মারক্স এবং ছত্রাকজাতীয় প্রাণীর দাগ পরিষ্কার হয়। অথচ কাগজটি খুব সাদা হয়ে যায় না।

পরিষ্কার কাগজটিকে এবারে আবার আঠা মাখাতে হবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এটি করা যায়। ভালো জিলাটিন-খণ্ড দ্রবীভূত করে আঠা তৈরী করা যায়। ১·৫-২·৫ গ্রাম জিলাটিন ১ লিটার জলে মিশিয়ে দিতে হবে এবং আস্তে আস্তে নরম ব্রাশ দিয়ে কাগজের উপর লাগিয়ে দিতে হবে। যদি কাগজটি খুব পুরু হয় তাহলে এই দ্রবণে ডুবিয়েই তুলে নিতে হবে। এর পর এটি শুকনো করে নিতে হবে।

স্তরায়ন ঃ (Lamination) ঃ নানান কারণে কাগজ অনেক সময় স্পর্শকাতর ও ভঙ্গুর হয়। তখন এগুলিকে আবার শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। এই পুনরায় শক্তিশালী করার জন্য সেলুলোজ অ্যাসিটেট ও টিসু কাগজ দিয়ে অথবা অন্য ভাবে স্তরিত (Laminate) করার পদ্ধতিকে স্তরায়ন (Lamination) বলা হয়। এটি করার জন্য নানান বস্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে ঃ (১) কাগজটির উভয় দিকে পাতলা বিশেষভাবে তৈরী সিল্কে ডেক্সট্রিন জাতীয় আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়ে স্তরায়ন ও সংরক্ষণ করা যায়। (২) এছাড়া ব্যাপকভাবে প্রচলিত পদ্ধতি হ'ল কাগজটির দুদিকে সেলুলোজ অ্যাসিটেট কাগজ (Cellulose acetate foil) তারপর আবার দুইখণ্ড টিসু কাগজ দুদিকে দিয়ে একটি বিদ্যুৎচালিত গরম ইস্ত্রি অল্প চাপ দিয়ে এক দুবার চালালেই এটি কাগজের গায়ে লেগে যায় এবং মিশে যায়। সিল্ক্ ব্যবহার করলে আলাদা কোন যান্ত্রিক সহায়তার দরকার হয় না, তবে কাগজটির ওজন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। এছাড়াও এতে যে আঠা ব্যবহার করা হয় তার জন্য লিখিত অংশগুলির স্পষ্টতা অনেক সময় নষ্ট হয়। এধরনের নথির ছবি তোলা যায় না ও প্রয়োজন বোধ করলে সিল্কটিকে সরানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ২০-২৫ বছর পর সিল্কটিকে সরিয়ে নতুন সিল্ক লাগানো দরকার। সেলুলোজ অ্যাসিটেট কাগজ ব্যবহার করলে অনেক সুবিধা হয়, যেমন এগুলি স্বচ্ছ তাই লিখিত অংশের স্পষ্টতা নষ্ট হয়না ও মূল নথির সামান্যতম ক্ষতি না করেই সেলুলোজ অ্যাসিটেট কাগজ সরিয়ে দেওয়া যায়। অ্যাসিটোন গাহ (Acetone bath)-র মধ্যে যদি এই ধরনের নথি ডুবিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে সেলুলোজ অ্যাসিটেট কাগজটি দ্রবীভূত হয়ে যাবে।

এতে নথিটির কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না যদিও ওজন খুব সামান্য বাড়ে।

Barrow এই স্তরায়নকে দুটি পর্য্যায়ে সম্পাদিত করার কথা বলেছেন—(১) কাগজ থেকে অম্লত্ব পরিষ্কার করা, (২) স্তরায়ন।

কাগজের অম্লত্ব পরিষ্কার (Removal of acidity of the paper) : পর পর দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করার দরকার, যার দ্বারা কাগজে যদি অতিরিক্ত পরিমাণ অম্লভাব থাকে তা মুক্ত করা ও একই সঙ্গে আবার যাতে কোনভাবে অম্ল দ্বারা আক্রান্ত না হয় তা সুনিশ্চিত করা যায়। প্রথমে কাগজটিকে তামার (Copper) তৈরী জালির মধ্যে রেখে এটি একটি সম্পৃক্ত চুন-জলের দ্রবণের মধ্যে অন্ততঃ ২০মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। অবশ্য সময় কম বেশি করা নির্ভর করে বস্তুর অম্লত্বের পরিমাণ কত তার উপর। এখন কাগজটির অম্লত্ব প্রশমিত হবে, যদিও কাগজে তখন কিছু অতিরিক্ত পরিমাণ চুন থেকে যাবে। এর পর এটি ০'২০ শতাংশ ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট দ্রবণে স্থানান্তরিত করা দরকার। এতেও ১৬-২০ মিনিট রাখতে হবে। এই দ্রবণে অতিরিক্ত চুন ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে বা চকে পরিণত হয়, এবং এটি কাগজের উপর জমে থাকে। এই জমে থাকা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পরবর্ত্তীকালে কাগজকে অম্ল জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ থেকে রক্ষা করে।

স্তরায়ন : অম্ল-মুক্ত কাগজটিকে শুকনো করার দরকার তারপর দুই খণ্ড সেলুলোজ অ্যাসিটেট কাগজের মধ্যে রেখে আবার দুই খণ্ড টিসু কাগজ (Tissue paper) দুদিকে দিতে হবে এবং এটি ব্যারো স্তরায়ন (Barrow laminator) যন্ত্রে চাপাতে হবে। কাগজগুলিকে আগে অল্প তাপ দেওয়া হয় তারপর তাপ ও চাপে (তাপমাত্রা ৩১৫-৩২৫° ফারেনহাইট) অল্প সময় থেকে নথিটি যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে। অ্যাসিটেট কাগজের মত টিসু কাগজও দ্রবীভূত হয় স্তরায়ন পদ্ধতিতে এবং সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র লেখাগুলি আরো স্পষ্ট হতে দেখা যায় কারণ স্তরিত হওয়ার ফলে নথিটির প্রতিসরাংক (Refractive index) বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া রোটারি ল্যামিনেশন, হাইড্রলিক ল্যামিনেশন, মোরেন মাইপোফলিক জেনোথার্ম, পোষ্টালিপ ডুপ্লেকস্ ডিসপ্রো প্রভৃতি পদ্ধতিতে স্তরায়ন করা যায়।

কালির ব্যবহার (Use of Ink) : কাগজে লেখার মাধ্যম হিসাবে কালি বহুদিন ধরেই ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ থেকে কার্বন কালির ব্যবহার দেখা যায়। কার্বনের সূক্ষ্ম গুঁড়ো জল, তেল বা গাম (gum) অথবা গ্লু (glue)-তে মিশিয়ে কালি তৈরী করা হয়। এই কালির লেখাগুলি পরিষ্কার দেখা যায় এবং রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা খুব বেশি ক্ষতি হতে দেখা যায় না।

কার্বন কালি সাধারণতঃ অল্প পরিষ্কার করলে খুব বেশি বিবর্ণ বা নষ্ট হয়ে যায় না কিন্তু যদি জল লাগে তাহলে ধুয়ে যেতে পারে। তাই পরবর্ত্তীকালে আয়রন ইংক (Iron Ink) তৈরী ও ব্যবহার করা শুরু হয়। এই কালি পাওয়া যায় লোহার

উপস্থিতিতে গ্যালোটনিক অ্যাসিড (Gallotonic acid) থেকে। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকেও এই কালি পাওয়া যায় কিন্তু এর গুণগত মান আলাদা হয়। কালির কালো অংশটি আলাদা করা যায়না এবং কখনও এটি অল্পে বাদামী বা হলুদ বর্ণে এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যার ফলে লেখাগুলি পড়া বেশ কষ্টসাধ্য হয়।

এরপর আয়রন গল ইংক ব্যবহার করা হয়েছে লোহা-লবণ (Iron-salt) যেমন গ্রীন্ ভিট্রিয়ল ইত্যাদিকে ট্যানিন্স্ (tannins)-এর সাথে মিশিয়ে। এই কালিতে যে অম্লভাব থাকে, তার কারণ ট্যানিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিড-এর পরিমাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়। যেখানে অম্লতার পরিমাণ বেশি হয় সেখানে কাগজ ফুটো ফুটো হয়ে যায়। এমন কি কাগজটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আয়রনযুক্ত কালি জলের সংস্পর্শে এলে বিবর্ণ হয় ও অদৃশ্য হয় বা মিলিয়ে (fugitive) যায়। এই ধরনের পুরানো নথি সংরক্ষণ করার জন্য ও কালি সুরক্ষার জন্য ৫ শতাংশ সেলুলয়েডকে ৫০ ভাগ অ্যাসিটোন ও ৫০ ভাগ অ্যামাইল অ্যাসিটেট দ্রবণে দ্রবীভূত করে সেলুলয়েড দ্রবণ তৈরী করতে হবে; এবারে একটি নরম ব্রাশ দিয়ে এই লেখার উপর সেলুলয়েড দ্রবণ লাগিয়ে দিতে হবে। এর ফলে লেখার উপর নাইট্রোসেলুলোজের একটি স্তর তৈরী হলো এবং এটি লেখাটিকে রক্ষা করবে। পরে দরকার হলেই এটি দ্রাবক (Solvent) ব্যবহার করে পরিষ্কার করে দেওয়া যায় ও একটি ব্লটিং কাগজ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া যায়।

যেহেতু কার্বন কণা দ্রবীভূত হয় না, তাই যখন কার্বন কণা কোন মাধ্যমে (medium) মিশিয়ে কালি তৈরী হয় এবং এই কালি কাগজের উপর ব্যবহার করা হয় তখন কালির বন্ধনকারী মাধ্যম (binding medium)-কে কাগজ শোষণ করে নেয় ফলে শুধু কার্বন কণাগুলি কাগজের উপরে আটকে থাকে। কিছুদিন পর দেখা যায় কার্বন কণাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে।

অনেক সময় বহু নথি পাওয়া যায় যার লেখাগুলি হলুদ বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে। এগুলিতে লৌহ কণা আছে ধরে নেওয়া যায়। সিপিয়া (Sepia) থেকে যে কালি পাওয়া যায় যা ক্যাটল ফিস্ ইংক্ বলা হয় এবং বীচউড্ থেকেও যে কালি তৈরী হয় এগুলি সবই কয়েক বছর পর হলুদ বর্ণে রূপান্তরিত হয় যদি না সময়মত সংরক্ষণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এছাড়া পুরানো নথিগুলিতে নানান রঙীন কালির ব্যবহার দেখা যায়। লাল কালির স্থায়িত্ব অনান্য রঙীন কালির চাইতে বেশি। নানান্ ভাবে নানা জায়গা থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছে। ম্যাডার ও লগউড্ থেকে কালি পাওয়া যায়। কচি নীল (Cochineal) পোকা থেকে, খোলাযুক্ত প্রাণী (Shell-fish) থেকে কালি তৈরী ও ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সব কালি সহজে বিবর্ণ হয়ে যায় বা মিলিয়ে যায় সেগুলি রক্ষার জন্য সব সময় নাইট্রোসেলুলোজ লাগিয়ে রক্ষা

করাও ঠিক নয় কারণ অনেক সময় এই দ্রবণ ব্যবহার করার ফলে রং চটে যেতে দেখা যায়।

প্রায় অদৃশ্য হওয়া লেখা বা বিবর্ণ হওয়া নথি পাঠ করা ঃ বহু নথি পাওয়া যায় যা পড়া যায়না তাই এগুলি পড়ার জন্য নিম্নলিখিত জিনিষের সাহায্য নেওয়ার দরকার যেমন ঃ আলো পরিস্রাবক (light filter) এবং অতিবেগুনী রশ্মি (Ultra-violet ray)। যদি অন্ধকার ঘরে এই ধরনের কোন নথির উপরা অতিবেগুনি রশ্মি ফেলা যায় তাহলে অস্পষ্ট লেখা অনেক সময় পাঠযোগ্য হয়। যদি খোদাই করা কোন নথি অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে পাঠ করা যায় তাহলে এই ধরনের নথির ছবি নিয়েও পাঠ করা সম্ভব। অতিবেগুনী রশ্মি ছাড়াও অনেক সময় অবলোহিত রশ্মি (Infra-red) ও বিবর্ণ এবং প্রায় অদৃশ্য হওয়া লেখা পড়ার কাজে ভালো ফল দেয়। আলো পরিস্রাবক ব্যবহার করেও অদৃশ্য বা বিবর্ণ লেখা পাঠ করা যায়।

দগ্ধ নথি পাঠ করা ঃ আগুনে পুড়ে যাওয়া কাগজের নথি সাধারণতঃ অঙ্গারে পরিণত হয়। এগুলি পাঠ করার জন্য নথিটি দিনের আলোতে রেখে ছবি নেওয়া যায় ও পাঠ করা যায়। অবশ্য এই ছবি নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি ঘন নীল সুগ্রাহী (high contrast blue sensitive) প্লেট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও অতিবেগুনী বা অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে ছবি নেওয়া যায়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে লেখাটি পাঠযোগ্য করার জন্য যদি কাগজটি ৫ শতাংশ সিলভার নাইট্রেট (Silver nitrate) দ্রবণে অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখা যায় তাহলে কাগজটি ধূসর বা ছাই রং এ পরিণত হবে, এবং লেখাগুলির রং কালো হবে যা পরিষ্কার বোঝা যাবে। Taylor এবং Walls এই জাতীয় নথি পাঠযোগ্য করার জন্য কতকগুলি পরীক্ষা করেছেন—এতে নথিটিকে নিয়ে প্রথমে অ্যালকোহল মিশানো ২৫ শতাংশ ক্লোর্যাল-হাইড্রেড দ্রবণ কয়েক বার লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর ৬০ সেণ্টিগ্রেড তাপে শুকনো করতে হবে। প্রত্যেক বার প্রলেপ দেওয়ার পরই শুকনো করার দরকার। শুকনো নথিটিকে এবারে ১০ শতাংশ গ্লিসারিন লাগিয়ে আবার শুকনো করতে হবে। ছবি নিতে হবে একটি বর্ণহীন সুগ্রাহী প্লেট ব্যবহার করে। এতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গেছে এবং নথিটি পাঠ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রিণ্ট, ড্রইং ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ঃ প্রিণ্ট, ড্রইং ও পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি পরিষ্কার, জীর্ণ-সংস্কার (repair), সংরক্ষণ এবং সব শেষে ফ্রেমে লাগিয়ে সুরক্ষিত করার আগে এই ধরনের কাগজের নথি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা দরকার।

সংরক্ষণ করার আগে কতকগুলি পরীক্ষা ঃ

যে নথি সংরক্ষণ করা দরকার সেটি প্রথমে উত্তীর্ণ (transmitted) ও প্রতিফলিত (reflected) রশ্মিতে লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করে নথিটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। নথিটি যদি একেবারে ভঙ্গুর ও স্পর্শকাতর না হয় তাহলে

হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কতখানি মচমচে (crackle) হয়েছে তা অনুমান করা যায়। এছাড়া এই ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার ঃ—

(১) যদি এই ধরনের নথি নরম, স্পঞ্জের মত ও রন্ধ্রবহুল হয় তাহলে জলে বা অন্য কোন তরলে নিমজ্জিত করা যাবেনা। নথিগুলি যদি ভেজা অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে এগুলি আয়তনে বড় হবে এবং নথিগুলির বন্ধনকারী মাধ্যম নরম ও দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য, তাই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। (২) যদি নথিটির তলদেশ (surface) ফুটো ফুটো হয়ে যায় তাহলে জলে নিষিক্ত করে কোন পরীক্ষা করা যাবে না। এই ধরনের নথির লেখা অংশ বিবর্ণ হয়ে যায় ও স্পষ্টতা নষ্ট হয়।

এই ধরনের নথির দুর্বল অংশগুলি নির্ণয়, ভাঁজপড়া ও গর্ত হয়ে যাওয়া অংশগুলি নথিভুক্ত করা দরকার। (৩) নথিগুলি কি অবস্থায় ছিল ও আছে এটি প্রিণ্ট, ড্রইং না চিত্রিত পাণ্ডুলিপি তা চিহ্নিত করা, কালির রং ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

অবলম্বন ও ভারণিস অপসারিত করা

(১) **পৃষ্ঠদেশ থেকে কার্ডবোর্ড সরিয়ে নেওয়া ঃ** বহু ক্ষতিগ্রস্ত প্রিণ্ট বা ড্রইং দেখা যায় যেখানে পৃষ্ঠদেশ কার্ডবোর্ড দিয়ে আটকানো আছে। কিন্তু সংরক্ষণ করার জন্য কার্ডবোর্ডটিকে ড্রইং বা প্রিণ্ট থেকে আলাদা করে নিতে হবে। এই সব ক্ষেত্রে পিছনের দিক থেকে কার্ডবোর্ডের একটি দুটি স্তর প্রথমে ছুরি দিয়ে তুলে তারপর যদি ক্ষত দিকটি একটি ফুটন্ত জলের কেটলির উপর ধরা যায় তাহলে শক্ত বোর্ডটি আস্তে আস্তে নরম হয়ে যাবে ও কিছুক্ষণ পর কেটলির উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বোর্ডটিকে প্রিণ্ট, ড্রইং বা চিত্রিত পাণ্ডুলিপি থেকে আলাদা করে নেওয়া সম্ভব। বোর্ড অপসারিত হওয়ার পর দেখা যায় নথিটি বোর্ডে যে আঠা দিয়ে আটকানো ছিল সেই আঠা লেগে আছে। তাই নথিটিকে একটি পরিষ্কার ব্লটিং পেপারের উপর রেখে অল্প ভেজা নরম স্পঞ্জ দিয়ে আঠা লেগে থাকা অংশগুলিতে ঘষা দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(২) **পৃষ্ঠদেশ থেকে মোটা কাগজের অবলম্বন অপসারিত করা ঃ** যখন মোটা কাগজের উপর ক্ষতিগ্রস্ত নথিটি আটকানো থাকে তখন এটি অপসারিত করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই ধরনের অবলম্বন সরানোর জন্য নথিটিকে একটি পরিষ্কার কাঁচের প্লেটের উপর রাখতে হবে এবং আঁকা বা লেখা অংশটিকে উল্টে কাঁচের উপরে রেখে ভালো ভাবে আটকে দিতে হবে। এখন পেছনের দিকের মোটা কাগজ অপসারিত করার জন্য গরম জলে নরম স্পঞ্জ ভিজিয়ে ঘষতে হবে। কিছুক্ষণ ঘষার পর কাগজ ও আঠা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(৩) **পশ্চাদ্দেশ থেকে ক্যানভাস অপসারিত করা :** যখন ক্ষতিগ্রস্ত কোন কাগজের প্রিণ্ট, ড্রইং ইত্যাদি ক্যানভাসের উপর আটকানো থাকে তখন ফ্রেমটিকে কেটে আলাদা করে নিতে হবে এবং নথিটিকে কাঁচের প্লেটের উপর উল্টে রাখতে হবে যাতে ক্যানভাসটি উপরের দিকে থাকে। এই অবস্থায় নরম স্পঞ্জ গরম জলে ভিজিয়ে তারপর ক্যানভাসটিকে আর একটি ভেজা কাঁচখণ্ডের উপর এমন ভাবে তুলে এনে রাখতে হবে যাতে অঙ্কিত দিকটি উপরের দিকে থাকে। এইভাবে বেশ কিছু সময় রাখার পর ক্যানভাসের সুতো ও আঠা নরম হয়ে আলগা হয়ে যাবে তখন এটির চিত্রিত দিকটি ব্লটিং পেপারের উপর রেখে একে একটি কাঁচের খণ্ডের উপর রাখতে হবে। এখন ক্যানভাসের এক কোণাকুণি দিক থেকে সাবধানে ও আস্তে আস্তে এক একটি করে সুতো বার করে নিতে হবে। যদি কোথাও আটকায় তাহলে গরম জলে স্পঞ্জ নিষিক্ত করে আবার এই জায়গায় লাগাতে হবে এবং এই ভাবে ক্যানভাস ও আঠা অপসারিত করা যায়।

(১) **ভারনিস্ অপসারিত করা :** দুর্বল, ক্ষতিগ্রস্ত নথির সংরক্ষণ করার জন্য অনেক সময় ভারনিসের স্তরটিকে অপসারিত করার প্রয়োজন হয়। ভারনিস্ বিশেষ করে তেলযুক্ত ভারনিস অপসারিত করা বেশ কঠিন ব্যাপার। কারণ প্রিণ্ট, ড্রইং বা চিত্র যত ‘ ’ানো হয় ভারনিস্ তত শক্ত ও কঠিনভাবে আটকে থাকে। স্পিরিট দিয়ে ভারনিস্ অপসারিত করা যায় কিন্তু এতে যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। এটি করার জন্য অল্প পরিমাণ পরিষ্কার তুলো স্পিরিটে ভিজিয়ে নিয়ে ভারনিসের উপর ঘষতে হবে। কিছুক্ষণ পর স্পিরিট শুকনো হয়ে যাবে। এখন আবার পরিষ্কার তুলো টারপেনটাইন (Turpentine)-এ ভিজিয়ে আস্তে আস্তে ঘষলে ভারনিস্ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। তবে কি ধরনের দ্রাবক ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে তার জন্য প্রথমে অল্প একটু অংশে পরীক্ষা করার দরকার। অনেক সময় শুধু মেথিলেটেড স্পিরিট লাগিয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব। যদি এতে কাজ না হয় তাহলে ০'৪৪ শতাংশ অ্যামোনিয়া ১:৫০ জল দিয়ে ব্যবহার করা যায়। প্রিণ্টটিকে একটি কাঁচের উপর রেখে সাবধানে, যে ধরনের দ্রাবক ব্যবহার করলে ভারনিস্ অপসারিত হবে তা ব্রাশ বা তুলো দিয়ে লাগাতে হবে। এবং যদি একবারে ভারনিস্ অপসারিত না করা যায় তাহলে দু'তিন বার লাগালে ভারনিস্ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভারনিস্ মুক্ত হওয়ার পর প্রিণ্টটি ভালোভাবে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা দরকার। অবশ্য যদি জল ব্যবহার করলে কালির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে বিকল্প পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে। জল দিয়ে পরিষ্কার করার পর মলিনতা-অপনোদক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার দরকার হতে পারে।

প্রিণ্ট, ড্রইং, পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করা

(১) **শুষ্ক পদ্ধতি :** যদি এই ধরনের নথির উপর ছত্রাক জাতীয় প্রাণীর বংশবিস্তার দেখা যায় তাহলে আক্রান্ত অংশগুলি থেকে নরম ব্রাশ দিয়ে ছত্রাকগুলি

আস্তে আস্তে তুলে নেওয়া যায়, তবে দেখা দরকার যাতে অবশিষ্ট কিছু প্রাণী না থেকে যায়। থাইমল বা কার্বন ডাই-সালফাইড বাষ্পায়নাগারে রেখে ছত্রাক ও অন্যান্য আনুবীক্ষণিক প্রাণীর বংশবিস্তার রোধ করা যায়। এ ছাড়া কিছু জৈব দাগ (Organic stain) পরিষ্কার করার জন্য পেট্রল ব্যবহার করা যায়।

(২) **ভিজিয়ে পরিষ্কার করা ঃ** যদি শুষ্ক পদ্ধতিতে এগুলি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা না যায় তাহলে জলে নিমজ্জিত করে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব। প্রথমে নথিটিকে একটি কাঁচের খণ্ডের উপর রেখে তারপর কাচসহ নথিটি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দিতে হবে। কাগজটিকে কোণায় ধরে কখনো জল থেকে তুলে আনার চেষ্টা করা একেবারেই উচিত নয় তাতে নথিটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই অবলম্বনসহ ভেজা নথি বার করে নিয়ে শুকনো করতে হবে. শুকনো করার পর অল্প গরম জলের পাত্রে আবার অবলম্বন সহ নথিটিকে ডুবিয়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ রাখার পর বার করে এনে শুকনো করতে হবে এবং এইভাবে ঠাণ্ডা ও গরম জলমিশ্রণে ডুবিয়ে ছত্রাক ও নানান ধরনের জৈব দাগ পরিষ্কার করা যায়।

সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা ঃ যেখানে সাধারণভাবে প্রিন্টটিকে পরিষ্কার রাখার দরকার সেই সব ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ সাবান ব্যবহার করা যায়। অবশ্য ব্যবহার করার আগে নথির ক্ষুদ্র একটি জায়গাতে প্রথমে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। যদি এতে সুফল পাওয়া যায় তাহলেই সমস্ত প্রিণ্টটিতে সাবান ব্যবহার করা যাবে। প্রথমে কাঁচের প্লেটের উপর প্রিণ্টের পিছনের দিকটি রেখে তারপর এটির উপর একটি ভিজে ব্লটিং কাগজ চাপা দিতে হবে। নথির পিছনের দিক থেকে অল্প সাবানের ফেনা ব্রাশ দিয়ে লাগাতে হবে। যদি ছবির পেছনের দিকটি এই পদ্ধতিতে পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে সামনের দিকটিও একই ভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব। এই ভাবে পরিষ্কার করার পর জল দিয়ে প্রিণ্টটি ধুয়ে নিতে হবে যাতে সাবানের কোন অবশিষ্ট অংশ এতে না থেকে যায়।

ভাঁজমুক্ত ও শুকনো-করা ঃ ভেজা প্রিণ্টটিকে ভাঁজমুক্ত করার জন্য একটি কাঁচের টেবিলের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে উপরের অঙ্কিত দিকটি নীচে থাকে এবং পিছনের দিকে ব্লটিং পেপারের প্যাড চাপা দিতে হবে। এই চাপা দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত জলীয় অংশ নিঃশোষিত হবে এবং প্রিণ্টটি ভাঁজমুক্ত হবে।

মলিনতা-অপনোদন পদ্ধতি (Bleaching Process) ঃ যখন শুষ্ক পদ্ধতিতে বা ভিজিয়ে প্রিন্ট, ড্রইং ও পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করা যায় না তখন মলিনতা-অপনোদক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হবে। সাধারণত ক্লোরিন ডাই-অক্সাইড, হাইপোক্লোরাইট্স্, সোডিয়াম পারবোরেট, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, পটাসিয়াম পারম্যংগানেট, ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় এবং এগুলি জারক হিসাবে

ব্যবহৃত হয়। বিজারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয় সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট ও সোডিয়াম ফরম্যালডিহাইড সালফোঅকসীসলেট।

জারক (Oxidizing) রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে মলিনতা-অপনোদন বা দাগ পরিষ্কার করার জন্য যেগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি নথির উপর যে মলিন অংশ থাকে বা দাগ থাকে সেই অংশগুলিকে জারিত করে একটি রংহীন যৌগতে রূপান্তরিত করে যা সহজে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়।

এছাড়া বিজারক (Red icing) রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে যেগুলি ব্যবহার করা হয় এগুলি সাধারণতঃ দাগ বা রংগুলিকে বিজারিত করে ও রংহীন যৌগে পরিণত করে। এটি উপরিভাগে অবস্থান করে তাই সহজে পরিষ্কার করা সম্ভব হয়।

জারক ও বিজারক পদার্থ ব্যবহার করার সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। তবে জারন (Oxidation) পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা সব চেয়ে সহজ। যদি এই নথিটিকে সূর্যালোকে কিছুক্ষণ রাখা যায় তাহলে যে পদ্ধতিতেই মলিনতা-অপনোদন করা হোক না কেন এতে নথির উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং যদি ঠিক ঠিক ভাবে মলিনতা অপনোদন না করা হয় তাতেও নথি দুর্বল এমনকি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় সমস্ত ধরনের সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার। মলিনতা-অপনোদন পদ্ধতিতে দাগ বা মলিনতা পরিষ্কার করার পরই অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ যা নথির উপর জমে থাকে তা সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করার দরকার।

হাইপোক্লোরাইটের ব্যবহার : মলিনতা-অপনোদক হিসাবে যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাতে দেখা যায় ক্লোরিনের উপস্থিতির জন্য কাগজের উপর রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং এই ক্লোরিন তৈরী হয় সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট অথবা ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট থেকে। ক্যালসিয়াম যৌগকে আমরা ব্লিচিং পাউডার বলি। সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটকে ক্লোরিনেটেড সোডা বলা হয়। সাধারণত ব্যাণিজ্যিক কাজে যা ব্যবহার করা হয় তাহলো ৯০ শতাংশ ক্লোরিনেটেড সোডা। এটি একটি রঙীন কাচের পাত্রে ঠান্ডা জায়গায় রাখার দরকার। ব্যবহার করার সময় প্রয়োজনমত জল মিশিয়ে তরল করে নেওয়া যায়। ব্লিচিং করার জন্য যেহেতু নথিটিকে নাড়াচাড়া কর্যার দরকার তাই এটি নাড়চাড়া করার কাজে একটি সহায়ক বোর্ড ব্যবহার করা উচিত। ১ সি সি রাসায়নিক পদার্থের সাথে ২০ সি সি জল মিশিয়ে এটি তৈরী করা হয় এবং যথেষ্ট বিবেচনা করার পরই শুধু রাসায়নিক পদার্থ বেশি ঘন করে ব্যবহার করা যায়, তবে কোন অবস্থাতে এটি ৬ : ২০ (৬ ভাগ রাসায়নিক পদার্থ ২০ ভাগ জল) এর বেশি যাতে না হয় তা দেখতে হবে। কাগজটিতে যে কালি ব্যবহৃত হয়েছে তা যদি আয়রন গলইংক হয় তাহলে মলিনতা অপনোদন করার পূর্বে এই লেখাগুলি সুরক্ষার জন্য ৩% নাইট্রোসেলুলোজ (Nitrocellulose) দ্রবণ লেখার উপরে ভালো ভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। এই

দ্রবণ শুকনো হলে তারপর মলিনতা-অপনোদক দ্রবণে কাগজটি অবলম্বনসহ নিমজ্জিত করতে হবে এবং পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর কাগজটি বার করে ২ শতাংশ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। যখন এই কাজে হাইপোক্লোরাইট ব্যবহার করা হয় তখন সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন কারণ তাতে কাগজটি সম্পূর্ণ ভাবে ক্লোরিন-মুক্ত হয়।

(২) **ক্লোরামাইন-টি ব্যবহার ঃ** ক্লোরামাইন-টি খুবই মৃদু মলিনতা-অপনোদক রাসায়নিক পদার্থ। এটি ব্যবহার করার সুবিধা হলো এটি কাগজে লাগানোর পর খুব বেশি সময় এদের মলিনতা-অপনোদক সত্তা থাকে না এবং কোন ক্ষতিকারক বস্তুও কাগজের উপর জমা হয় না। এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, জল-রং ব্যবহৃত হয়েছে এমন সমস্ত নথিতে ব্যবহার করা যায়। ক্লোরামাইন-টি সাধারণতঃ পাওয়া যায় সাদা পাউডার হিসাবে ; তাই ব্যবহার করার আগে প্রয়োজন মত দ্রবণ তৈরী করে নিতে হবে। সাধারণত ২ গ্রাম পাউডারের সাথে ১০০ মিলিলিটার জল মিশিয়ে দ্রবণ তৈরী করা হয়। যে সব জায়গায় যথেষ্ট দাগ বা মলিনতা আছে সেই সব জায়গায় একটি নরম ব্রাশ দিয়ে দ্রবণটি লাগিয়ে দিতে হবে। এবারে এই জায়গায় একটি ব্লটিং পেপারের প্যাড দিয়ে তার উপরে একটি কাঁচের খণ্ড চাপিয়ে দিতে হবে। যদি প্রথম বার ক্লোরামাইন-টি ব্যবহার করলে দাগ পরিষ্কার না হয় তাহলে দু-তিন বার এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা যায় এবং সুফল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম ক্লোরাইটের ব্যবহার ঃ মলিনতা-অপনোদক হিসাবে এটি ব্যবহার করা যায়, তবে এর জন্য বিশেষ যান্ত্রিক বন্দোবস্ত থাকার দরকার।

রঙীন ও সূক্ষ্ম প্রিন্টের মলিনতা অপনোদন ঃ রঙীন ও সূক্ষ্ম অনেক অমূল্য নথি পাওয়া যায় যা হাইপোক্লোরাইট দ্রবণে ডুবানো যায় না, কিন্তু এই ধরনের দাগ-যুক্ত নথিগুলি দাগমুক্ত ও পরিষ্কার করা দরকার। এগুলি পরিষ্কার ও দাগমুক্ত করার জন্য, যে দাগগুলি বিশেষভাবে নথিটির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করছে শুধু সেটি পরিষ্কার করার কাজে হাত দিতে হবে। একটি কাঁচের প্লেটের উপর উল্টে নথিটি রেখে ভেজা ব্লটিং পেপারের প্যাড দাগটির উপর রেখে দিতে হবে এবং পরে অল্প পরিমাণ খুব লঘু হাইপোক্লোরাইট দ্রবণ ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। হাইপোক্লোরাইট দ্রবণ ব্লটিং পেপারের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে দাগগুলির পেছনের দিক থেকে কাজ করবে। এই ভাবে নথিপত্র দাগমুক্ত করা যায়। হাইপোক্লোরাইট ব্যবহার করলে নথির উভয় দিকটি সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। ধোয়ার সময় নথিটি একটি নমনীয় অবলম্বন-এর উপর রাখতে হবে যাতে দ্রবণটি গড়িয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। সম্পূর্ণ দাগমুক্ত করে নথিটি সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার পর ভালোভাবে শুকনো করে নিতে হবে।

বিশেষ ধরনের মলিনতা-অপনোদক রাসায়নিক দ্রাবকের ব্যবহার (Use of specific bleaching agents and solvents) :

পেন্ট : পেন্ট পরিষ্কার করার জন্য অ্যালকোহল ও বেঞ্জিনের মিশ্রণ অথবা পাইরিডাইন (Pyridine) ব্যবহার করে তারপর জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়।

ল্যাকার ও ভারনিস : মেথিলেটেড স্পিরিট, পাইরিডাইন, তরল অ্যামোনিয়া, এর মধ্যে যে কোন একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ল্যাকার বা ভারনিস পরিষ্কার করা যায়।

গালা (Shellac) : হেকসেন (Hexane), টলিউইন (Toluene), অথবা বেঞ্জিন ও টলিউইনের মিশ্রণ ব্যাবহার করে গালার দাগ পরিষ্কার করা যায়।

তেল (Oil) : হেকসেন, টলিউইন, কার্বন-টেট্রাক্লোবাইড অথবা বেঞ্জিন-এর মধ্যে যে কোন একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে তেলের দাগ পরিষ্কার করা সম্ভব।

চর্বি (Fats) : অ্যালকোহল, পেট্রোলিয়াম ইথার (Petroleum ether), পাইরিডাইন পেট্রল, হেকসেন, অথবা টলিউইন যে কোন একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে চর্বির দাগ পরিষ্কার করা যায়।

মোম (Wax) : পেট্রল, হেকসেন অথবা টলিউইন ব্যবহার করা যায় মোমের দাগ পরিষ্কার করতে।

রেজিন (Resin) : অ্যালকোহল বা পাইরিবডাইন ব্যবহাব করে রেজিন-জাতীয় পদার্থের দাগ পরিষ্কার করা যায়।

আঠাযুক্ত ফিতে (Adhesive tape) : কার্বন টেট্রাক্লোরাইড অথবা বেঞ্জিন ব্যবহার করে আঠা দেওয়া ফিতের দাগ পরিষ্কার করা যায়।

সেলোটেপ : হেকসেন ও টলিউইনের মিশ্রণ অথবা বেঞ্জিন ও টলিউইনের মিশ্রণ ব্যবহার করে এই দাগ পরিষ্কার করা যায়।

ডুকো সিমেন্ট : অ্যাসিটোন ব্যবহার করে পরিষ্কার করা যায়।

রাবার সিমেন্ট : টলিউইনের সাথে বেঞ্জিন মিশিয়ে যে দ্রবণ তৈরী হবে তাতে রাবার সিমেন্টের দাগ পরিষ্কার করা সম্ভব।

গ্লু : গরম জল দিয়ে গ্লু পরিষ্কার করা যায়।

আঠা : জল দিয়ে নরম করে নিয়ে আঠা পরিষ্কার করা যায়।

আলকাতরা (tar) : বেঞ্জিন, পেট্রল, পাইরিডাইন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ব্যবহার করে আলকাতরার দাগ পরিষ্কার করা যায়।

মৃদু দাগ : ইথাইল অ্যালকোহল অথবা বেঞ্জিন লাগিয়ে যে কোন হাল্কা দাগ পরিষ্কার করা যায়।

চা ও কফি (Tea and Coffee)-র দাগ : পটাসিয়াম পারবোরেট লাগিয়ে চা কফির দাগ পরিষ্কার করা যায়।

জং (**Rust**) ঃ ৫ শতাংশ অকজ্যালিক অ্যাসিড, দিয়ে জং পড়ার দাগ পরিষ্কার করা যায়। অবশ্য খুব দুর্বল কাগজ হলে অকজ্যালিক অ্যাসিড ব্যবহার করা উচিত নয়।

কাদা (**Mud**) ঃ পরিষ্কার জল অথবা অ্যামোনিয়া লাগিয়ে কাদার দাগ পরিষ্কার করা যায়।

দাগ তোলার পদ্ধতি ঃ প্রথমে দাগ যুক্ত কাগজটিকে উল্টে দিয়ে একটি সাদা ব্লটিং কাগজের উপর রাখতে হবে। এবারে যে ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব এমন দ্রবণে অল্প তুলো ভিজিয়ে নিয়ে পিছনের দিকে দাগটির উপর আস্তে আস্তে ঘষতে হবে। এর ফলে দাগটি গলে যাবে ও ব্লটিং পেপার সেটি শোষণ করে নেবে। এইভাবে আবার একটি নতুন ব্লটিং পেপার নীচে দিয়ে পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা দরকার যতক্ষণ না দাগটি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এবারে কাগজটিকে সোজা করে নিতে হবে ও উপরে দ্রবণটি লাগাতে হবে। নীচে ব্লটিং কাগজ রাখতে হবে। সম্পূর্ণ দাগমুক্ত হওয়ার পর নথিটি শুকনো করে নিতে হবে।

যদি পুরানো মোমের দাগ পরিষ্কার করার দরকার হয় তাহলে প্রথমে কাগজটিকে অল্প জলে ভিজিয়ে নিতে হবে দুটি ভেজা ব্লটিং কাগজের মধ্যে রেখে। তারপর একটি ছুরি দিয়ে মোম আস্তে আস্তে তুলে দেওয়া যায় এবং একেবারে পরিষ্কার করার জন্য পরিষ্কার সাদা ব্লটিং কাগজের মাঝখানে রেখে একটি গরম ইস্ত্রি ব্লটিং-এর উপর চালিয়ে দিতে হবে।

সেলোটেপ সাধারণত ছিঁড়ে যাওয়া নথি জোড়া দেওয়ার কাজে লাগানো হয়। কিন্তু ঐগুলি তুলে নেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে যদি সেলোটেপ তোলা যায় তাহলে নথির খুব বেশি ক্ষতি দেখা যায়না।

যদি নথিতে ব্যবহৃত কালি দ্রবীভূত বা বিবর্ণ না হয়ে যায় তাহলে নথিটি অল্প পরিমাণে জল দিয়ে সিক্ত করার দরকার। যদি এতে টেপ কুঁচকে যায় তাহলে এক জোড়া টুইজারস (tweezers) দিয়ে তুলে দেওয়া যায়। এরপরও যদি নথির গায়ে আঠা লেগে থাকে তাহলে একটি স্পঞ্জ-এর টুকরোকে বেঞ্জিন অথবা ট্রাইক্লোরোইথিলিন এ-ভিজিয়ে দাগের উপর ঘষতে হবে। নথিটি সম্পূর্ণভাবে সিক্ত যদি না করা যায় তাহলে টেপের প্রান্তভাগ ও কাগজের নীচের দিকে বেঞ্জিন অথবা ট্রাইক্লোরোইথিলিন লাগিয়ে দিতে হবে। এখন সিক্ত নথিটি থেকে খুব সাবধানে টেপ সরিয়ে নেওয়া যায়। অনেক সময় টেপ তুলে নেওয়ার পর কিছু আঠা নথিতে লেগে থাকতে দেখা যায়। এখন বেঞ্জিন বা ট্রাইক্লোরোইথিলিন স্পঞ্জ-এ ভিজিয়ে যদি ঘষা যায় তাহলে দাগ কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

দাগ বা মলিনতা পরিষ্কার করার জন্য যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় সেগুলি বিষাক্ত এবং আগুনের সংস্পর্শে এলে আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে তাই খুব সাবধানে এবং আগুন থেকে দূরে এই সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত।

কাগজের ভাঁজ মুক্ত করা (Removing creases from paper) ঃ পুরানো কাগজে প্রায়ই ভাঁজ পড়তে দেখা যায়। যদি পাণ্ডুলিপি বা অন্য কোন নথিতে অল্প ভাঁজ পড়ে

তাহলে জলে অল্প পরিমাণ সিক্ত করার পর অল্প গরম ইস্ত্রি উপরে চালিয়ে ভাঁজ মুক্ত করা যায়। যদি নথিতে ভাঁজের পরিমাণ খুব বেশি হয় তাহলে নথিটিকে ভিজিয়ে লিখিত বা চিত্রিত দিকটি নীচের দিকে নিয়ে একটি পরিষ্কার কাঁচের টেবিলের উপর রাখতে হবে এবং আঠা দিয়ে চারদিকে আটকে দিতে হবে। নথিটি ভিজিয়ে নেওয়ার পর স্বাভাবিক কারণে নমনীয় হয়ে যাবে, ফলে টান টান করে যদি আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া যায় তাহলে প্রায় সব ভাঁজ ঠিক হয়ে যেতে পারে। ভাঁজ মুক্ত হওয়ার পর ভাঁজ পড়া জায়গায় অল্প পরিমাণ আঠা ঘষে দেওয়া দরকার এবং দরকার হলে এই জায়গাগুলোতে কাগজ আঠা দিয়ে লাগিয়েও দেওয়া যায় যাতে আবার ভাঁজ না পড়ে। নথি, পাণ্ডুলিপি বা প্রিন্ট-এ জল দেওয়ার পূর্বে জল ব্যবহার করলে কালির বা চিত্রিত অংশের কোন ক্ষতি হবে কিনা তা পরীক্ষা করা দরকার।

ছেঁড়া মেরামত (Repair of Tears)ঃ ছেঁড়া নথি যদি সময়মত মেরামত না করা যায় তাহলে এক সময় সমস্ত নথিটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই ছেঁড়া মেরামত করা খুবই প্রয়োজনীয়। নথিটির উপর লিখিত অংশ বা চিত্রিত অংশ যদি জলে ডুবানো যায় তাহলে নথির সামনের দিকটি একটি কাঁচের প্লেটের উপর রেখে প্লেটসহ কাগজটি জলে ডুবিয়ে সিক্ত করার দরকার। এবারে প্লেটসহ নথিটি জলের বাহিরে আনতে হবে এবং ছেঁড়া জায়গাগুলি আস্তে আস্তে ঠিক করে দিতে হবে। এছাড়াও জলের মধ্যে যখন নথিটি ডুবোনো অবস্থায় থাকবে তখন ছেঁড়া অংশগুলি ভেসে উঠবে; এগুলি তখন ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে। জল থেকে বার করে নেওয়ার পর নথিটি শুকনো করা দরকার। যখন নথিটি শুকনো হয়ে যাবে তখন একটি চামচের পিছনের দিক দিয়ে ছেঁড়া অংশগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় আটকে দিতে হবে। স্থায়ীভাবে ঠিক ঠিক জায়গায় ছেঁড়া অংশগুলি আটকে দেওয়ার জন্য পাতলা কাগজে আঠা দিয়ে পিছনের দিকে লাগিয়ে দেওয়া যায়। তবে এমন কাগজ ব্যবহার করতে হবে যাতে নথির কাগজের সাথে আটকাবার জন্য ব্যবহৃত কাগজটি একই ধরনের হয়।

কাগজে আঠা লাগানো (Sizing of Paper)ঃ কাগজে যে আঠা থাকে তার পরিমাণ অনেক সময় কমে যায় ফলে কাগজ নমনীয়, স্পর্শকাতর ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। তাই যদি পুনরায় এই আঠার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয় তাহলে ১ লিটার জলে ৩ গ্রাম জিলাটিন দ্রবীভূত করে যে দ্রবণ পাওয়া যায় সেই দ্রবণ যদি খুব নরম ব্রাশ দিয়ে কাগজের উপর লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে নথিটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

তালপাতার পুঁথি

প্রাচীন কাল থেকেই তালপাতার উপর লেখা পুঁথির প্রচলন আছে। কখনও শুদ্ধ লেখা আবার কখনও চিত্রিত অবস্থায় এগুলি পাওয়া যায়। ভারত ছাড়া শ্রীলংকাতেও তালপাতার উপর লেখা প্রচুর পুঁথি পাওয়া যায়। তালপাতার পুঁথি

গুণাগুণ অনুসারে দু ধরনের পাতায় পাওয়া যায় (১) তালিপাত (Talipat), (২) পামিয়ারা (Pamyara)।

লেখার জন্য তালপাতা তৈরী করা ঃ লেখার জন্য পাতাগুলিকে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী করে নেওয়া হ'ত। পাতাগুলি গাছ থেকে কেটে নেওয়ার পর, ৪০-৯০ সেঃ মিঃ লম্বা এবং ৪-৭.৫ সেঃ মিঃ চওড়া করে কেটে নেওয়া হত। তারপর পাতাগুলি গরম জলে অথবা দুধে ফেলে ফুটিয়ে নেওয়া হত। পাতার উপরিভাগে কোন কিছু লেগে থাকলে পাতলা ছুরি দিয়ে সেগুলি পরিষ্কার করে নেওয়া হত এবং গিনীগিলি (gingili) তেল পাতায় মাখানো হ'ত। এর ফলে পাতার উপর লেখা বা আঁকার কাজ সহজে করা সম্ভব হয়। পাতার মাপ সব সময় এক হ'ত না তবে চওড়া দিকটি ঠিক থাকতো। পাতাগুলি এইভাবে প্রস্তুত করার পর ধাতুনির্মিত শলাকা, ধাতুর পেনসিল অথবা কালি দিয়ে কলমে লেখা বা চিত্রিত করা হয়। তালিপাত পাতায় আবার কার্বন কালি দিয়ে লিখতে দেখা যায়। কিছু পাতায় ধাতুর শলাকা দিয়ে লিখে তারপর চারকোল ও তেল অথবা তরল কালো কালি দিয়ে পাতার উপর ঘষা হ'ত যার ফলে অক্ষরগুলি পরিষ্কার বোঝা যেত। এই ধরনের লেখা সহজে মুছে দেওয়া যায়না।

অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী "পালযুগের চিত্রকলা" বইটিতে পুঁথি লেখার কাজে দুই শ্রেণীর তালপাতা ব্যবহার করার কথা বলেছেন (১) খড় তাল ও (২) শ্রীতাল। এগুলি বঙ্গদেশে 'তাল' ও 'তেরেট' নামে পরিচিত। 'তাল' ঈষৎ স্থূল (পুরু), স্পর্শ-কাতর, ভঙ্গুর ও পচনশীল হয় ; তাই এগুলির স্থায়িত্ব কম। বাংলাদেশে পুঁথি তৈরীর কাজে এই পাতা খুব বেশি ব্যবহার করা হয়নি। তেরেট পাতা পাতলা, কিছুটা সম্প্রসারণশীল ও নমনীয় হয়। এই সব কারণে এরা অনেক বেশি স্থায়ী হয়। পাতাগুলি বেশ বড় হয় এবং লম্বায় ৯০ সেণ্টিমিটার পর্য্যন্ত হতে দেখা যায়, কিন্তু এদের প্রস্থ খুব কম হয়। এদের স্থায়িত্ব বেশি বলে বেশির ভাগ পুঁথি এই ধরনের পাতা থেকে তৈরী করা হ'ত। পাতাগুলি নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করা হ'ত।

খুব বেশি পুরানো বা একেবারে নতুন এমন পাতা নয়, অর্থাৎ যে পাতাগুলি মোটামুটি পুরানো ও নবীনের মাঝখানে এই শ্রেণীর পাতা গাছ থেকে কেটে এনে কিছুদিন একসাথে জলে ডুবিয়ে রাখা হ'ত। ১৫—৩০ দিনের পর সেগুলি তুলে গোছা বাঁধা অবস্থায় লম্বালম্বি ভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। এর ফলে পাতাগুলি থেকে জল ঝরে যেত। এরপর পরিষ্কার জলে আবার পাতাগুলি ধুয়ে নিয়ে স্বাভাবিক তাপে শুকনো করা হত। আবহাওয়ার তারতম্যে ৫-৭ দিন লাগে পুরোপুরি শুকনো হতে। শুকনো হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেকটি পাতা শাঁখ দিয়ে ঘষে মসৃণ করার পরে পাতাগুলি সাজিয়ে একসাথে সমান মাপে কেটে নিয়ে লেখা বা খোদাই করার কাজে ব্যবহার করা হ'ত।

তালিপাত ও পামিয়ারা পাতা সহজে আলাদা করা যায়। তালিপাত পাতা আকারে বড় হয় এবং আড়াআড়ি শিরাবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। পাতাগুলি কেন্দ্রবিন্দু থেকে

প্রান্ত পর্যন্ত আস্তে আস্তে সরু হয়ে যায়। কার্বন কালি দিয়ে এই পাতার উপর লেখার প্রচলন ছিল।

পামিয়ারা পাতা মোটা এবং অমসৃণ হয়। পাতাগুলি ৩ থেকে ৫ সেঃমিঃ চওড়া হয়। এই পাতায় ধাতুর শলাকা দিয়ে খোদাই করা হ'ত। এই পাতার পুঁথিগুলি সময়ের সাথে সাথে কালো হয়ে যায় এবং সংরক্ষণ করা বেশ সমস্যার ব্যাপার।

তালপাতার পুঁথিতে দুটি করে গর্ত করা হ'ত। এই গর্তগুলির ভিতর দিয়ে একটি সুতো দিয়ে একসাথে পাতাগুলি বাঁধা হয় এবং নীচে ও উপরে পাতার চাইতে একটু বড় মাপের দুটি কাঠের পাটা দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ত। এরপর লাল বা হলুদ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে পাণ্ডুলিপিগুলি রক্ষা করা হয়।

এই লাল বা হলুদ কাপড় এমনভাবে প্রস্তুত করা হ'ত যাতে সহজে পোকা-মাকড় আক্রমণ না করে।

তালপাতার পুঁথি চিত্রিত ও লেখার কাজ করতেন অভিজ্ঞ চিত্রকর ও লিপিকরেরা। লেখাগুলি সাজানো হ'ত দৈর্ঘের সমান্তরালে। প্রত্যেক পাতায় ৫ থেকে ৭টি পঙ্‌ক্তি থাকত। চিত্র ছাড়া যে সব পুঁথি পাওয়া যায় সেগুলিতে পঙ্‌ক্তি অবিভক্ত হ'ত। অবশ্য চিত্রের জায়গাটি খালি রেখে লেখা হ'ত ও চিত্রকর খালি জায়গা পরে পূরণ করতেন।

পাতাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রস্থের তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘ।

চিত্রাঙ্কন (Illustration)ঃ চিত্রিত পুঁথি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য তালপাতার উপর যে পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করা হতো তা জানার বিশেষ প্রয়োজন।

এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে কয়েকখানি শিল্প-গ্রন্থে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া মূল চিত্র পরীক্ষা করে এই পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যায়।

পরমার-রাজ ভোজদেব পণ্ডিত ছিলেন। ভোজদেব রচিত কয়েকটি গ্রন্থে বিশেষ করে "সমরাঙ্গন সূত্রধার" শিল্পগ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের একসপ্ততিতম অধ্যায়ের গ্রন্থকার চিত্রকর্মে আটটি অঙ্গের কথা বর্ণনা করেছেন। তার মতে সমস্ত প্রক্রিয়াটি আটটি অঙ্গে বিভক্ত। (১) বর্তিকা (২) ভূমিবন্ধন (৩) লেখ্য (৪) রেখাকর্ম (৫) বর্ণকর্ম (৬) বর্তনাক্রম (৭) লেখন বা লেখকরণ (৮) দ্বিককর্ম (?)

প্রসঙ্গক্রমে আরো দুটি শিল্পগ্রন্থে চিত্রকর্মের আঙ্গিকের আলোচনা বিশেষ তথ্যপূর্ণ। (১) "অভিলাষিতার্থ চিন্তামণি" বা মানসোল্লাস, (২) শিল্পরত্ন।

বর্তিক. ঃ চিত্রকর্মের আঙ্গিকের এটি একটি বিশেষ উপকরণ বলা যায়। এটি এক ধরনের লেখনী যার দ্বারা চিত্রের অঙ্কন শুরু করা হয়। বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা ও চালের গুঁড়ো মিশিয়ে বর্তিকা প্রস্তুত করা হয়।

ভূমিবন্ধন ঃ চিত্রের ভূমি বা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হল ঃ শিল্পরত্নকার ফলক চিত্রের ক্ষেত্রে এর প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। ফলক মানে

কাঠের পাটা। পুঁথির পাটার চিত্র ফলক চিত্রের পর্য্যায়ভুক্ত মনে করা সংগত হবে না।

লেখ্য ও রেখাকর্ম ঃ এটি প্রাথমিক রেখাঙ্কন। এতে চিত্রের সীমা নির্দিষ্ট করা হয়।

বর্ণ ও বর্ণকর্ম ঃ চিত্রের আকার নির্দিষ্ট করার পর বর্ণ ও বর্ণকর্ম করা হয়। এটি বোঝার জন্য রং ও তার আকার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকার দরকার। বহু চিত্রে সাদা (সিত, ধবল, শ্বেত), হলুদ (পীত), নীল (শ্যাম), লাল (রক্ত), কাল (কৃষ্ণ, কজ্জল) ও সবুজ (হরিৎ) রং ব্যবহার করা হয়েছে। রংগুলি তৈরী করা হয়েছে খনিজ ও শিলাজাত পদার্থ থেকে। কোন কোন রং-এর আকররূপে নীল, লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্যের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। অনান্য মাধ্যম থেকেও কিছু রং তৈরী করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আরো ব্যাপক গবেষণার দরকার। সাদা রং ব্যবহার করা হয়েছে ক্ষেত্রান্তরণে, অবয়বে, আর চিত্রের উজ্জ্বলতা সৃষ্টির মাধ্যমে। অনেকে মনে করেন সাদা রং সাদা সীসা থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু জল রং-এ সীসার ব্যবহার করা অসম্ভব ব্যাপার এবং কোন ধর্মগ্রন্থে এর কোন প্রমাণ নাই। অনেকে মনে করেন এটি সূক্ষ্ম সাদা মাটি বা খড়ি থেকে প্রস্তুত। বিভিন্ন শিল্পগ্রন্থে শংখ বা শুক্তিভস্ম শুদ্ধ সাদা রং-এর আকর হিসাবে বলা হয়েছে।

হলুদ বা পীত রং ঃ এই রং-এর ব্যবহার বেশ দেখা যায় বিশেষতঃ দেব-দেবী অধিকাংশ পীত বর্ণের (কনক বর্ণ, সুবর্ণ বর্ণোজ্জ্বল ইত্যাদি) বলে প্রতিমালক্ষণে বা সাধনমালায় বলা হয়েছে। পীত বর্ণের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এবং হরিতালকে পীতবর্ণের আকর বলা হয়। হরিতাল আবার দুই শ্রেণীর পাওয়া যায় ঃ (১) দগদী ও ও (২) বর্গী। বর্গী শ্রেণীর হরিতাল হলুদ রং তৈরী করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রে নীল বা শ্যাম রং বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ও বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে নীল রং-এর আকর হিসাবে নীল গাছের উল্লেখ আছে। অনান্য শিল্পগ্রন্থেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। নীল রঙের আর একটি আকর রাজাবর্ত।

লাল ঃ চিত্রে লাল রং খুব বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং এর আকর হিসাবে শিল্পগ্রন্থে বিভিন্ন দ্রব্যের নাম পাওয়া যায় যেমন, দরদ (লাল সীসা), লাক্ষারস বা অলক্তক (আলতা)। গৌরিক (গিরিমাটি) প্রভৃতি থেকে লাল রং পাওয়া যায়।

কাল (কৃষ্ণ) ঃ কাল রং সব ক্ষেত্রেই কাজল থেকে তৈরী করার বিধি শিল্পগ্রন্থ গুলিতে বর্ণিত আছে। আমাদের চিত্রেও এই রং-এর প্রস্তুতি একই বিধিতে করা হয়েছে মনে করা হয়।

শিল্পগ্রন্থগুলির মতে সাদা, হলুদ, নীল, লাল ও কাল (কৃষ্ণ, কজ্জল) রং শুদ্ধ ও মুখ্য বর্ণরূপে পরিচিত। এই পাঁচটি রং ছাড়াও সবুজ বা হরিৎ বর্ণও চিত্রে দেওয়া হয়েছে। নীল ও হলুদ রং-এর মিশ্রণে সবুজের উদ্ভব। এছাড়া উপযুক্ত

বর্ণের বিভিন্ন ছায় উৎপাদিত হয় অন্য রং-এর সাথে মিশ্রিত হয়ে। মানসোল্লাস ও শিল্পরত্ন দুটিতে এই রূপ দুটি তালিকা পাওয়া যায়।

মানসোল্লাস ঃ (১) দরদ ও শঙ্খসুধা মিশ্রণে লাল পদ্মের বর্ণচ্ছায়; (২) গৈরিক ও শঙ্খসুধা মিশ্রণে ধূম্রবর্ণচ্ছায়; (৩) কজ্জল ও শঙ্খসুধা মিশ্রণে ধূম্র বর্ণচ্ছায়; (৪) নীল ও শঙ্খসুধা মিশ্রণে পারাবত রং; (৫) কজ্জল ও লাক্ষারস মিশ্রণে বিস্কুট রং; (৬) লাক্ষারস ও নীল মিশ্রণে রক্তনীলচ্ছায়।

শিল্পরত্ন ঃ (১) সিত ও রক্ত মিশ্রণে—গৌরচ্ছবি; (২) শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত সমাংশে মিশ্রণে—শরচ্ছবি (৩) শ্বেত ও কৃষ্ণ মিশ্রণে—গজবর্ণ (ধূসর); (৪) রক্ত ও পীত সমাংশে মিশ্রণে অগ্নিবর্ণ; (৫) দুইভাগ রক্ত ও একভাগ পীত মিশ্রণে—অতিরক্ত; (৬) দুইভাগ পীত ও একভাগ শ্বেত মিশ্রণে—পিঙ্গল; (৭) হরিতাল ও শ্যাম (নীল) মিশ্রণে—শুকপক্ষচ্ছায় (সবুজ); (৮) লাক্ষারস ও হিঙ্গুদ (সিন্দুর) মিশ্রণে—অতিরক্ত; (৯) লাক্ষারস, কৃষ্ণ ও নীল মিশ্রণে—জম্বুফলচ্ছায়; (১০) কৃষ্ণ ও নীল মিশ্রণে—কেশবর্ণ, (১১) লাক্ষারস, জাতিফল (জায়ফল) ও সিত সমভাবে মিশ্রণে, কখনও সিন্দুর সহ—সন্মিশ্রবর্ণ. যে বর্ণে বিভিন্ন ছায় প্রতিফলিত হয়।

বর্তনাক্রম ঃ চিত্রের ষষ্ঠ অঙ্গটি সমরাঙ্গন সূত্রধারে বর্তনাক্রম নামে অভিহিত। বর্তনা শব্দটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়, তবে চিত্রে ছায়াতপ-এর প্রতিফলনই বর্তনাক্রমরূপে অভিহিত।

লেখন বা লেখকরণ ঃ সমরাঙ্গনসূত্রধারে চিত্রকর্মের এই সপ্তম অঙ্গটি ও রেখাঙ্কন সমাকীর্ণ এতে কোন সন্দেহ নাই। লেখন বা লেখকরণ হলো এই অন্ত্য-রেখাঙ্কন। এই রেখা অঙ্কিত হয় অবয়বের রং এর বিপরীত বর্ণে, আর এই রেখাঙ্কনে চিত্রের রেখা সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত ভাবে স্থিরীকৃত করা হয়। এটি সাধারণতঃ কাল অথবা লাল রং-এ আঁকা হয়।

দ্বিককর্ম ঃ চিত্রকর্মের সমাপ্তি হয় এই অন্ত্য রেখাঙ্কনে। কিন্তু শিল্পী মানস প্রকাশে আরো কিছু প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় চিত্রের সমাপ্তিতে। আভাসসৃষ্টি, উজ্জ্বলতা-সম্পাদন. প্রসাদগুণবর্ধন ইত্যাদি ব্যাপারে কুশলী শিল্পী নিজস্ব কলা-কৌশল প্রয়োগ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই প্রক্রিয়াকে দ্বিককর্ম বলা যায়।

এই পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে জানার দরকার কারণ তালপাতার চিত্রিত অংশ সুরক্ষা ও সংরক্ষিত করার পদ্ধতি ঠিক করতে সাহায্য করে।

তালপাতা সংরক্ষণ করার পদ্ধতি ঃ তালপাতা সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। তাল-পাতার পুঁথির উপর একটি অনেক সময় দুটি গর্ত করে একসাথে বেঁধে রাখা হয় এবং এই গর্তকরা অংশটিতে পাতা প্রথমে নষ্ট হতে দেখা যায়। গর্তের প্রান্তভাগগুলি ভঙ্গুর হয়ে যায়। তালপাতার পুঁথি যদি খুব বেশি আর্দ্র বা ভেজা জায়গায় বেশি

দিন থাকে তাহলে পাতাগুলি একটির সাথে আর একটি জড়িয়ে যায় এবং নানান ধরনের পোকা, আণুবীক্ষণিক প্রাণী আক্রমণ করে ও বংশবিস্তার করে।

দু'ধরনের লেখা তালপাতায় দেখা যায় ঃ (১) ধাতুর শলাকা দিয়ে খোদাই করা ও পরে খোদাই করা অংশগুলি কালি দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া, (২) কার্বন কালি দিয়ে লেখা। শলাকা দিয়ে খোদাই করা পুঁথি যদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে লেখাগুলি বিবর্ণ ও অস্পষ্ট হযে যায়। এই ধরনের পুঁথির লেখা পাঠ করার জন্য পুনরায় কালি লাগানো যায়। কার্বন কালি দিয়ে লেখা পুঁথি যদি পাঠ করা না যায় ও বিবর্ণ হয়ে যায় তাহলে অ্যালকোহল ও গ্লিসারিন সমান সমান পরিমাণ মিশিয়ে যে দ্রবণ পাওয়া যায় তা ব্রাশে মাখিয়ে পাতার উপর আস্তে আস্তে লাগালে লেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই দ্রবণ দিয়ে তালপাতার উপরিভাগ পরিষ্কার করলে, ধুলো ও অন্যান্য অপবস্তু, আণুবীক্ষণিক জীব মুক্ত করা সম্ভব। পাতাটি পরিষ্কার হয়, লেখা স্পষ্ট হয়, পাতাটিও নমনীয় হয়। অ্যালকোহল ও গ্লিসারিন দ্রবণ ব্যবহার করলে কার্বন কালি কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে তাই অ্যাসিটোন অথবা বেঞ্জিন দিয়ে পাতা পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর ৫ শতাংশ সেলুলোজ অ্যাসিটেট ১০০ সিসি অ্যাসিটোনে মিশিয়ে যে দ্রবণ পাওয়া যায় তা পাতার উপরিভাগে লাগানো যায়।

পুঁথির পাতা অনেক সময় একসাথে জোড়া লেগে যায় ও একটি কঠিন পদার্থের আকার ধারণ করে। পুঁথির পাতাগুলি প্রথমে আলাদা করা দরকার। জোর করে যদি এক একটি পাতা আলাদা করার চেষ্টা করা হয় তাহলে পাতাগুলি ছিঁড়ে যেতে পারে, এমন কি পুরো পাতাটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের জুড়ে যাওয়া পুঁথির পাতা আলাদা করার জন্য পুঁথিটিকে সম্পৃক্ত আর্দ্র পরিবেশে ৬০ মিনিট রাখতে হবে। আর্দ্র পরিবেশে থাকার ফলে পুঁথিটি জলীয় বাষ্পে নিষিক্ত হবে। পাতাগুলিকে একটি পরিষ্কার স্প্যাচুলা দিয়ে একটি একটি করে খুলে ব্লটিং কাগজের উপর রাখতে হবে।

এছাড়াও গরম জলের মধ্যে পুঁথিটিকে নিমজ্জিত করে পাতাগুলিকে আলাদা করা যায়। এর জন্য জলের তাপমাত্রা অন্ততঃ ৬০° সেণ্টিগ্রেড হওয়ার দরকার। জলের সঙ্গে ৫-১৫ সি.সি. গ্লিসারিন মিশিয়ে দিতে হবে এবং প্রতি ৩০ মিনিটে জল পরিবর্তন করতে হবে। পুঁথিটি যদি ১ ঘণ্টা গরম জলে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে তাহলে পাতাগুলি খুব সহজে আলাদা হয়ে যায়। আলাদা করার সময় দুটি পাতার মাঝখানে অল্প অল্প করে গরম জল দেওয়া দরকার। পাতাগুলি আলাদা হয়ে যাওয়ার পর স্টেনলেস স্টীল (Stainless steel) এর চিমটে দিয়ে পাতাগুলি সাবধানে খুলে আনতে হবে ও ব্লটিং কাগজের উপর রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। পাতাগুলি শুকনো হওয়ার পর অ্যালকোহল ও গ্লিসারিনের (১ ঃ ১) মিশ্রণ দিয়ে উপরিভাগটি পরিষ্কার করা যায়। পাতাগুলি পরিষ্কার করার পর পাতা নমনীয় হয় ও লেখাগুলি পাঠযোগ্য হয়।

কার্বন কালিতে লেখা জোড়া লাগা তালপাতার পুঁথি আলাদা করার জন্য গরম জল-গাহে (Hot water bath) গ্লিসারিন মিশ্রিত করে তাতে পুঁথি নিমজ্জিত করলে পাতাগুলি আলাদা হয়ে যাবে। আলাদা পাতাগুলি ব্লটিং কাগজে শুকনো করে তারপর অ্যালকোহল ও গ্লিসারিন দ্রবণ (১ঃ১) দিয়ে পরিষ্কার করা যায়।

এছাড়া ৭০-৮০ সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তরল প্যারাফিন গাহে (Paraffin bath) জুড়ে যাওয়া পুঁথি নিমজ্জিত করলে কিছু সময় পর পাতাগুলি আলাদা হয়ে যায়। আলাদা পাতাগুলির উপর প্যারাফিনের একটি স্তর পড়ে যায় এবং এই প্যারাফিন স্তর পরিষ্কার করার জন্য পরিষ্কার তুলো অ্যাসিটোন দ্রবণে ডুবিয়ে পাতার উপর ঘষার দরকার। পাতাগুলি যখন এইভাবে আলাদা করা হয় তখন অল্প পরিমাণে শক্ত ও ভঙ্গুর হয়।

খোদাই করা তালপাতা সংরক্ষণ (Preservation of engraved palmleaf) :

তালপাতার উপর যখন খোদাই করা হয় তখন খোদাই অংশ কালি দিয়ে ভর্তি করা হয়। ফলে খোদাই অংশ স্পষ্ট ও পাঠযোগ্য হয়। দীর্ঘদিন যদি দূষিত পরিবেশে এবং অবহেলায় এই ধরনের পুঁথি পড়ে থাকে তাহলে খোদাই করা অংশ পড়া যায়না। তাই প্রথমেই এই ধরনের পুঁথি পাঠযোগ্য করে তোলার দরকার। পাঠযোগ্য করার জন্য পাতার উপর গ্রাফাইট বা ল্যাম্প ব্লাক লাগাতে হবে ও ভালো ভাবে ঘষতে হবে। গ্রাফাইট বা ল্যাম্পব্লাক লাগানোর জন্য তুলো ব্যবহার করা যায়।

তুলোয় কালি দিয়ে ঘষলে খোদাই করা জায়গা গুলি ভর্তি হয়ে যাবে ও পাঠযোগ্য হবে। কালি লাগাতে গিয়ে যদি অতিরিক্ত কালি পাতায় লেগে থাকে তাহলে কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষলে পাতাটির উপর লেগে থাকা কালি পরিষ্কার হয়ে যাবে। পাতাটি পরিষ্কার করার জন্য অ্যালকোহল ও গ্লিসারিনের দ্রবণ ব্যবহার করে অথবা অ্যাসিটোন দিয়েও পরিষ্কার করা যায়।

জীর্ণসংস্কার (Repair) : তালপাতার পুঁথি অনেক সময় যথাযথভাবে সংরক্ষিত না করার জন্য ভেঙ্গে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি কার্বন কালি দিয়ে লেখা কোন পুঁথি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সিফনের (chiffon) গায়ে কৃত্রিম আঠা মাখিয়ে উভয় দিকে লাগিয়ে দেওয়া যায়। সিফন ছাড়া সিল্ক দিয়েও ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা সারানো সম্ভব। সিফন বা সিল্ক লাগিয়ে দেওয়ার পর দেখা যায় যে সিফন বা সিল্কের প্রান্তভাগটি শুকনো হয়ে শক্ত হয়ে যায়; তাই বিশেষভাবে তৈরী কাগজ দিয়ে তারপর এর প্রান্ত-ভাগটি এই কাগজের সাথে ভালোভাবে মুড়ে লাগিয়ে দেওয়া উচিত।

পুঁথি এ ছাড়া সারানো যায় হাতে তৈরী কাগজ ব্যবহার করে। হাতে তৈরী কাগজ সমান মাপের কেটে নিয়ে আঠা দিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে পাতায় লাগিয়ে দিতে হবে এবং তারপর ৫-১০ শতাংশ পলিভিনাইল অ্যাসিটেট দ্রবণ বেঞ্জিন-এ মিশিয়ে নরম ব্রাস দিয়ে উপরিভাগে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর একটি সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফিল্ম যা পাতার চাইতে বড়, পাতার উপর রাখতে হবে এবং অল্প চাপ দিলে এটি পাতার উপর ভালোভাবে আটকে যাবে। পাতার অন্য দিকটিতেও একইভাবে

সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফিল্ম লাগাতে হবে। পাতাটিকে এবারে অল্প চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ রাখার দরকার যাতে জোড়া দেওয়া অংশগুলি একসাথে ভালোভাবে লেগে যায়।

ব্রিটিশ সংগ্রহশালায় তালপাতাকে সারানোর জন্য অ্যাক্রিলিক ইমালসান এবং টিস্যু পেপার ব্যবহার করা হয়েছে। টিস্যু পেপারে অ্যাক্রিলিক রাবার লাগিয়ে পাতার উপর লাগিয়ে দেওয়া যায় এবং এটি সুরক্ষিত করার জন্য সিলিকন কাগজ লাগিয়ে দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এটি করা হয়। হারিয়ে যাওয়া অথবা গর্ত হয়ে গেছে এই রকম ক্ষত জায়গা প্রথমে বিশেষভাবে প্রস্তুত কাগজ দেওয়া কাঠের ভিনারকে একটি পিছনে আর একটি সামনে রেখে এর মাঝখানে একখণ্ড কোজোশি (Kozo-shi) কাগজ আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর হস্তচালিত প্রেসে অল্প চাপ দিয়ে এটি বসিয়ে দিতে হবে। যদি এরপর অতিরিক্ত ভিনার থেকে যায় তাহলে তা কেটে বাদ দিয়ে দিতে হবে এবং ঠিক মাপের ভিনারটিকে আলাদা রাখতে হবে।

তালপাতাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত টিস্যু পেপার দিয়ে স্তরিত করা যায় এবং এরজন্য একদিকে অ্যাক্রিলিক রাবার যাকে আবার একপ্রস্থ সিলিকন কাগজ দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়। টিস্যু পেপারটিকে তালপাতার চেয়ে অন্ততঃ ৩ মিলিমিটার বড় হতে হবে। আস্তে আস্তে সিলিকন কাগজটি সরিয়ে টিস্যু কাগজটিকে চাপ দিয়ে তালপাতার সঙ্গে ভালোভাবে আটকে দেওয়া যায়। টিস্যু পেপারটি এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে কোন বুদ্‌বুদ্ ভেতরে থেকে না যায়। পাতাটিকে এবারে উল্টে নিতে হবে। মাপ মত কেটে রাখা ভিনারটিকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে এবং পাতাটি আর একটি টিস্যু কাগজ দিয়ে আবৃত করার দরকার। অ্যাক্রিলিক আঠা পাতার উভয় দিকে লাগিয়ে দিতে হবে যাতে ছবি তোলার সময় আলো প্রতিসারিত (refraction) না হয়। এখন এই পাতাটি দুই খণ্ড কাগজের মধ্যে রেখে তারপর বিশেষ ধরনের প্রেসের মধ্যে রাখতে হবে। এটি খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে যাতে অ্যাক্রালিক আঠা শুকনো না হয়ে যায়। এমন অবস্থায় প্রেসে চাপাতে হবে ও অল্প চাপ দিতে হবে। অল্প চাপে ৫ মিনিট থাকার পর পাতাটিকে বার করে লঘু প্যারাফিন ও মোমের মিশ্রণ (Paraffin wax emulsion) তুলো দিয়ে লাগাতে হবে। এর ফলে পাতাগুলি একসাথে শক্ত হয়ে লেগে থাকবেনা বা আটকে যাবেনা। আবার একই কাগজখণ্ডের মধ্যে পাতাটি দিয়ে ৫ মিনিট প্রেসের মধ্যে রাখতে হবে। পাতাটিকে প্রেস থেকে বার করে নেওয়ার পর কাগজখণ্ড দুটি তুলে নিতে হবে। সবশেষে এবারে পাতাটির উপর শুকনো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঘষা দরকার যাতে যদি কোন অংশে অতিরিক্ত মোম জমে গিয়ে থাকে তা উঠে আসবে। প্রান্তদেশের যে টিস্যু পেপার আছে সেটি মুড়ে নিতে হবে। সারানো পাতা এখন নমনীয়—নাড়াচাড়া বা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা হয়না। অ্যাক্রি-লিক আঠা ব্যবহার করার জন্য টিস্যু পেপার খুব স্বচ্ছ হয়ে ওঠে; তাই লেখাগুলিও পরিষ্কার বোঝা যায়। যদি কখনও পাতাটি বার করে নেবার দরকার হয় তাহলে

ক্লোরোফর্ম (chloroform) দিয়ে টিস্যু পেপার তুলে নেওয়া যায়। অন্য একটি পদ্ধতিতে তালপাতা সংরক্ষণ করা যায়। পাতলা দুটি কাঁচখণ্ডের মধ্যে পাতাটি ঢুকিয়ে আটকে রাখা যায় ও সুরক্ষিত করা সম্ভব।

খোদাই করা তালপাতা (Engraved palm leaf) ঃ

যখন পাতাগুলির উপর খোদাই করা হয় তখন এতে বার বার কালি দিয়ে লেখা অংশটিকে পাঠযোগ্য করে তোলা হয়। যদি এমন দেখা যায় যে লেখাগুলি বোঝা যাচ্ছেনা তখন গ্রাফাইট বা ল্যাম্পব্ল্যাক পাতাটির উপর বার বার ভেজা তুলো দিয়ে ঘষার দরকার। দু চার বার ঘষার পর লেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদি অতিরিক্ত গ্রাফাইট বা ল্যাম্পব্ল্যাক লেগে থাকে তাহলে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঘষলে অতিরিক্ত কালি পরিষ্কার হয়ে যাবে। পাতাটিকে পরিষ্কার করার জন্য ১ঃ১ অনুপাতে অ্যালকোহল ও গ্লিসারিনের মিশ্রণ ব্রাশ দিয়ে পাতার উপরিভাগে লাগানো যায়। পরিষ্কার করা পাতাগুলি পরিমিত আর্দ্রতায় ও তাপে, দূষণমুক্ত বায়ুতে সংরক্ষিত করার দরকার। যে জায়গায় এগুলি রাখা হয় সেখানে যদি আর্দ্রতা খুব বেশি হয় তাহলে একটি পাত্রে সিলিকা জেল (Silica gel) অথবা চুণ রাখা দরকার যাতে আর্দ্রতার পরিমাণ কিছুটা কমাতে পারে। যদি আবার বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব কম হয় তাহলে বরফের ব্যাগ (Ice bag) ঘরে রেখে আর্দ্রতার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি করা যায়। সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার জায়গায় তালপাতার পুঁথি রাখা উচিত।

ভূর্জপত্র

ভূর্জগাছ (বৈজ্ঞানিক নাম **Betula utilis**)-এর ছালে লেখা বহু পুঁথি পাওয়া যায়। এগুলি খুবই পাতলা এবং দেখতে পাতার মতই ; তাই ভূর্জপত্র বলে পরিচিত। পাণ্ডুলিপিগুলির আকার আয়ত (oblong) হয় এবং একসাথে পাতাগুলি বেঁধে রাখার জন্য মাঝখানে একটি (অনেক সময় দুটি) ফুটো করে নেওয়া হ'ত। দুটি আকারে এই পাণ্ডুলিপিগুলি দেখতে পাওয়া যায় ঃ (১) ২৮·৫ সেণ্টিমিটার লম্বা ও ৬·৫ সেণ্টিমিটার চওড়া ; (২) ২৩ সেণ্টিমিটার লম্বা ও ৫ সেণ্টিমিটার চওড়া। পুঁথি লেখার জন্য গাছের পাতলা ছাল বার করে নেওয়া হ'ত। পাতলা ছাল বার করার জন্য গাছ থেকে ৯০ সেণ্টিমিটার লম্বা ও ২০ সেণ্টিমিটার চওড়া আয়তনে ছাল কেটে নিয়ে এই ছাল থেকে পাতলা উপরিভাগটি বার করে নেওয়া হ'ত। ছালটিকে এবারে অল্প তেল দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হত। ভূর্জগাছের থেকে ভূর্জতেল পাওয়া যায়, তাই পোকা সহজে ভূর্জছাল নষ্ট করতে পারেনা।

ভূর্জপত্র সংরক্ষন ঃ ভূর্জপত্রে সাধারণতঃ কার্বন কালি দিয়ে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এই রকম পাণ্ডুলিপি অনেকসময় যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ময়লা হয়ে

যায় এবং লিখিত বিষয়বস্তু পাঠ করা খুবই কষ্টকর হয়। এই ধরনের পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করা যায়—একটু পরিষ্কার তুলোতে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিটোন (Acetone) লাগিয়ে যদি আস্তে আস্তে পাতার উপরিভাগে ঘষা যায় তাহলে এটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। অ্যাসিটোন দেওয়ার ফলে ময়লা ছাড়াও অন্যান্য যে সব রেজিন-জাতীয় পদার্থ জমা হয় সেগুলিও পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

অ্যাসিটোন ছাড়াও কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড (carbon tetrachloride) দিয়ে উপরিভাগের ময়লা ও অন্যান্য অপবস্তু পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ব্যবহার যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে করা দরকার। অ্যালকোহল ও গ্লিসারিন সমান সমান পরিমাণ মিশিয়ে যে দ্রবণ পাওয়া সেই দ্রবণে অল্পপরিমাণ তুলো ভিজিয়ে যদি পাতার উপর ঘষা যায় তাহলে ধুলো-ময়লা সহ অন্যান্য সব অপবস্তু পরিষ্কার করা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় পুথির দুটি পাতা একসাথে জড়িয়ে গেছে এবং জোর করে এগুলি আলাদা করার চেষ্টা করলে ভেঙেযাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আলাদা করার জন্য এই খণ্ডটি খুব বেশি আর্দ্রতা যুক্ত ঘরে রাখা দরকার। অনেক সময় বরফ ব্যাগ ব্যবহার করেও আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ানো হয়। যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতার উপস্থিতির ফলে খণ্ডটি বেশ ভালোভাবে জলীয় বাষ্পে সিক্ত হয়। ভেজা খণ্ডটির মধ্যে একটি পরিষ্কার স্প্যাচুলা প্রবেশ করিয়ে পাতা দুটি আলাদা করা যায়। এ ছাড়া গরম বাষ্প দিয়ে সিক্ত করেও পাতাগুলি আলাদা করা সম্ভব।

বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে এগুলিকে আলাদা করার জন্য ৭০-৮০° সেণ্টিগ্রেড তাপ-মাত্রায় তরল প্যারাফিন গাহে (Paraffin bath) জোড়া লাগা পাতাটি ডুবিয়ে দিতে হবে। অল্প সময় প্যারাফিন গাহে রাখার পর এটি স্বভাবিকভাবেই আলাদা হয়ে যাবে। আলাদা হয়ে যাওয়া পাতা এখন সাবধানে তুলে এনে শুকনো করার দরকার। পাতার উপর প্যারাফিন লেগে যায়। অ্যাসিটোন অথবা কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড দ্রবণ তুলোতে ভিজিয়ে যদি আস্তে আস্তে উপরিভাগে ঘষা যায় তাহলে এটি পরিষ্কার হবে যাবে।

পাতায় যদি ফাটা বা ছেড়া থাকে তাহলে সিফনের উপর কৃত্রিম আঠা লাগিয়ে ছেড়া অংশের উপর বসিয়ে পাতাটিকে সুরক্ষিত করা যায়। ভূর্জপত্র দূষণমুক্ত পরিবেশে, পরিষ্কার জায়গায় রাখা দরকার যাতে ধুলো বালি ময়লা ও অন্যান্য আণুবীক্ষণিক জীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। যদি খুব বেশি আণুবীক্ষণিক জীবের দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে থাইমল বাষ্পায়নাগারে রেখে এগুলি জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

চিত্র

চিত্রে যে রং ও মিডিয়া ব্যবহার করা হয় তার উপর ভিত্তি করে এদের শ্রেণী-বভাগ করা যায়। রং-এর কণাগুলি জলে দ্রবীভূত করে যে রং পাওয়া যায় সেই রং

দিয়ে অংকিত চিত্রকে জল রংএর চিত্র (Watercolour painting) বলে, আবার রং-এর কণাগুলি যখন পাউডার-জাতীয় বস্তু ও আঠায় মিশ্রিত করে তারপর শুকনো করে সেই রং দিয়ে অঙ্কিত চিত্রকে প্যাসটেল চিত্র (Pastel colour painting) বলা হয়। রংএর কণাগুলি যখন তেল-জাতীয় তরল পদার্থে মিশ্রিত করে প্রস্তুত হয় এবং সেই রং দিয়ে যদি চিত্র অঙ্কন করা হয় তখন একে তৈলচিত্র (Oil colour painting) বলা হয়।

চিত্রের গঠন ঃ চিত্র যে কোন শ্রেণীভুক্ত হোক না কেন এদের গঠনপ্রণালী মোটামুটি একই রকম। বিশ্লেষণ করলে একটি চিত্রে চারটি স্তর পাওয়া যায় ঃ অবলম্বন (Support), ভিত্তিস্তর (Ground layer), রংএর স্তর (Colour layer) ও ভারনিসের স্তর (Varnish layer)।

অবলম্বন—এটি চিত্রের প্রথম স্তর। পাথর, মাটি, তামার প্লেট, আইভরি, চামড়া, কাঠ, কাচ, পোড়ামাটি, প্লাসটার, শুকনো কাদা, কাগজ, কাপড়, সিরামিকস, ক্যানভাস, তালপাতা, ভূর্জপত্র, শোলা, বাঁশ ইত্যাদি বস্তু চিত্রে অবলম্বন বা বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ভিত্তিস্তর ঃ অবলম্বনের উপর নানান বস্তু মিশ্রিত করে একটি প্রলেপ দেওয়া হয়। চিত্র অনুসারে ভিত্তিস্তর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয়। চিত্রকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে এই স্তরটি সাহায্য করে। এই স্তরটি বিশ্লেষণ করে নানান চিত্রে নানান বস্তু পাওয়া গেছে যেমন—চক, জিপসাম, বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা ও তণ্ডুল চূর্ণ, মৃত্তিকা, গোময়, প্লাসটার, চুণ ইত্যাদি।

রং-এর স্তর ঃ ভিত্তিস্তর সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করার পর এর উপর নানান রং ব্যবহার করে চিত্র অঙ্কন করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ভিত্তিস্তরের উপর একটি স্তর সৃষ্টি করে যাকে রং-এর স্তর বলা হয়। রং নানান-ধরনের হয় যেমন জল রং, প্যাসটেল রং, তেল রং ইত্যাদি।

ভারনিসের স্তর (Varnish layer) ঃ চিত্রের শেষ স্তর। এটি চিত্র সংরক্ষণ ও সুরক্ষার কাজ করে। চিত্র অঙ্কন সম্পূর্ণ হলে রং-এর উপরিভাগে একটি প্রলেপ দেওয়া হয়। একেই ভারনিসের স্তর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এটি একটি সমসত্ত্ব দ্রবণ। ভারনিসের স্তর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে নানান চিত্রে নানান পদার্থ ভারনিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে—যেমন, মোম, রেজিন, নানান উদ্ভিজ্জ তেল ও বীজ, পলিভিনাইল অ্যাসিটেট ইত্যাদি। ভারনিস দিলে চিত্রের প্রতিসরাংক (refractive index) বৃদ্ধি পায় তাই চিত্রিত অংশ অনেক বেশি গভীর ও স্পষ্ট হয়ে উঠে। চিত্র যে কোন ধরনের হোক না কেন এদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করার জন্য যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা দরকার।

চিত্র অঙ্কণের জন্য অবলম্বন হিসাবে জৈব বা অজৈব উভয় বস্তুরই ব্যবহার দেখা যায়। জৈব বস্তু হিসাবে কাঠ, কাপড়, ক্যানভাস, বাঁশ, শোলা, কাগজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহৃত কাঠের ক্ষেত্রে দেখা যায় এদের কোষ (Cell)-গুলি অনেক-

সময় লম্বাকৃতি এবং সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে। কাঠ যেহেতু জলাকর্ষী বস্তু তাই যখন পরিবেশে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি হয় তখন এই কোষগুলি জল শোষণ করে। আবার আর্দ্রতার পরিমাণ কমে গেলে এরা অতিরিক্ত পরিমাণ জল ত্যাগ করে। যখন কোষগুলি অতিরিক্ত জল শোষণ করে তখন এগুলি ফুলে যায় এবং অনেক সময় পচনক্রিয়া শুরু হয়, আবার জল ত্যাগ করার ফলে কোষগুলি সংকুচিত হয়। এই পরিবর্তনগুলি জৈব বস্তু দিয়ে প্রস্তুত যে সমস্ত অবলম্বন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। যদি কোন অবলম্বনে এই ধরনের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে তাহলে তলদেশ উঁচুনীচু হয়ে যায় ও চিত্রটি বেঁকে যাবে। কোষগুলির সংযোগস্থল আলাদা হয়ে যেতে পারে এবং এগুলি নানান ধরনের কীট ও আণুবীক্ষণিক প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

কাপড় ও ক্যানভাসের অবলম্বন অতিরিক্ত তাপমাত্রায় এবং দূষিত পরিবেশে জারিত হয় এবং চিত্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্দ্রতাবৃদ্ধির ফলে চিত্রে যে আঠা ব্যবহার করা হয় তাতে নানান ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনে কীট ও নানান আণুবীক্ষণিক প্রাণী দ্বারা অবলম্বন আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে চিত্রের ক্ষতিসাধন হতে পারে।

অবলম্বন হিসাবে কাগজও ব্যবহৃত হয়েছে। হাতে প্রস্তুত কাগজের বেধ (thickness) নানান জায়গায় নানা ধরনের এবং আর্দ্রতার তারতম্য ঘটলে হয় এটি জল শোষণ অথবা বর্জন করে। এই জাতীয় কাগজের বেধের সমতা না থাকার ফলে আর্দ্রতার তারতম্য ঘটলে কোষগুলির সংকোচন প্রসারণ নানা প্রকার হয় ও এর ফলে চিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তাপমাত্রার অতিরিক্ত তারতম্যে সেলুলোজ তন্তুগুলিতে নানা প্রকার রাসায়নিক ও ভৌত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতায় জল শোষণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় কীট ও অন্যান্য আণুবীক্ষণিক প্রাণীর বংশবিস্তার বৃদ্ধি পায়। এরা চিত্রের নানান স্তর খেয়ে ফেলে এবং সেলুলোজ তন্তুগুলিতে পচনক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলেও চিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

ভিত্তিস্তর ঃ অবলম্বনের উপর ভিত্তিস্তর প্রস্তুত করা হয় এবং চিত্র অনুসারে এদের গঠনও ভিন্ন হয়। জিপসাম্, চক্, চায়না ক্লে, সাদা মৃত্তিকা ও তন্ডুলচূর্ণ, শঙ্খচূর্ণ, মাটি, খড়, তুষ, উদ্ভিজ্জ তন্তু, বীজ ইত্যাদি এই স্তর প্রস্তুত করতে ব্যবহার হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে এই বস্তুগুলিকে এক ধরনের আঠার সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা হ'ত। এই আঠা চামড়া ও হাড় থেকে প্রস্তুত করা হয় কারণ এগুলি তাড়াতাড়ি জলে দ্রবীভূত ও শুকনো হয় এবং সহজে মসৃণ হয়। অনেক সময় তেল মিশ্রিত করে ভিত্তিস্তর প্রস্তুত করতে দেখা যায়—যেমন কোন কোন সাদা রং, (সাদা সীসা, সাদা দস্তা) সাদা টিটেনিয়াম্ প্রভৃতি। তেলের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এই জাতীয় ভিত্তিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেছে। এই রাসায়নিক পরিবর্তন গুলি তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা আর্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য হতে পারে।

প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ আঠা যে সব ভিত্তিস্তরে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি কীট ও নানান আণুবীক্ষণিক প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

রং-এর স্তর ঃ রং-এর কণা ও মাধ্যম এই দুটি বস্তুর মিশ্রণকে রং বলা হয়। রং নানান প্রকার হয় এবং এগুলির আকর মৃত্তিকা, শিলা, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ হতে পারে। মাধ্যম হিসাবে জল, তেল আঠা, মোম, ডিমের কুসুম ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তেল ব্যবহার করে যে সব রং প্রস্তুত করা হয় সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় তেল বিজারিত হ'লে চিত্রে নানান ধরনের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। জল রংএর চিত্রে অতিরিক্ত জল বর্জনের ফলে রং-কণাগুলি আলাদা হয়ে যায় ও সংরক্ষণ না করা হলে সমস্ত চিত্রটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

জল প'ড়ে, খাদ্যবস্তুর কণা থেকে চিত্রের উপর ছত্রাক ও অনান্য আণুবীক্ষণিক প্রাণী বংশবিস্তার করে ও ক্ষতিসাধন করে। যদি কোন তৈলচিত্রকে আর্দ্র পরিবেশে ও উজ্জ্বল জায়গায় দীর্ঘদিন রাখা হয় তাহলে রং-এর কণাগুলি একত্র হয়ে চিত্রের মলিনতা বৃদ্ধি করে। দেখা যায় প্রত্যক্ষ সূর্যালোকের আলো খুব তাড়াতাড়ি চিত্রের রং-এর কণাগুলিকে মলিন করে দিতে পারে।

যে সব চিত্রে সাদা সীসা ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি তাড়াতাড়ি মলিন হয়ে যায়। অবশ্য যদি বন্ধনকারী মাধ্যম নষ্ট না হয় এবং উপরে ভার্নিসের স্তরটি অবিকৃত থাকে তাহলে সাদা সীসার রং অনেকদিন অবিকৃত থাকতে পারে। সাদা সীসার কালো হয়ে যাওয়ার মূল কারণ বায়ুমণ্ডলের মুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড। আর্দ্র পরিবেশে এগুলি রং-এর কণাগুলিকে বেসিক কার্বনেটে থেকে লেড সালফাইডে পরিণত করে। পরিবর্ত্তন ঘটে এই ভাবে ঃ

সাদা সীসা + হাইড্রোজেন সালফাইড → লেড সালফাইড

লাল সীসায় বাদামী লাল কিছু কণা অনেক সময় মিশ্রিত থাকে। যদি প্রত্যক্ষ সূর্যালোকে এই জাতীয় চিত্র থাকে তাহলে এটি কালো রং-এ রূপান্তরিত হয়। তাই যে কোন ধরণের আলোর উৎস থেকে চিত্রকে সম্ভবমত দূরে রাখতে হবে।

বন্ধনকারী মাধ্যমে জালিকা ঃ আলো, তাপমাত্রাবৃদ্ধি বা পরিবেশদূষণ ছাড়াও রং-এর স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চিত্র প্রস্তুত করার সময় যদি একটি রং পুরোপুরি শুকনো হওয়ার পূর্বে তাড়াতাড়ি শুকোয় এমন কোন রং-এর প্রলেপ লাগানো হয় তাহলে পরবর্তী কালে রং-এর স্তরটিতে জালিকা দেখা দিতে পারে। প্রস্তুত করার সময় যদি কোন অপবস্তু বা ভুল পদার্থ দিয়ে চিত্র প্রস্তুত করা হয় তাহলে পরবর্ত্তী-কালে জালিকা দেখা দিতে পারে।

যদি বিটুমেন বা অ্যাসফালটাম চিত্রের বন্ধনকারী মাধ্যমে কোনভাবে মিশ্রিত থাকে তাহলেও চিত্রে জালিকা তৈরী হতে পারে।

অনেক সময় চিত্রের স্তরগুলি একটি থেকে আর একটি আলাদা হয়ে যায় এবং ভেঙ্গে যায়, এর ফলে চিত্রের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। প্রথমে এটি ছবির উপর একটি ফাটল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সোজাসুজি ছবির অন্তর্দেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। যদি অবলম্বন, ভিত্তিস্তর বা রং-এর স্তরে কোন খুঁত থাকে তাহলে চিত্র

ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যখন রং-এর স্তরটি ভেঙ্গে যায় তখন ধরে নেওয়া যায় যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে রং-এর কণাগুলির বন্ধনকারীর মাধ্যমে স্থিতিস্থাপকতা (elasticity)-বিনষ্ট হয়েছে। আপেক্ষিত আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটলে বন্ধনকারী মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হতে পারে।

ভারনিসের স্তর ঃ রং-এর উপর আর একটি প্রলেপ দিয়ে চিত্রটিকে সুরক্ষিত করা হয়। এই প্রলেপ দেওয়ার জন্য মোম, রেজিন, উদ্ভিজ্জ তেল, যেমন—তিসি (linseed) আখরোট (walnut), পোস্তদানা (poppy seed), সোয়াবীন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এর ফলে চিত্রটি অনেক উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়। রং-এর গভীরতা (depth) ও জ্যোতি (luminosity) এবং গঠনশৈলীর একাত্মতা বৃদ্ধি পায়। এটি চিত্রের দৈহিক প্রতিরক্ষার কাজ করে ও প্রত্যক্ষ পরিবেশ ও দূষিত বায়ু থেকে চিত্রটিকে মুক্ত রাখে।

বাহ্যিক মলিনতা ঃ চিত্রের উপরিভাগ কোন কোন সময়ে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত ও মলিন হয়। ধুলো, বালি, ধোঁয়া, আর্দ্রতা, তাপ, বায়ুর চাপ, ক্ষতিকারক গ্যাস ইত্যাদি দ্বারা ভারনিসের স্তরটির ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। ভারনিসের স্তরটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে কিন্তু যথাযথভাবে সংরক্ষিত না করা হলে প্রথমে একটু ঘোলাটে ভাব দেখা যায় ও ক্রমশঃ এর স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে হলুদ ও বাদামী রং-এ রূপান্তরিত হয়। এই স্তরটি বাইরে থাকে বলে তাড়াতাড়ি জারিত হয়। এ ছাড়া বাইরের ধুলো, বালি, ময়লা, কালি ক্রমশঃ ভারনিসের স্তরের উপর জমা হতে থাকে এবং আর্দ্র পরিবেশে এরা আরো ঘনীভূত হয়ে স্তরটির আরও ক্ষতিসাধন করে। চিত্র যদি দীর্ঘদিন অন্ধকার জায়গায় রাখা হয় তাহলে এর উপর কালো কালো দাগ পড়তে পারে। পরবর্ত্তীকালে বিবর্ণ ও অস্বচ্ছ হয়ে যেতে দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তনকে ব্লুমিং বলা হয়। ভারনিসে মধ্যে অনেক সময় ফাটল দেখা যায় এবং ফাটল-গুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সমস্ত স্তরটিতে জালিকা তৈরী করে। এই জালিকাগুলি নানা অপবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায় ও রং-এর স্তরটি এর ফলে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে চিত্রে ব্যবহৃত উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ ও চিহ্নিত করা যায়। আণুবীক্ষণিক যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা যায়।

রং-এর স্তর বিশ্লেষণ ঃ পরীক্ষার জন্য চিত্রের কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে অল্প পরিমাণ রং তুলে নেওয়া হয়। হোয়াইট লেড এবং বেসিক লেড কার্বনেট চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। অল্প পরিমাণ রং একটি স্লাইডের উপর রেখে এক ফোঁটা তরল নাইট্রিক অ্যাসিড রং-এর উপর প্রয়োগ করলে যদি সঙ্গে সঙ্গে গলে যায় তাহলে হোয়াইট ও বেসিক লেড কার্বনেট ব্যবহৃত হয়েছে বোঝা যায়। স্লাইডটি নিয়ে অল্প গরম করে তারপর শুকিয়ে নিলে লেড নাইট্রেট স্ফটিকে পরিণত হয়। যদি কপারগ্রীন, যেমন ম্যালাচাইট, ভাডীগ্রিস, অথবা

এমারেল্ড গ্রীন ছবিতে থাকে তাহলে অল্প পরিমাণ রং স্লাইডের উপরে রেখে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করলেই দ্রবীভূত হবে। তামাযুক্ত কোন পদার্থ রং-এ থাকলে অল্প পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ও পরে এক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করলে গোলাপী লাল কপার ফেরোসায়ানাইডে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। অল্প পরিমাণ তরল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রয়োগ করলে যদি নমুনাটি বাদামী রং-এ রূপান্তরিত হয় তাহলে এতে প্রুসিয়ান-ব্লু আছে ধরে নেওয়া যায়। এরপর যদি আবার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করা যায় তাহলে এটি নীল রঙে রূপান্তরিত হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ঃ চিত্রের উপরিভাগ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ১০ থেকে ২৫ গুণ বিবর্ধিত করে চিত্রটি পরীক্ষা করে যদি রং-এর স্তরে কোন খুঁত থাকে অথবা রং দিয়ে চিত্রটি সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে তা চিহ্নিত করা সম্ভব। এছাড়া চিত্রে আণুবীক্ষণিক প্রাণীর উপস্থিতি, ধুলো, বালি, ময়লা, তৈলাক্ত পদার্থের উপস্থিতি ও বিবর্ণ হয়ে যাওয়া অংশগুলি পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। উপরিভাগে যদি জালিকা বা ফাটল থাকে তাও বোঝা যায়। কিছু কিছু চিত্রের অবলম্বন কি ধরনের বস্তু দিয়ে গঠিত তা জানার জন্যও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা যায়।

মাইক্রোটম যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ঃ এই যন্ত্রে চিত্রের ক্ষুদ্র অংশ সূক্ষ্ম ভাবে কেটে নেওয়া হয় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। যদি চিত্রের স্তরগুলিতে কোন খুঁত থাকে তা চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও ফোটোমাইক্রোগ্রাফি, ইনফ্রা-রেড-ফটোগ্রাফি, কালার অ্যানালিসিস, কালার মেজারমেণ্ট, কোয়ার্টজ ল্যাম্প একজামিনেশন প্রভৃতি পদ্ধতিতে চিত্রের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। যথাযথভাবে চিত্র সংরক্ষণ করার জন্য এই তথ্যগুলি বিশেষভাবে কাজে লাগানো যায়।

সংরক্ষণ ঃ চিত্র বিশেষতঃ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াতে তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য, যদি না এদের পরিমিত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও দূষণমুক্ত পরিবেশের মধ্যে রাখা যায়।

ছত্রাকের আক্রমণ ঃ ছবির বয়স বাড়ার সাথে সাথে চিত্রে ব্যবহৃত জৈব বস্তুগুলি ভাঙতে থাকে ; ফলে শুরু হয় জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ অনেক সময় শুরু হয় পচনক্রিয়া এবং নানান কীট ও আণুবীক্ষণিক প্রাণী এর ফলে বংশবিস্তার করে। এই বংশবিস্তার রোধ করার জন্য ছত্রাক ও কীটনাশক ওষুধ দেওয়ার দরকার। তৈলচিত্রের উপরিভাগটি নরম করে নিয়ে তারপর ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত, কারণ ছত্রাকের শাখাপ্রশাখাগুলি রং-এর স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে ও বংশবিস্তার করে। জলরং-এর চিত্রে সব কীটনাশক ঔষধ ভালোভাবে কাজ করে কিন্তু এতে আবার দাগ পড়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন ক্লোরিনযুক্ত ফেনলের ছত্রাক নষ্ট করার ক্ষমতা অসীম কিন্তু এটি ব্যবহার করলে পরবর্তীকালে অ্যাসিড তৈরী হতে পারে এবং দাগ পড়তে পারে। পেণ্টাক্লোরোফেনল ১-২ শতাংশ ছত্রাকনাশক ঔষধ হিসাবে ভালো কাজ করে।

পোকার আক্রমণ : কিছু কিছু পোকা ছবি কেটে নষ্ট করে যেমন উড্ বিটল, অ্যানোবিয়াম ইত্যাদি। এদের ডিম্বাণুগুলি কাঠের মধ্যে নালা করে প্রবেশ করে ও ফ্রেমটি নষ্ট করে। চিত্রটিকে নানান জায়গায় ফুটো ফুটো করে দিতেও দেখা গেছে। এই ধরনের আক্রমণ হলে ছবিটিকে অন্য ছবির থেকে আলাদা করতে হবে এবং উপযুক্ত বাষ্পায়ন কক্ষে রেখে নির্বীজিত করতে হবে। কীটনাশক পদার্থ হিসাবে এমন ঔষধ ব্যবহার করা দরকার যাতে রং-এর স্তর বা ভারনিসের কোন ক্ষতি না হয়। কার্বন-ডাই-সালফাইড বাষ্পায়িত করে নির্বীজিত ও কীটমুক্ত করা যায়। বাষ্পায়িত করার পর ছবিটি কিছু দিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

ক্যানভাসে ছত্রাকের আক্রমণ : ক্যানভাস চিত্রে নানান ধরনের আঠা ব্যবহার করা হয় এবং এর ফলে ছত্রাক আক্রমণ করতে পারে বিশেষত যদি ছবিগুলি আর্দ্র ও গরম জায়গায় থাকে। ছবির উপর ছাতা পড়তে দেখা যায় এবং যে জায়গায় ঘন রং থাকে সেই জায়গাগুলি অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছবির কোন অংশে ফাটা থাকলে সেই জায়গায় এরা খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। এদের বিস্তার রোধ করার জন্য ছবিটিকে ভালোভাবে অল্প রোদ ও বাতাস যুক্ত ঘরে রাখতে হবে। ছবিটি যদি কাঁচ দিয়ে বাঁধানো হয় তাহলে কাঁচটিকে খুলে নির্বীজিত করতে হবে। কাঁচ নির্বীজিত করার জন্য ফরম্যালিন ব্যবহার করা যায়। ছবিটি যদি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে এর উপরিভাগ অল্প ফরম্যালিন দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। ছবির পেছনের দিকে স্যানটোব্রাইট ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করা যায়।

আর্দ্রতানিয়ন্ত্রণ : বায়ুতে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ যদি ৬০ শতাংশের কম হয় তাহলে চিত্রে ছত্রাক ও অন্যান্য আণুবীক্ষণিক প্রাণীর বংশবিস্তার নিয়ন্ত্রিত হয়।

চিত্রের উল্টোপিঠ পরিষ্কার করা : চিত্রের উল্টোপিঠে নানান পোকা আক্রমণ করে এবং মাইটস্ জাতীয় পোকা একটি চিত্র থেকে কিছু কিছু ছত্রাকের গুটি (Spore) বহন করে অন্য চিত্রে নিয়ে যায় ফলে সেই চিত্রটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছবিটির উল্টোদিক ও উপরিভাগ সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। পাটা চিত্রে উই পোকা কাঠ খেয়ে নষ্ট করে দিতে পারে বিশেষত যদি ছবিটি অন্ধকার ও আর্দ্রতার মধ্যে থাকে। ছবিকে দেওয়ালের উপর এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে ছবি ও দেওয়ালের মাঝখানে ফাঁক ও যথেষ্ট পরিমাণ বায়ুচলাচলের সুবিধা থাকে।

বহু চিত্র কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা হয়। প্রত্যক্ষভাবে এটি ছবিকে বায়ুমণ্ডল থেকে আলাদা করে রাখে, কিন্তু এতে চিত্র কতখানি সুরক্ষিত হয়, বা সংরক্ষণ করা সম্ভব তা বিতর্কিত ব্যাপার। আর্দ্র বায়ু কাঁচের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে চিত্রকে বিবর্ণ করে ও আণুবীক্ষণিক প্রাণীর বংশবিস্তারে সহায়তা করে। আবার মরুভূমি অঞ্চলে চিত্র সংরক্ষণ করার জন্য কাঁচ ব্যবহার করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ অতিরিক্ত তাপমাত্রায় চিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

জল রং-এর চিত্র সংরক্ষণ সমস্যা ঃ জল রং-এর চিত্র সংরক্ষণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এটি ঝুলিয়ে রাখলে বা খোলা জায়গায় রাখলে নানা পোকা কেটে নষ্ট করতে পারে ও চিত্রের উপর নানা দাগ দেখা দিতে পারে। এগুলি পরিমিত আর্দ্রতায় এবং পোকা যাতে সহজে আক্রমণ না করতে পারে এই রকম জায়গায় রাখতে হবে। কাঠের বা ধাতু নির্মিত আলমারিতে এগুলি রাখা যায়। কি ধাতু-নির্মিত আলমারি যথেষ্ট জলীয় বায়ু শোষণ করতে পারে এবং এতে আলমারির উপর মরচে পড়ে যা চিত্রটিকে অতিরিক্ত পরিমাণ নমনীয় করে দিতে পারে। তাই আর্দ্রতার পরিমাণ কমানোর জন্য আলমারির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সিলিকা জেল রাখা দরকার। আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৪০ শতাংশের বেশি বা কম না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আলমারির মধ্যে আর্দ্রতা-নির্দেশক (humidity indicator) কাগজ রাখা যায়। কাগজের রং-এর পরিবর্ত্তন থেকে আর্দ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ণয় করা যায়।

খুব সূক্ষ্ম জল রং-এর চিত্র সংরক্ষণ করার জন্য প্লিক্সিগ্লাস দিয়ে এটি বাঁধিয়ে রাখা যায়। এটি অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করতে পারে এবং জলীয় বাষ্প-এর উপর জমতে দেয় না।

চিত্রের উপরিভাগ পরিষ্কার করা ঃ জল রং-এর চিত্রের উপরিভাগ পরিষ্কার করার জন্য ডেকালিন অথবা টেট্রালিন ব্যবহার করা যায়। খুব পুরাতন, কালো, ঘন কোপাল রেজিন পরিষ্কার করা বেশ কঠিন কারণ এটি সহজে দ্রবীভূত হয়না। এই ধরনের ভারনিস্ পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে অ্যাসিটোন লাগিয়ে তারপর যদি ফোঁটা ফোঁটা অ্যামোনিয়া দেওয়া হয় তাহলে এটি অপসারিত করা যায়। তবে চিত্রে যদি ঘন নীল কোন রং থাকে তাহলে যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে রাসায়নিক পদার্থগুলি ব্যবহার করা উচিত।

চিত্রের মধ্যে ফাঁকা অংশ ভর্ত্তি করা ঃ গেসো জাতীয় পদার্থ দিয়ে চিত্রে ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করা উচিত নয়, কারণ তাপমাত্রা কম বা বেশি হলে এর সংকোচন বা প্রসারণ ঘটে। চিত্রের ফাঁকা অংশ বন্ধ করার জন্য ওয়াক্স্ রেজিন ব্যবহার করা যায়। এই ওয়াক্স্ রেজিন, বীস ওয়াকস, এ ডবলিউ-টু (AW2) রেজিন, গ্যাম এলিমি এবং কেয়োলিন মিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয়। এটি সহজে লাগানো ও প্রয়োজন হলে সহজে অপসারিত করা যায়।

পাটা চিত্র

পাটা চিত্র ঃ কাঠের পাটার কখনো একদিকে অথবা কখনো উভয়দিকে চিত্র অংকন করা হ'ত। কখনও একটি পাটা আবার কখনও অনেকগুলি ছোট পাটা [illegible]

ক্যাসিনেট বা লোহার কাঁটা দিয়ে অথবা একদিকে কাঠ লাগিয়ে জোড়া দিয়ে চিত্র অংকন করার জন্য ব্যবহার করা হ'ত। যদি পরিমিত আদ্রর্তা ও তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অংকিত পাটাগুলি রক্ষিত হয় তাহলে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। কিন্তু হঠাৎ যদি ভিন্ন পরিবেশে এগুলি স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে চিত্রে কিছু কিছু ভৌত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। যদি জোড়া দেওয়া পাটার একদিক অংকিত থাকে তাহলে প্রত্যেকটি পাটা আস্তে আস্তে বাঁকতে শুরু করে এবং চিত্রিত দিকটির জোড়া দেওয়া অংশগুলিতে ফাটল দেখা দেয়। আপেক্ষিক আদ্রর্তা ও তাপমাত্রার উপর পাটা চিত্রের স্থায়িত্ব বিশেষভাবে নিভর্রশীল।

চিড় খাওয়া ঃ বড় পাটায় যখন এক দিক চিত্রিত থাকে এবং যদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে চিত্রে চিড় পড়তে দেখা যায়। স্থানান্তরিত করলে চিত্রটি ফেটে যেতে পারে। চিত্রটি যদি এমন কোন জায়গায় রাখা থাকে যেখানে এর কিছু অংশে সুর্যের আলো পড়ে অথবা গরম বাতাস লাগে তাহলে চিত্রটি ফেটে যাবে। যদি পাটার চিত্রিত দিকটি উত্তল (convex) হতে দেখা যায় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি সংরক্ষণ করার কাজে হাত দেওয়া উচিত।

পাটার এই ভৌত পরিবর্ত্তন দুটি কারণে ঘটতে পারে ঃ (১) যদি অতিরিক্ত তাপযুক্ত পরিবেশে দীর্ঘ সময় এটি রাখা হয়—যেমন যদি সুর্যালোকে বেশি সময় এটি ফেলে রাখা হয়। অতিরিক্ত তাপযুক্ত ঘরে দীর্ঘ সময় রাখা থাকলেও চিত্রের এই পরিবর্ত্তন হতে পারে ; (২) যদি কোন নির্দিষ্ট আপেক্ষিক আদ্রর্তা ও তাপে চিত্রটি ভারসাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং এই জাতীয় চিত্র যদি হঠাৎ স্থানান্তরিত করে ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে চিত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হয় ও ভৌত পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। এর কারণ, অচিত্রিত দিকটি থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্প নির্গত হওয়ার ফলে কোষগুলির সংকোচন ঘটে ও পাটাটি পিছনের দিকে বাঁকতে থাকে।

সংরক্ষণ ঃ এই অবস্থায় পাটা চিত্র সংরক্ষিত করতে হলে প্রথমে যথেষ্ট আদ্রর্তা-যুক্ত ঘরে চিত্রটিকে রেখে জলীয় বাষ্প শোষণ করার সুযোগ দিতে হবে। পাটাটি সোজা অবস্থায় এবং চিত্রিত অংশটি উল্টে পিছনের দিকে রাখতে হবে। যদি পাটাটি এমন কোন বস্তু দিয়ে আটকানো থাকে যার ফলে এটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে গেলে বাধা প্রাপ্ত হবে তাহলে সাবধানে এই বস্তুগুলি অপসারিত করা দরকার। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যদি অচিত্রিত দিকটিতে ভেজা ব্লটিং পেপার বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও পাটাটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে এটি শক্তিশালী করার জন্য যে বস্তুগুলি খুলে নেওয়া হয়েছিল তা আবার লাগিয়ে দেওয়া উচিত। চিত্রে যদি কোন কারণে ফাটল দেখা যায় তাহলে প্লাস্টারের পুট্টি দিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া যায়। পুট্টি দিয়ে ভর্তি করে শুকনো করে নিতে হবে এবং এই জায়গা গুলিতে এমনভাবে রং লাগাতে হবে যাতে চিত্রের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে। অনেক সময় পাটা চিত্রের রং-এর স্তরটিতে ফাটল ধরতে ও এটি

ভিত্তিস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখা যায়। অবলম্বন ও ভিত্তিস্তরের চিত্রিত অংশটির ধারণ করার ক্ষমতা বিনষ্ট হলে এই পরিবর্তন দেখা যায়। এই সব ক্ষেত্রে অবলম্বন পরিবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই কাজ করা সম্ভব নয়।

পাটা চিত্রের ভারনিস অপসারণ ঃ পাটা চিত্রের ভারনিস অপসারিত করা যায় ২ ভাগ অ্যাসিটোন ও ১ ভাগ ডাই-অ্যাসিটোনের মিশ্রণ ব্যবহার করে। এই দ্রবণ ব্যবহার করলে উপরের স্তরটি দ্রবীভূত হবে এবং এটি সহজেই পরিষ্কার করা যাবে।

ক্যানভাস চিত্র

ক্যানভাসকে অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করে বহু চিত্র অংকিত করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করার সুবিধা এবং অসুবিধা দুইই আছে। চিত্র অংকন করার পূর্বে এর উপর ভিত্তিস্তর প্রস্তুত করা হ'ত। অনেক সময় তিসির তেল বা গর্জন তেল ও সাদা সীসার চূর্ণ এক সংগে মিশ্রিত করে প্রলেপ দেওয়া হ'ত। পরে রং ও ভারনিস্ দিয়ে চিত্র সম্পূর্ণ করা হ'ত।

ক্যানভাসে ছিদ্র বন্ধ করা ঃ এই চিত্রকে অনেক সময় ফুটো ফুটো হয়ে যেতে দেখা যায়। এগুলি যদি সময়মত মেরামত না করা হয় তাহলে চিত্রের ক্ষতি হতে পারে। এই ছিদ্র বন্ধ করা হয় পিছনের দিকে কাপড় জোড়া লাগিয়ে। প্রথমে চিত্রটিকে উল্টে নিতে হবে এবং চিত্রিত দিকটি একটি কাঁচের টেবিলের উপর অয়েল পেপার দিয়ে তার উপর রাখতে হবে। ছিদ্রের আয়তনের চাইতে সামান্য বড় কাপড় মাপমত কেটে নিয়ে এর প্রান্তদেশের সুতোগুলি বার করে দিতে হবে। এখন ছিদ্রের চারিদিকে নরম ব্রাশ দিয়ে যদি কোন অপবস্তু জমা থাকে তা পরিষ্কার করে রাবার আঠা বা অন্য কোন আঠা লাগিয়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট কাপড়টির প্রান্তদেশেও একই আঠা লাগিয়ে ছিদ্রটির উপর বসিয়ে দিতে হবে। একটি অল্প গরম ইস্ত্রি আস্তে আস্তে কাপড়টির উপর চালিয়ে দিলে কাপড়টি ভালোভাবে ক্যানভাসের উপর আটকে যাবে।

যদি ছিদ্রযুক্ত ক্যানভাসটি কোঁচকানো অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে একে যথেষ্ট আর্দ্রতাযুক্ত কক্ষে রাখতে হবে যাতে এটি নমনীয় হতে পারে, এবং এরপর আগের মত উল্টে নিয়ে অয়েল পেপারের উপর রাখতে হবে। ছিদ্রের আয়তনের চাইতে বড় কাপড় কেটে নিয়ে এর প্রান্তদেশ থেকে একই পদ্ধতিতে সুতো বার করে দিতে হবে। এখন ছিদ্রের চারিদিকে এবং কাপড়টির প্রান্তদেশে আঠা লাগিয়ে ছিদ্রের উপর এমনভাবে বসিয়ে দিতে হবে যাতে কোনভাবে কুঁচকে না যায়। গরম ইস্ত্রি চালিয়ে কাপড়টিকে ভালোভাবে চিত্রের উপর আটকে দেওয়া যায়। চিত্রের উপরিভাগে সংস্কার করা

জায়গাগুলি নীচু হয়ে থাকতে পারে এবং এই জায়গাগুলিতে তিসির তেল ও হোয়াইটিং মিশ্রিত করে পুট্টির প্রলেপ দেওয়া যায়।

যদি কোন চিত্রে একাধিক বড় ছিদ্র থাকে তাহলে এটি সংরক্ষণ করার জন্য চিত্রে ব্যবহৃত ক্যানভাসের মতই একটি ক্যানভাসের খণ্ড সংগ্রহ করা দরকার। বিশেষত চিত্রের ক্যানভাসের বুনন প্রক্রিয়া ও বেধ এবং সংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট ক্যানভাস যাতে একই ধরনের হয় তা দেখতে হবে। ক্যানভাসের খণ্ডটিকে নিয়ে এর উপর চিত্রের ব্যবহৃত উপাদান দিয়ে ভিত্তিস্তর প্রস্তুত করতে হবে ও ছিদ্রের ঠিক আয়তন মত এটি কেটে নিয়ে যথাযথভাবে ছিদ্রে বসিয়ে দিতে হবে। সেলোটেপ দিয়ে পিছনের দিক থেকে এটি আটকে দিতে হবে। এবারে অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড়ে আঠা লাগিয়ে আগের মত চিত্রের সঙ্গে এটি জোড়া দেওয়া যায়। চিত্রিত দিকটিতে ক্যানভাসটি যদি ভালোভাবে জোড়া না লাগে তাহলে পুট্টি দিয়ে এগুলি মেরামত করা যায়। বিশেষজ্ঞ দিয়ে চিত্রে পুনরায় রং লাগিয়ে বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত করা যায়।

জীর্ণসংস্কার (Repair) ঃ যখন কোন চিত্র বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে ছিঁড়ে যায় তখন এটি সংরক্ষণ করা বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে যায়। প্রথমে ছেঁড়া জায়গার অংশগুলি এক জায়গায় আনা দরকার যাতে একটি আর একটির সঙ্গে মিশে যায় ও বোনা অংশটি পরিষ্কার দেখা যায়। এবারে চিত্রটিকে উল্টে দিতে হবে এবং আগের মত অয়েল পেপারের উপর রাখতে হবে। সেলোটেপ দিয়ে সব ছেঁড়া অংশগুলি আটকে দিতে হবে। এখন একটি ছেঁড়া অংশের চাইতে বড় আয়তনের কাপড় জোড়া দেওয়ার জন্য কেটে নিতে হবে ও প্রান্তভাগগুলি থেকে কিছু সুতো বার করে দিতে হবে। এতে পলিভিনাইল অ্যাসিটেট মণ্ড বা ইপক্সি রেজিন লাগিয়ে ছেঁড়া জায়গায় বসাতে হবে। তবে কাপড়টি বসানোর পূর্বে সেলোটেপ খুব সাবধানে অপসারিত করতে হবে যাতে ছেঁড়া অংশগুলি স্থানচ্যুত না হয়। অল্প গরম ইস্ত্রি দিয়ে কাপড়টি ভালোভাবে আটকে দেওয়া যায়। চিত্রটি উল্টে নিয়ে পুট্টি দিয়ে ক্ষত জায়গাগুলি সংস্কার সাধন করা যায়।

চিত্রের প্রান্তভাগ সংস্কার ঃ ক্যানভাস চিত্রে অনেক সময় প্রান্তভাগ সাংঘাতিকভাবে দুর্বল হয়ে যেতে দেখা যায়। এর ফলে সমস্ত চিত্রটির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। প্রান্তভাগ সংরক্ষণ করার জন্য যে ধরনের ক্যানভাসে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে ঠিক সেই জাতীয় ক্যানভাসের টুকরো জোড়া দেওয়া যায়। এরজন্য নির্দিষ্ট ক্যানভাস থেকে দুর্বল জায়গার চাইতে বড় আয়তনের ক্যানভাস কেটে নিয়ে প্রান্তভাগ থেকে সুতো বার করে নিতে হবে। এবং এতে অ্যারালডাইট লাগিয়ে দুর্বল স্থানে বসিয়ে দিতে হবে। এর উপর অল্প ওজন চাপিয়ে ৫-৭ ঘণ্টা রাখতে হবে যাতে ক্যানভাসটি ভালোভাবে চিত্রের উপর আটকে যায়।

চিত্র সংরক্ষণ করার বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি ঃ যদি কোন চিত্রের নরম রেজিনের

স্তরটি অপসারিত করে আবার রেজিন লাগানোর প্রয়োজন হয় তাহলে প্রথমে ছবিটিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা দরকার। চিত্রটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সব কিছু নথিভুক্ত করতে হবে। এখন চিত্রটির উপরিভাগে একটি মালবেরি কাগজে ময়দার আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর লিনেন জাতীয় বস্তুর একটি অবলম্বন নিয়ে তাতে আঠা লাগিয়ে চিত্রের নিচে আটকে দিতে হবে। উপরিভাগের ভারনিস অপসারিত করার জন্য অ্যালকোহল, জাইলিন ব্যবহার করা যায়। চিত্রের অল্প জায়গায় জাইলিন ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়; অন্ততঃ দশ মিনিট পর ভারনিস-এর স্তরটি জেলীর আকার ধারণ করে। এখন তুলোয় জাইলিন দ্রবণ লাগিয়ে আস্তে আস্তে ভারনিস অপসারিত করা যায়।

চিত্রের শ্রেণী অনুসারে ও ভারনিসের গুণাগুণ অনুসারে দ্রাবক ব্যবহার করা হয়। দ্রাবক এমন হবে যাতে রং-এর কোন ক্ষতি না হয়। অনেক সময় অ্যাসিটোন ভারনিস অপসারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু অ্যাসিটোন সব সময়ই টায়পেনটাইন অথবা রেক্টিফাইড পেট্রোলিয়ামের সাথে এমন অনুপাতে মিশ্রিত করা দরকার যাতে চিত্রের রং-এর স্তরে কোন ক্ষতি না হয়। চিত্র অনুসারে এই অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এবং এর জন্য ছোট একটি জায়গায় প্রথমে পরীক্ষা চালানো উচিত। দেখা যায় ৪০ আয়তন অ্যালকোহল ও ২০ আয়তন টারপেনটাইন মিশ্রিত করে ব্যবহার করলে রং-এর স্তরে খুব বেশি ক্ষতি হয়না। এছাড়া যদি ২:২০ অনুপাতে অ্যালকোহল ও টারপেনটাইন মিশ্রিত করা যায় তাহলেও ভালো কাজ হয়। এর পরিমাণ যখন ১:২০ করা হয় তখন ভারনিসের স্তরটি অপসারিত করতে অনেক সময় লাগে এবং এতে রং-এর স্তরটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভারনিস পরিষ্কার করার সময় কোন রং-এর কণা তুলোয় লেগে যাচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার। যদি কোন ভাবে রং-এর কণাগুলি তুলোয় লেগে যেতে দেখা যায় তাহলে টারপেনটাইন দিয়ে দ্রবণটি তরল করে নিতে হবে। এইভাবে আগে অল্প জায়গায় পরীক্ষা করে সুফল পাওয়া গেলেই কেবল ব্যাপকভাবে ভারনিস অপসারণ করার কাজে হাত দেওয়া উচিত।

পুনরায় অবলম্বন লাগানো এবং বিবর্ণ ভারনিস অপসারণ :

কোন চিত্রে পুনরায় অবলম্বন লাগানো এবং মলিন ও বিবর্ণ ভারনিস তুলে ফেলতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

ভারনিস গলিয়ে তুলে ফেলার জন্য ২ ভাগ অ্যাসিটোনের সাথে ১ ভাগ ডাই-অ্যাসিটোন অ্যালকোহল মিশ্রিত দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। রং-এর উপরিভাগটি যদি মলিন হয়ে যায় তাহলে তা পরিষ্কার করার জন্য ২:১ অনুপাতে অ্যাসিটোন ও ডাই-অ্যাসিটোন অ্যালকোহলের মিশ্রণের সঙ্গে অল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশ্রিত করে ব্যবহার করলে ভালো ফল দেয়। এখন উপরিভাগটি পরিষ্কার করার পর এর উপর দু খণ্ড মালবেরি কাগজ ময়দার আঠা দিয়ে ভালোভাবে আটকে দিতে হবে। চিত্রটিকে এবারে অল্প শুকনো করে উল্টে নিতে হবে এবং ক্যানভাসটি আস্তে আস্তে খুলে নিতে হবে। যদি ক্যানভাসটি খুব দৃঢ়ভাবে ভিত্তিস্তরের সঙ্গে আটকে

থাকে তাহলে একটি একটি করে সুতো বার করে নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ-ভাবে অবলম্বনটি আলাদা করা যায়। যদি ক্যানভাসটি অক্ষত অবস্থায় বার করে নেওয়া যায় তাহলে এটি থাইমল অথবা ৫ শতাংশ ইথাইল অ্যালকোহল দিয়ে কীটমুক্ত ও নির্বীজিত করা দরকার। ক্যাসভাসটিতে এখন মোম-রেজিন আঠা অথবা অন্য কোন আঠা দিয়ে চিত্রটিকে টান টান করে লাগিয়ে দিতে হবে। চিত্রটি উল্টে নিয়ে এবার মালবেরি কাগজটি অপসারিত করার পর লেগে থাকা আঠা পরিষ্কার করে নিতে হবে। চিত্রের কোথাও যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উপযুক্ত রং লাগাতে হবে। এরপরে পলিভিনাইল অ্যাসিটেট অথবা ১০ শতাংশ ইথাইল অ্যালকোহল লাগিয়ে শুকনো করে তারপর মোম দিয়ে উপরিভাগটি আবৃত করা উচিত।

নরম ভারনিস অপসারিত করা ঃ চিত্রে ব্যাপকভাবে নরম ভারনিসের ব্যবহার দেখা যায়। যদি কোন চিত্রের ভারনিসের স্তরটি মলিন, বিবর্ণ ও ভঙ্গুর হয় এবং উপরিভাগটি কুঁচকে যায়, হলুদ দাগ পড়ে, গাঢ় রংগুলির উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রান্তভাগের ক্যানভাসটি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্রের উপরিভাগে মালবেরি কাগজ ময়দার আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। হাল্কা লিনেনের অবলম্বন ভালোভাবে মোমের আঠা দিয়ে চিত্রের নীচে আটকে দেওয়া যায়; ফলে অবলম্বনের স্তরটি শক্তিশালী হয় এবং এটি ভিত্তি ও রং-এর স্তরটিকে ভালোভাবে ধরে রাখতে পারে। এবারে মালবেরি কাগজ সরিয়ে নিয়ে অ্যালকোহল অথবা কিটোনস্ দিয়ে ভারনিস্ অপসারণ করা যায়। এতে রং-এর স্তরটিও নমনীয় হয়; ফলে রংএর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা সুবিধা-জনক হয়।

পুনরায় রং লাগানো ঃ চিত্র সংরক্ষণ করতে গিয়ে যদি এর মূল রং-এর বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সেই জায়গায় কোন নূতন কৃত্রিম রং লাগিয়ে ছবি সংরক্ষণ করা উচিত নয়। তবে যদি কোথাও কোন রং ঘষা লাগার ফলে বিবর্ণ হয়ে যায় তাহলে এই সব ক্ষেত্রে ছবির নান্দনিক উৎকর্ষ রক্ষা করার জন্য একই জাতীয় রং লাগানো যায়। চিত্রে যদি লিখিত কোন অংশ থাকে—বিশেষতঃ শিল্পীর স্বাক্ষর তাহলে তাতে কোন রং ব্যবহার করা উচিত হবে না। চিত্রে রং ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামত অবশ্যই নেওয়া উচিত।

পুনরায় ভারনিস লাগানো ঃ চিত্রে যখন ভারনিসের স্তরটি নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন ভারনিস অপসারিত করে নতুন ভারনিস লাগানো প্রয়োজন হয়। ম্যাসটিক, ড্যামার, মোম, পলিভিনাইল অ্যাসিটেট ভারনিস হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ম্যাসটিক ভারনিসে চিত্রের উজ্জ্বলতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় কিন্তু যেহেতু টারপেনটাইন মিশিয়ে এটি প্রস্তুত করা হয় তাই কিছু সময় পরে ভারনিস হলুদ বর্ণে রূপান্তরিত হতে পারে। ড্যামার ভারনিস স্পিরিটে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যায় এবং এটি সাধারণতঃ বিবর্ণ হয়ে যায় না। ১১৩'৩৯ গ্রাম ড্যামার-এ ০'৫৬৮২৩

িলটার বিশুদ্ধ স্পিরিট ও অল্প পরিমাণ স্ট্যান্ড অয়েল মিশ্রিত করে ড্যামার রেজিন প্রস্তুত করা যায়।

চিত্রের উপরিভাগ সম্পূর্ণ শুকনো হওয়ার পর, এবং ধুলো, বালি, ময়লা, ইত্যাদি পরিষ্কার করার পর ব্রাশ দিয়ে বা স্প্রে করে ভারনিস লাগানো যায়। ভারনিস প্রথমে চওড়া দিকে সমান্তরালভাবে ও পরে লম্বালম্বিভাবে লাগানো উচিত।

জড়ানো পটচিত্র

জড়ানো পটচিত্র লোক-সংস্কৃতির মাধ্যম। পটচিত্রগুলি নানান অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন ভাঁজ পড়া, জোড়াতালি দেওয়া ইত্যাদি, এবং এগুলি সংরক্ষণ করা বেশ কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ পটে প্রান্তভাগগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। যদি প্রান্তভাগগুলি সময়মত সংরক্ষিত করা না যায় তাহলে সমস্ত পটটাই নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। পটে জোড়াতালি (patch) দেওয়ার জন্য সাধারণতঃ ময়দার আঠা ব্যবহার করা হয়। ফলে দেখা যায় সময় যত বাড়ে পটের ততই নমনীয়তা কমতে থাকে এবং খুলতে গেলেই ফেটে যায়। এছাড়াও যদি লম্বালম্বি অবস্থায় পট দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখা হয় তাহলেও মাঝে মাঝে পটটিতে ফাটা অংশ দেখতে পাওয়া যায়। ময়দার আঠা ব্যবহার করার ফলে নানান ধরনের আণুবীক্ষণিক প্রাণী (micro-organisms) পটে বংশবিস্তার করে। তাই পটচিত্র সংরক্ষণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার।

ভাঁজপড়া, জোড়াতালি দেওয়া ও শক্ত হয়ে যাওয়া পট প্রথমে নমনীয় (flexible) করা দরকার। নমনীয় করার জন্য জোড়াতালি দেওয়া অংশগুলি সাবধানে আস্তে আস্তে পট থেকে খুলতে হবে এবং কোনভাবে ক্ষতি না করে পটটিকে পুরোপুরি খুলে কোন একটি পরিষ্কার অবলম্বনের (support) উপর রাখতে হবে। সূর্যের আলোতে ও বৈদ্যুতিক আলোতে আলাদা আলাদাভাবে পুরো পটটির ছবি নিতে হবে।

পটের খণ্ডগুলির ছবি এমনভাবে নিতে হবে যাতে একটি ছবির প্রান্তভাগ আর একটি ছবির প্রান্তভাগকে অধিক্রমণ (overlap) করে। কারণ সংরক্ষণ করার পর পটের খণ্ডিত অংশগুলি মিলিয়ে লাগাতে এতে খুব সুবিধা হয়। পটগুলির আলোকচিত্র তুলে রাখা দরকার, সংরক্ষণ করতে গিয়ে যাতে পটের বৈশিষ্ট্য নষ্ট না হয়। পটের অংশগুলি সুতো দিয়ে সেলাই করা থাকে এবং অংশগুলি আলাদা করার জন্য সুতোগুলি আস্তে আস্তে খুলে নিতে হবে। আলাদা করে নেওয়ার পর এক একটি অংশকে সংরক্ষিত করতে হবে।

পটে নানান ধরনের রংএর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। এই রংগুলির মূল উপাদান হ'ল শিলাজাত, মৃত্তিকা ও ভেষজ পদার্থ। রং-এর কণাগুলিকে আঠা বা আঠা জাতীয় পদার্থের সাথে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরী করা হয় ও ব্যবহার করা হয়।

লাক্ষা (lac) থেকে লাল রং পটে ব্যাপক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে অবশ্য কৃত্রিম রংও ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন—নীলাভ লাল (Anilin Red) ইত্যাদি।

পটে যে সব রং ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের অধিকাংশ জলের সংস্পর্শে এলে ধুয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। জোড়া বা তালি দেওয়া অংশগুলিকে নমনীয় করে তোলার জন্য জল ব্যবহার করা যায় কিন্তু জল ব্যবহার করার আগে যাতে কোনভাবে রং ধুয়ে না যায় বা ক্ষরিত (bleed) না হয় তা সুনিশ্চিত করা দরকার। নমনীয় করার জন্য যে অংশে জল লাগনো দরকার সেই অংশে পলিভিনাইল অ্যাসিটেট ১ শতাংশ দ্রবণ দু-তিন বার লাগিয়ে দিতে হবে। পলিভিনাইল অ্যাসিটেট দ্রবণ টলুইনে দ্রবীভূত করে তৈরী করা যায় তবে টলুইন সালফার-মুক্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দেখা গেছে অনেক জায়গায় পলিভিনাইল অ্যাসিটেট ব্যবহার করলেও লাল রং উঠে যাওয়া বা ক্ষরিত হওয়া আটকানো যায় না, তাই বিশেষভাবে লাল রং দেওয়া অংশগুলিতে সাণ্ডোফিক্স্-এর ১ শতাংশ জলীয় দ্রবণ লাগিয়ে তারপর এই কাজে হাত দেওয়া যায়। সাণ্ডোফিকস্ দ্রবণে জল না ব্যবহার করে অ্যালকোহল্ ব্যবহার করলে আরোও ভালো ফল পাওয়া যায়। পটে আগে পলিভিনাইল অ্যাসিটেট দ্রবণ লাগিয়ে পরে সাণ্ডোফিকস্ দ্রবণ লাগানো যায়। পলিভিনাইল অ্যাসিটেট দ্রবণ যদি টলুইন দিয়ে তৈরী না করে বেঞ্জিন দিয়ে করা যায় তাহলে লাল রং দেওয়া অংশ-গুলি বিশেষভাবে সুরক্ষিত হয়।

রং ও রঞ্জক পদার্থগুলি সুরক্ষিত করার পর জোড়া বা তালি দেওয়া অংশগুলি আস্তে আস্তে খুলতে হবে। এটি করতে যথেষ্ট সময় দরকার হয়। পটের যে কোন একটি অংশ এবারে আলাদা করে নিয়ে নেপালী টিস্যু পেপারের (Nepalese tissue paper) উপর রাখতে হবে। টিস্যু কাগজটি থাকবে সংরক্ষণাগারে পলিথিন দিয়ে মোড়া টেবিলের উপর। চিত্রিত দিকটি সম্পূর্ণভাবে টিস্যু কাগজের উপর থাকবে। পটটির উপর অল্প পরিমাণ জল দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে পটটি নমনীয় হয়ে যাবে এবং জোড়া বা তালি দেওয়া অংশগুলি খুলে নেওয়া যাবে। পট তৈরী করার জন্য যে সব কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে বা তালি দেওয়ার কাজে যে কাগজ ব্যবহার করতে দেখা যায় সেগুলি নিম্নমানের কাগজ এবং এই কাগজে যথেষ্ট পরিমাণে কাঠের গুঁড়ো থাকে। এই কারণে এই ধরনের কাগজে খুব বেশি অম্লতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু অতিরিক্ত অম্লযুক্ত কাগজ পটের ক্ষতিসাধন করে তাই এই সময় কাগজটিকে প্রশমিত (neutralize) করে নিতে হবে। কাগজ প্রশমিত করার জন্য ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট অথবা চুন-জলে (lime water) সম্পৃক্ত দ্রবণ ব্যবহার করা যায়।

পটটি যথাযথভাবে অম্লমুক্ত করার পর অনেক সময় কিছু কিছু ভাঁজ পাওয়া যায়। এই ভাঁজপড়া অংশগুলি আস্তে আস্তে টেনে যে সব জায়গায় এদিক ওদিক হয়ে গেছে সেগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে।

পটটির চিত্রিত দিকটি এবারে উপরের দিকে আনতে হবে। এখন একটি নেপালী

টিস্যু কাগজের উপর রাখতে হবে। উপরের অংশে যদি কোন ভাঁজ থাকে তাও ঠিক করে নিতে হবে। উপরের দিকটি মোটামুটি শুকনো হওয়ার পর পটটি আবার উল্টে নীচের দিকটি উপরে নিয়ে আসতে হবে ও এর উপরে জাপানী টিস্যু কাগজ দিয়ে আটকাতে হবে। একটি জাপানী টিস্যু কাগজ আটকানোর পর এর উপরে আর একটি নেপালী টিস্যু কাগজ চাপিয়ে দিয়ে আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে।

পটের আয়তনের চাইতে কিছুটা বড় একখণ্ড পলিথিন পটের উপর চাপাতে হবে, এবং পলিথিনখণ্ডসহ পটটি এমনভাবে ঘুরিয়ে রাখা দরকার যাতে চিত্রিত (painted) অংশটি উপরের দিকে থাকে। এখন প্রান্তভাগগুলিতে নেপালী টিস্যু কাগজ আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে। এবারে ভালোভাবে পটটিকে শুকনো করে নিতে হবে। পুরোপুরি শুকনো হওয়ার পর প্রান্ত থেকে অতিরিক্ত নেপালী টিস্যু কাগজ কেটে দিয়ে পটটি বার করে নিতে হবে। পরপর সব অংশগুলি এইভাবে সংরক্ষিত করার পর ক্রমানুসারে একটির সাথে আর একটি খণ্ড লাগিয়ে দেওয়া যায়। এবারে সংরক্ষণাগারে পট অপেক্ষা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড় একটি পরিষ্কার ভাঁজমুক্ত মার্কিন কাপড় নিয়ে টান টান করে টেবিলের উপর রাখতে হবে। টেবিলে কাপড়টি রাখার আগে সম্ভব হলে পরিশ্রুত জলে ভালোভাবে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর কাপড় থেকে অতিরিক্ত জল বার করে অল্প ভেজা কাপড় টেবিলের উপর টান টান করে বিছিয়ে দিতে হবে। অল্প ভেজা থাকা অবস্থায় কাপড়টিতে কৃত্রিম আঠা অল্প অল্প করে পুরো কাপড়ে লাগিয়ে দিতে হবে এবং সংরক্ষণ করা পটটিও অল্প ভেজা অবস্থায় কাপড়ের উপর লাগিয়ে দিতে হবে।

কাপড়ের প্রান্তগুলি টেবিলে টান টান করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে যাতে কোন ভাঁজ না পড়ে বা কাপড়টি গুটিয়ে না যায়। ভালোভাবে কাপড় ও পটটি শুকনো হয়ে গেলে আঠা দিয়ে জোড়া অংশগুলি খুলেট পটি তুলে আনতে হবে। অতিরিক্ত কাপড় আস্তে আস্তে কেটে বার দিতে হবে। এইভাবে পটচিত্র সংরক্ষণ করা যায়।

দেওয়াল চিত্র

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল চিত্র দেখা যায়। এই চিত্র অঙ্কন করার জন্য দুভাবে দেওয়াল প্রস্তুত করা হ'ত। প্রথম রীতি অনুসারে চিত্র অঙ্কন করার জায়গার ধুলো, বালি, ময়লা পরিষ্কার করে পাথুরে কাদামাটি, গোবর, তুষ, খড়, উদ্ভিজ্জ তন্তু, চামড়া ও প্রাণীর গায়ের লোম একসাথে মিশ্রিত করে সেই জায়গায় পুরু করে একটি প্রলেপ দেওয়া হ'ত। এটি দেওয়ালের উপর একটি মসৃণ আস্তরণ তৈরী করত। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এই আস্তরণটি কিছুটা শুকনো হয়ে যাওয়ার পর এর উপর প্লাস্টার-জাতীয় পদার্থের আর একটি প্রলেপ দিয়ে আবৃত করা হ'ত। প্লাস্টারের প্রলেপটির বেধ (thickness) নানান দেওয়াল চিত্রে নানান রকমের হতে দেখা যায়—কোথাও খুবই পাতলা, কোথাও এক ইঞ্চির এক চতুর্থাংশ, আবার আধ ইঞ্চি বেধ-

যুক্ত প্রলেপও পাওয়া যায়। এটি ভেজা থাকা অবস্থায় এর উপর জল রং দিয়ে চিত্রিত করা হ'ত। সিক্ত থাকার ফলে প্লাস্টারের মধ্যে রং-এর কণাগুলি সহজে প্রবেশ করতে পারে এবং প্লাস্টারের মধ্যে এগুলি আটকে যায়; প্লাস্টার ও রং আস্তে আস্তে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় শুকনো হয়ে যেত এবং চিত্রিত অংশটি স্পষ্ট হয়ে উঠত। দেওয়াল চিত্র অংকনের এই রীতিকে 'ফ্রেসকো বুনো' (Fresco buono) বলা হয়। এছাড়া আর একটি পদ্ধতিতে দেওয়াল চিত্র অংকিত হত তা হ'লো 'ফ্রেসকো সেকো' (Fresco secco)। এই পদ্ধতিতে অমসৃণ দেওয়ালের উপর জমা ময়লা পরিষ্কার করে তার উপর আগের মতই মাটি, গোবর, তুষ, খড়, নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ-তন্তু, প্রাণীজ লোম, চামড়া ইত্যাদি মিশ্রিত করে দেওয়ালের উপর লাগিয়ে একটি মসৃণ আস্তরণ তৈরী করা হ'ত। এই আস্তরণটি অল্প শুকনো হওয়ার পর এর উপর প্লাস্টার-জাতীয় পদার্থের একটি প্রলেপ দেওয়া হ'ত ও বেশ ভালোভাবে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় শুকনো করে নিয়ে আস্তরণটির উপরিভাগ ঘষে খুব মসৃণ করা হ'ত। চিত্র অংকন করার আগে চূণ-জাতীয় পদার্থ জলে মিশিয়ে আস্তরণটি সিক্ত করে তারপর সিক্ত অংশটি কিছুটা শুকিয়ে নিয়ে চিত্র অংকন শুরু করা হ'ত।

ফ্রেসকো বুনো পদ্ধতিতে অংকিত চিত্রের রং-এর কণাগুলি প্লাসটারের সঙ্গে মিশে যায় এবং রং-এর কোন স্তর সৃষ্টি করে না কিন্তু ফ্রেসকো সেকো পদ্ধতিতে প্লাস্টারের উপর রং-এর একটি বিশেষ স্তরের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে ফ্রেসকো সেকো পদ্ধতিতে অংকিত দেওয়াল চিত্রই বেশি।

বর্ণকর্ম ঃ বর্ণকর্ম-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে চিত্রের সংস্কার, সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। দেওয়াল চিত্রে যে সব রং ব্যবহৃত হয়েছে, তার অধিকাংশ শিলাজাত, খনিজ পদার্থ ও উদ্ভিদ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত। কোন কোন রং-এ আকর রূপো, নীল, লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছে মনে করা হয়, যদিও রং-এর উপাদানগুলি নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে।

সাদা রং ঃ এটি সাদা সীসা থেকে সংগৃহীত বলে মনে করা হয়ে থাকে, কিন্তু যেহেতু এটি জলে দ্রবণীয় নয় তাই এর ব্যবহার সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। সাদা খড়িমাটি, শাঁখ ও শুক্তিভস্ম শুদ্ধ সাদা রং-এর আকর হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এক ধরনের সাদা মাটি (শ্বেত মৃৎ) সাদা রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

হলুদ রং ঃ হলুদ বর্ণের আকর হিসাবে হরিতাল-চূর্ণ, ঢাক্ ফুলের নির্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। আরসেনিক সালফাইড মিশ্রিত বিশেষ ধরনের হলুদ মাটি থেকেও হলুদ রং প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে।

নীল রং ঃ নীল রং-এর আকর হল রাজাবর্ত; কিন্তু রাজাবর্ত ছাড়াও উদ্ভিজ্জ নীল চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

লাল রং ঃ লাল রং বা রক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে দরদ (লাল সীসা), লাক্ষারস বা অলক্ত (আলতা), গৈরিক (গিরিমাটি) থেকে।

কাল রং ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজল থেকে কাল রং প্রস্তুত করা হয়েছে তবে অঙ্গারচূর্ণ থেকেও কাল রং পাওয়া যায় ও ব্যবহার করা যায়।

সিন্দুর রং ঃ খাঁটি সিন্দুর মাটি থেকে সিন্দুর রং পাওয়া যায় ও চিত্রে ব্যবহার করা যায়।

সবুজ রং ঃ সবুজ মাটি থেকে সবুজ রং পাওয়া যায়। এছাড়া নীল ও হলুদ রং-এর সংমিশ্রণে সবুজ রং তৈরী হয়।

একাধিক মৌলিক রং এক সাথে আনুপাতিক হারে সংমিশ্রণপদ্ধতিতে নানান রং প্রস্তুত করা হয়েছে। এই রংগুলি চিত্রে নানান ধরনের ছায় (shade) সৃষ্টি করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

দেওয়াল চিত্র সংরক্ষণ ঃ দেওয়াল চিত্রের সংরক্ষণ করা খুবই কঠিন ও জটিল কাজ। এই জাতীয় চিত্র সংরক্ষণ করার কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে চিত্রটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ, পরীক্ষা ও যথাযথ পদ্ধতিতে নথিকরণ করা দরকার। চিত্রের নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার ঃ (১) চিত্রের বিষয়বস্তু ; (২) নাম ; (৩) বিস্তার ; (৪) বর্তমান অবস্থা ; (৫) আগে কখনও সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা ; (৬) চিত্রের কোন কোন অংশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও সংরক্ষণ করা দরকার ইত্যাদি। সূর্যালোকে এবং বৈদ্যুতিক আলোতে এর ছবি তুলে রাখা প্রয়োজন।

আদ্রর্তা ঃ দূষিত পরিবেশ ও অতিরিক্ত আদ্রর্তার ফলে এই চিত্র ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আদ্রর্তার পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে তার উৎস কি তা নির্ধারণ করা দরকার। দেওয়াল যদি ফাটা অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকে তাহলে এই ফাটা জায়গায় জল প্রবেশ করে এবং তা চিত্রের ভিত্তিস্তরে ও রং-এর স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। এর ফলে ভিত্তিস্তর ও রংএর স্তর আলগা হয়ে যায় ও সময়মত সংরক্ষণ করা না গেলে খুলে পড়ে যেতে পারে। এছাড়া কোন বদ্ধ ঘরের মধ্যে যদি দেওয়াল চিত্র থাকে তাহলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়েও চিত্রের ক্ষতিসাধন করতে পারে। অতিরিক্ত আদ্র পরিবেশে নানা ধরনের আণুবীক্ষণিক প্রাণী চিত্রের উপর বংশবিস্তার করে। চিত্রের সংরক্ষণের জন্য এই জল ও জলীয় বাষ্প নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা করা দরকার। যদি আদ্রর্তার পরিমাণ খুব কম হয় তাহলে আদ্রর্তা বৃদ্ধি করার জন্য আইসব্যাগ ব্যবহার করা উচিত। আদ্রর্তা কমানোর জন্য সিলিকা-জেল অথবা চূণ ব্যবহার করা যায়।

চিত্রের প্রাথমিক পরীক্ষা ঃ পরিমিত আদ্রর্তায় খালি চোখে নিখুঁতভাবে চিত্রটি পরীক্ষা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি চিহ্নিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ নির্ধারণ করা দরকার। এখন চিত্রের উপরিভাগ খুব সাবধানে নরম ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ছবির উপর যদি ভারনিস থাকে তাহলে তা কি জাতীয় তা দেখতে হবে। ছবির উপর নানান ধরনের পদার্থ জমতে দেখা যায়—এগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দূষিত আবহাওয়াতে ছোট-বড় নানান প্রাণী বংশবিস্তার করে তাই ঠিক কি কি জাতীয় প্রাণী বংশবিস্তার করেছে

তা নির্ধারণ করা দরকার। রংএর স্তরটি ভিত্তিস্তরের সঙ্গে কতখানি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ এবং কোন জায়গায় দুটি স্তর আলাদা হয়ে গেছে কিনা অথবা অন্য কোনভাবে চিত্রিত অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

ভিত্তিস্তর ও রং-এর স্তরের মধ্যে ফাঁকা জায়গা অথবা বায়ুগহ্বর (air pocket) আছে কিনা তাও দেখা দরকার ও ঐ জায়গার ছবি তুলে রাখতে হবে। এই ফাঁকা অংশগুলি সংরক্ষণ করার জন্য রং-এর স্তরের সাথে ভিত্তিস্তরের সংসক্তির মাত্রা (degree of cohesion) নির্ধারণ করা দরকার। চিত্রের উপরিভাগে আস্তে আস্তে ঘষা দিলে যদি দুটি স্তরের মধ্যে সংসক্তির মাত্রা কম হয় তাহলে রংএর কণাগুলি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে যাবে।

পরিষ্কার করা ঃ দেওয়াল চিত্র পরিষ্কার করার জন্য নানান পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, যেমন ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা। ধুলো, বালি, ফাঁদ ও আণুবীক্ষণিক জীবের উপনিবেশ নরম ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা যায়।

দ্রাবক দিয়ে পরিষ্কার করা ঃ কোন তৈলাক্ত বা চর্বিজাতীয় পদার্থ যদি চিত্রটির উপরিভাগে জমা হয় তাহলে ১০-২০ শতাংশ অ্যামোনিয়া দ্রবণ তুলোয় ভিজিয়ে চিত্রের উপর ঘষলে পরিষ্কার হয়ে যায়। যদি এতে কাজ না হয় তাহলে সাইক্লোহেক্সিল্যামাইন্ জলে মিশ্রিত করে (৮০-৯০ শতাংশ) ব্যবহার করে তৈলাক্ত ও চর্বিজাতীয় জিনিস অপসারিত করা যায়।

মোম পরিষ্কার করা ঃ দেওয়াল চিত্রে নানা কাজে মোমের ব্যবহার দেখা যায়। চিত্রে মোম ব্যবহার করলে এটি দূষিত পরিবেশে ধুলো, বালি, কার্বন-কণা, ও অন্যান্য অপবস্তুর দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়, ফলে চিত্র বিবর্ণ ও অপরিষ্কার হয়। এই ধরনের চিত্র পরিষ্কার করার জন্য কার্বন টেট্রাক্লোরাইড অথবা ট্রাইক্লোরোইথিলিন তুলোতে ভিজিয়ে উপরিভাগে ঘষা দিলে চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। ট্রাইক্লোরোইথিলিন খুবই বিষাক্ত—তাই ব্যবহার করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

রেজিন অপসারণ ঃ রেজিন-জাতীয় পদার্থ চিত্রে ভারনিস হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দূষিত পরিবেশের জন্যও সংরক্ষণের অভাবে ভারনিসের স্তরটি ফেটে ফেটে যায় ও স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। বেশি দিন যদি চিত্রটি এই অবস্থায় থাকে তাহলে ভিত্তি ও রংএর স্তর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই ভারনিস অপসারিত করে পুনরায় ভারনিস লাগানো দরকার। ভারনিস অপসারিত করার জন্য ডাইমিথাইল ফরমাইড অ্যালকোহল, টারপিন, বেনজল অথবা অ্যাসিটোনের মধ্যে দ্রবীভূত করে সেই দ্রবণ লাগিয়ে রেজিন পরিষ্কার করা যায়।

উদ্ভিজ্জ আঠা পরিষ্কার করা ঃ চিত্রে নানান কাজে উদ্ভিজ্জ আঠার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং চিত্রের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য এই আঠা অনেক সময় পরিষ্কার করতে হয়। এই আঠা পরিষ্কার করার জন্য ১০-২০ শতাংশ অ্যামোনিয়া দ্রবণ অল্প গরম করে নিয়ে ব্যবহার করা যায়। বিউটিল্যামাইন অথবা ৮০ শতাংশ জলীয়

সাইক্লোহেক্সিল্যামাইনও এই কাজে ব্যবহার করা যায়। চিত্রে ব্যাপকভাবে লাগানোর আগে অল্প জায়গায় লাগিয়ে পরীক্ষা করা উচিত।

লবণ অপসারণ : চিত্রে লবণের উদ্‌ত্যাগের ফলে অনেকসময় লবণ বা লবণাক্ত পদার্থ জমতে দেখা যায়; ফলে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব ক্ষেত্রে নরম ব্রাশ দিয়ে লবণ বা লবণাক্ত পদার্থ পরিষ্কার করে দিতে হবে ও জল দিয়ে চিত্রটি ধুয়ে দিতে হবে যাতে এটি সম্পূর্ণ লবণমুক্ত হতে পারে। বিকল্প পদ্ধতিতে কাগজের মণ্ড চিত্রের উপর লাগিয়ে ৪-৫ ঘণ্টা রাখতে হবে, এরপর এটি তুলে নিয়ে আবার কাগজের মণ্ড লাগাতে হবে। এইভাবে প্রয়োজনমত কয়েক বার কাগজের মণ্ড ব্যবহার করে দ্রবণীয় লবণ নিষ্কাশন করা যায়।

জৈব পদার্থ অপসারণ : চিত্রের উপরিতলকে অনেক সময় মৌমাছি বা নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গ বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করে ও এটির ক্ষতিসাধন করে। সাধারণ ভৌত পদ্ধতিতে প্রথমে এদের বাসস্থানগুলি অপসারিত করতে হবে, এবং যদি কোন দাগ চিত্রের উপর থাকে তাহলে ১০-২০ শতাংশ অ্যামোনিয়া দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়। মস্ ও লাইকেন দেওয়ালের গায়ে জন্মায় ও চিত্র নষ্ট করে দিতে পারে। বিষাক্ত ঔষধ খাদ্যে মিশিয়ে এগুলিকে মারা যায় ও তারপর অপসারিত করা যায়। বিষাক্ত ঔষধ হিসাবে খাদ্যে সোডিয়াম সিলিকোফ্লুওরাইড, জিংক অথবা ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে দেওয়া যায়। এগুলি মারা যাবার পর আস্তে আস্তে তুলে পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। দূষণমুক্ত বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা করলে পুনরায় সহজে মস্ বা লাইকেন দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এছাড়া ফরম্যালিন স্প্রে করে এদের বংশবৃদ্ধি রোধ করা যায়।

সাদা রং পরিষ্কার : সাদা রং দেওয়াল চিত্রে নানান জায়গায় লেগে থাকতে পারে। এই সাদা রংগুলি ক্যালসিয়াম কার্বনেট। একটি ছুরি দিয়ে আস্তে আস্তে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের জমা অংশ তুলে নেওয়া যায়। তবে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করলে ছবির উপরিভাগ নষ্ট হতে পারে।

রংএর স্তর দৃঢ় করা : বিভিন্ন কারণে রংএর কণাগুলি আলগা হয়ে যেতে পারে এবং পরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যেতে পারে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত রংএর স্তরকে দৃঢ় করা দরকার। কোন বর্ণহীন আঠা ভিত্তিস্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে রং-এর স্তরটিতে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে রংএর কণাগুলি পুনস্থাপিত করা যায়।

প্যারালয়েড আঠা এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি ব্রাশ দিয়েও লাগানো যায়। টলুইন মিশিয়ে প্যারালয়েডের ১-৫ শতাংশ দ্রবণ তৈরী করে এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এটি ক্লোরোথিনেও দ্রবীভূত হয়। প্যারালয়েড ক্লোরোথিনে মিশিয়ে ৩০ শতাংশ দ্রবণ তৈরী করে তারপর এর সঙ্গে শেলসল-ই (Shelsol-E) মিশিয়ে যথেষ্ট তরল দ্রবণ দেওয়াল চিত্রে লাগানো যায়। এতে দ্রবণটি রংএর স্তরে অনেক বেশি প্রবেশ করতে পারে ও দৃঢ়ভাবে রংএর স্তরটিকে আটকে রাখে। যদি অতিরিক্ত দ্রবণ চিত্রে কোথাও লেগে থাকে তাহলে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া যায়

বেডাক্রাইল (১২২ এবস্) টলুইনের সঙ্গে মিশ্রিত করে ১০ শতাংশ দ্রবণও এই কাজে ব্যবহার করা যায়।

রংএর স্তর সুদৃঢ় করা ঃ ভিত্তিস্তর ও রংএর স্তর বিভিন্ন কারণে আলগা হয়ে যেতে পারে; তাই ভিত্তিস্তরের সঙ্গে রংএর স্তরটিকে সুদৃঢ় (consolidate) করা দরকার। প্যারালয়েড বা বেডাক্রাইল আঠা বায়ুগহ্বর বা ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ করিয়ে ভিত্তিস্তর ও রংএর স্তর সুদৃঢ় করা যায়।

ভিত্তিস্তর সুদৃঢ় করা ঃ এই ক্ষেত্রে অবলম্বন ভিত্তিস্তরকে বহন করতে পারেনা। ফলে ভিত্তিস্তরে থেকে অবলম্বনের কোন কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্ন জায়গাগুলি চিহ্নিত করা ও সংরক্ষণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

ইনজেকসন দেওয়ার পদ্ধতি ঃ ভাঙ্গা বা বিচ্ছিন্ন জায়গাগুলি সুদৃঢ় করার জন্য চিত্রে ক্যালসিয়াম ক্যাসিনেট ইনজেকসান্ দেওয়া হয়। ক্যালসিয়াম ক্যাসিনেট নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করা হয়।

১০০ গ্রাম কেসিন জলে ভিজিয়ে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা রাখতে হবে। এটি ফুলে উঠলে অতিরিক্ত জল বার করে এর সঙ্গে ৯০০ গ্রাম কলিচুন (Slaked lime) মিশ্রিত করা দরকার। এখন কেসিন ও কলিচুনের মিশ্রণে ১০০ গ্রাম পলিভিনাইল অ্যাসিটেট মিশ্রিত করতে হবে। পলিভিনাইল অ্যাসিটেটের বদলে অ্যাক্রাইলিক আঠাও ব্যবহার করা যায়। মিশ্রণে আঠা মিশ্রিত করার পর মণ্ডটি যথেষ্ট প্রসারণশীল হয়। মণ্ডটিতে অল্প পরিমাণ ছত্রাকনাশক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করার পর যদি এটি জেলির আকার ধারণ করে তাহলে মণ্ডটিকে আরো তরল করতে হবে। তরল মণ্ড ব্রাশ দিয়ে অথবা গর্ত করে প্রবেশ করাতে হবে। গর্ত ২-৪ মিলিমিটার পর্যন্ত করা যায়। এমনভাবে পর পর দুটি গর্ত করতে হবে যার ফলে একটি দিয়ে আঠা প্রবেশ করালে অন্যটি দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যেতে পারে।

ইনজেকসান দেওয়া ঃ ক্যাসিনেট ইনজেকসান দেওয়ার আগে এতে প্রয়োজনমত তরল, অ্যালকোহল মিশিয়ে নিতে হবে। এটি দুভাবে কাজ করে ঃ (১) ভিত্তিস্তরটিকে সিক্ত করা ও বাতাস বার করে দেওয়া, এবং ২) দুটি স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে পুনরায় দুটি স্তরকে পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করা। ইনজেকসান দেওয়ার গর্ত যদি বড় হয়ে যায় তাহলে মার্বেল গুঁড়ো (marble dust) অথবা সূক্ষ্ম বালি (fine sand) দিয়ে বন্ধ করতে হবে।

সংরক্ষণ করার সময় চিত্রের সুরক্ষা ঃ যখন কোন চিত্রে ইনজেকসান দেওয়া হয়, তখন স্বাভাবিক কারণে চিত্রের পিছনের দিক থেকে যে চাপ পড়ে তাতে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই চাপ আটকানোর জন্য সামনের দিক থেকে অল্প চাপ দেওয়ার বন্দোবস্ত করে রাখা দরকার।

চিত্রের মধ্যেকার খালি জায়গার সংরক্ষণ ঃ যদি দেওয়াল চিত্রের মধ্যে চিত্রিত নয় এমন কোন জায়গা থাকে তাহলে বালি ও সিমেন্ট পরিমাণমত মিশ্রিত করে এমনভাবে

লাগাতে হবে যাতে চিত্রের প্রান্তদেশগুলি কোনভাবে আবৃত না হয় ও চিত্রের সঙ্গে মোটামুটি মিশে যায়।

চিত্রে পুনরায় রং ব্যবহার ঃ দেওয়াল চিত্রে খুব প্রয়োজন ছাড়া রং লাগানো উচিত নয়। কোথাও যদি নিতান্তই রং লাগানোর প্রয়োজন হয় তাহলে কাজটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব, প্রাচীনতা, নান্দনিক ঐক্য ও চিত্রের মৌলিকতার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে তবেই পুনরায় রং লাগানো উচিত।

কাঠ

বহু প্রাচীনকাল থেকেই কাঠ শিল্পবস্তু ও স্থাপত্যশিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি মানুষ যখন পাথর ব্যবহার করতে শিখেছে তার আগেও কাঠকে নানা কাজে ব্যবহার করেছে।

গঠন ও প্রকৃতি ঃ কাঠ মোটামুটিভাবে সেলুলোজ-কণা দিয়ে গঠিত। এর অণুগুলি একটি বিরাট শৃংখলে লিগনিন-জাতীয় পদার্থে আবদ্ধ থাকে। এটি রন্ধ্রবহুল ও জলাকর্ষী বস্তু এবং এতে অনেকগুলি স্তর পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষগুলি লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে। কোষের মধ্যে প্রচুর বায়ুগহ্বর পাওয়া যায়। এটি একটি বিষমসারক (anisotropic) বস্তু এবং এর বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন অনমনীয়তা ও অদম্য (tough) গুণাগুণ পরিলক্ষিত হয়। যদি এর কোন অংশের প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) নেওয়া যায় তাহলে মোটামুটিভাবে দুটি স্তর পাওয়া যায় ঃ (১) হার্টউড্ (২) স্যাপউড্। হার্টউড্ সাধারণত মৃত জাইলেম ও স্যাপউড প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত হয়। স্যাপউডে জলীয় পদার্থের পরিমাণ হার্টউডের চাইতে বেশি হয়। যদি বস্তুর লম্বচ্ছেদ নিয়ে পরীক্ষা করা যায় তাহলে বিভিন্ন জায়গায় জলীয় পদার্থের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কাঠের ভেজা জায়গাগুলি বেশি শুকিয়ে যেতে পারে। ফলে বস্তুটি বেঁকে ও কুঁচকে যেতে পারে। এই ধরনের কাঠের শিল্পবস্তুকে নিয়ন্ত্রিত তাপে যখন শুকনো করা হয় তখন একে সিজনিং বলা হয়। যেহেতু কাঠ জলাকর্ষী বস্তু, তাই একে সম্পূর্ণভাবে জলকণামুক্ত করা সম্ভব নয়, এবং পরিবেশের আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর কাঠে জলীয় বস্তুর পরিমাণের তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। পরিবেশে যদি ১০০ শতাংশ জলীয় বাষ্প থাকে তাহলে কাঠ ৩০ শতাংশ জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে। একেই কাঠের তন্তুর জলশোষণ করার ক্ষমতার সম্পৃক্ত (saturated) অবস্থা বলা হয়। বস্তুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যখন ১২ শতাংশের

কম বা বেশি হয় তখন কাঠটি পীড়ন (stress) এবং তীতর (strain) মধ্যে থাকে। কিছুদিন এই অবস্থার মধ্যে থাকার ফলে এটি বেঁকে ও ফেটে যেতে পারে। বাতাসের জলীয় বাষ্পের তারতম্যে এর সংকোচন বা প্রসারণ ঘটতে দেখা যায়।

দীর্ঘদিন যদি কোন কাঠের শিল্পবস্তু গরম পরিবেশে থাকে তাহলে সেলুলোজ-তন্তুর শৃংখল সংকুচিত হয় এবং ভেঙ্গে যায়। আবার, বস্তুটি যদি গরম ও যথেষ্ট আদ্র পরিবেশে দীর্ঘদিন থাকে তাহলে সেলুলোজ-কণাগুলির দ্রুত রাসায়নিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। অতিবেগুনী রশ্মি কাঠের বন্ধনকারী মাধ্যম লিগনিন কণাগুলিকে জারিত করে ; ফলে এটি দুর্বল, নরম ও ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং একসময় ভেঙ্গে পড়ে।

উপরিভাগের ময়লা অপসারণ : বাতাসে আদ্রতার পরিমাণ যখন বেশি হয় তখন কাঠের বস্তুর উপর ধুলোময়লা জমতে দেখা যায়। বস্তুর আকৃতি অনুসারে কোথাও বেশি কোথাও আবার কম ধুলো, বালি, ময়লা জমতে পারে। অনেক সময় এগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য এর উপরিভাগে ভারনিস, ক্রিয়োজোট অথবা নানান ধরনের তেল লাগানো হয়। দূষিত পরিবেশে এই বস্তুগুলির উপরিভাগে ময়লা জমতে দেখা যায়। সময়ের সাথে সাথে অপবস্তুগুলি শক্ত হয়ে বস্তুর গায়ে আটকে যায়। ধোঁয়া ও কালি বস্তর নান্দনিক ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

কাঠের বস্তুর উপরিভাগে লাগানোর জন্য ক্রিয়োজোট দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এটি প্রস্তুত করা হয়।

প্রয়োজনমত ৫-১০ সি সি খাঁটি ক্রিয়োজোট ও ১০০ সি. সি. কেরোসিন মিশ্রিত করে এই দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। ক্রিয়োজোট দ্রবণ লাগানোর পর বস্তুর উপর যদি ৫-১০ শতাংশ সেলাক দ্রবণ লাগানো যায় তাহলে এটি বস্তুকে আরো ভালোভাবে রক্ষা করে। সেলাক দ্রবণ তৈরী করা হয় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে।

সেলাক—৫ গ্রাম
মেথিলেটেড স্পিরিট—১০০ সি. সি.
মারকিউরিক ক্লোরাইড—অল্প পরিমাণ।

সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ কাঠের শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় ঃ (১) বস্তুর উপরিভাগটি নরম ব্রাশ দিয়ে আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিষ্কার করা দরকার যাতে ধুলোবালি, কালি অথবা অন্য কোন অপবস্তু আটকে থাকতে না পারে। (২) পোকা ও অন্যান্য আণুবীক্ষণিক জীবের আক্রমণ হলে কীটাণুনাশক ও ছত্রাকনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা দরকার। (৩) দুর্বল, নরম ও ভঙ্গুর বস্তুকে রাসায়নিক অথবা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তিশালী করা যায়। (৪) প্রয়োজন হলে নিমজ্জিত বস্তু থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ জল নিষ্কাশন করা উচিত। (৫) ভেঙ্গে যাওয়া অংশগুলিকে ঠিক ঠিক জায়গায় জোড়া দেওয়া দরকার। (৬) বস্তর উপরিভাগের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলি সম্ভবমত সংরক্ষণ করা দরকার।

(৭) কাঠের শিল্পবস্তুকে নিয়ন্ত্রিত তাপ, চাপ, আর্দ্রতা ও দূষণ থেকে মুক্ত পরিবেশে রাখা দরকার।

বাহ্যিক অপবস্তু অপসারণ: যদি বস্তুর উপর কোন অপবস্তু কঠিনভাবে আটকে থাকে তাহলে সেগুলি পরিষ্কার করার আগে জমা বস্তুর রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। বস্তুর রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী এমন দ্রাবক ব্যবহার করা দরকার যাতে কঠিন বস্তুটি নরম হতে পারে। নরম বস্তুটিকে ভৌত পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা যায়। যদি বস্তুর উপর তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থের দাগ পড়তে দেখা যায় তাহলে প্রথমে দাগটি বেঞ্জিন দিয়ে ভিজিয়ে তারপর তুলোতে পেট্রল লাগিয়ে ঘষা দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কীট ও ছত্রাক অপসারণ: যদি বস্তুটি কীট অথবা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে কীটনাশক অথবা ছত্রাকনাশক ঔষধ ছিটিয়ে অথবা বাষ্পায়ন কক্ষে রেখে এটি নির্বীজিত করা সম্ভব। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, মিথাইল ব্রোমাইড, ইথিলীন ডাই-ব্রোমাইড এবং এইচ. সি. এন অ্যাসিড গ্যাস এই কাজে ব্যবহার করা যায়।

ছত্রাকনাশক বস্তু হিসাবে ২ শতাংশ মারকিউরিক ক্লোরাইড জলে দ্রবীভূত করে অথবা ২৫ শতাংশ পেণ্টাক্লোরোফেনল অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করে বস্তুর উপর ছিটিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া ছত্রাক ও আণুবীক্ষণিক জীবের আক্রমণ থেকে এই বস্তুকে রক্ষার জন্য ন্যাপথালিন ব্যবহার করা যায়।

কাঠের বস্তু সুদৃঢ় করা: দুর্বল বস্তু সুদৃঢ় করার জন্য পলিমার (Polymer) ব্যবহার করা যায়, যেমন পলিমিথাইল মেথা-ক্রাইলেট, পলিভিনাইল অ্যাসিটেট ইত্যাদি।

ভাঙ্গা জায়গা জোড়া দেওয়া: পলিভিনাইল অ্যাসিটেট যুক্ত আঠা, যেমন ময়কল-এল; এছাড়া ফেভিকলও কাঠের শিল্পবস্তু জোড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা যায়।

বস্তুর উপরিভাগ যদি কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে একই জাতীয় কাঠ অথবা পুটি দিয়ে এটি সংরক্ষিত করা যায়। তবে এতে যাতে বস্তুর সত্তা এবং মৌলিকতা নষ্ট না হয় তা দেখা দরকার।

কাঠের বক্রতা: কাঠ যেহেতু জলাকর্ষী বস্তু তাই আর্দ্রতা ও তাপের তারতম্য ঘটলে এর আয়তনের পরিবর্ত্তন ঘটতে দেখা যায়। যদি কোন বস্তুর একদিক চিত্রিত এবং অন্যদিক অচিত্রিত থাকে তাহলে অচিত্রিত দিকটি তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার তারতম্যে সহজে জল শোষণ ও বর্জন করতে পারে। এর ফলে চিত্রিত দিকটি অবতল (concave) এবং অচিত্রিত দিকটি উত্তল (convex) হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের বক্রতা পাটা চিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখা যায়।

কাঠের বস্তু যদি বেঁকে যায় তাহলে সংরক্ষিত করার জন্য কতকগুলি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত করা দরকার। এর অবতল দিকটি যথেষ্ট পরিমাণে জল বা জলীয় বাষ্পে সিক্ত করলে কিছু সময় পর কাঠটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। এটি

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর অল্প চাপে রেখে শুকিয়ে নেওয়া উচিত। অচিত্রিত দিকটিতে ধাতুর পাত আটকে অনেক সময় দুর্বল বস্তুকে সুদৃঢ় করা হয়।

ছত্রাকের আক্রমণ ঃ গরম ও আর্দ্র পরিবেশে ছত্রাকজাতীয় প্রাণীকে কাঠের উপর বংশবিস্তার করতে দেখা যায়। এই ধরনের আক্রমণ ঘটলে আক্রান্ত কাঠটিকে সরিয়ে নিতে হবে এবং পরিষ্কার জায়গায় আলাদা করে রাখতে হবে। ছত্রাকনাশক ঔষধ যেমন সোডিয়াম ফ্লুওরাইড জলে দ্রবীভূত করে ছিটিয়ে অথবা ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে ছত্রাক-মুক্ত করা যায়। ৮৫-১৭০ গ্রাম সোডিয়াম ফ্লুওরাইড ৪.৫ লিটার ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া ২ কিলো ২৫০ গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম ফ্লুওরাইড ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে ছত্রাকনাশক ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

পোকার আক্রমণ ঃ ছত্রাক ছাড়াও নানান ধরনের পোকাকে কাঠের বস্তুর ক্ষতিসাধন করতে দেখা যায়। উড্‌ওয়ারমস্ জাতিয় পোকা কাঠের প্রভূত ক্ষতি করে। এরা বস্তুর গভীরে নালা তৈরী করে প্রবেশ করতে পারে। এই পোকার আক্রমণ যদি প্রথম প্রথম আটকানো না যায় তাহলে বস্তুটিকে রক্ষা করা কঠিন হয়। কীটাণুনাশক ঔষধ গর্তগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সম্পূর্ণভাবে কীটমুক্ত করা যায়। অনেক সময় পোকাগুলি মরে যায় কিন্তু এদের ডিম কাঠের গভীর অংশে থেকে যায়। এই ডিমগুলি থেকে আবার পোকা জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় কাঠটিকে আক্রমণ করতে পারে। তাই কীটাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করার পরও কাঠটিকে কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার। বিশেষভাবে যে পোকাগুলি কাঠের বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলি হলো—কমন পাউডার বিটল (লিকটাস), ডেথ্‌-ওয়াচ বিটল (জেসটোবিয়াম), ফারনিচার-বিটল (অ্যানোবিয়াম) ইত্যাদি। পোকা কাঠে যে গর্ত সৃষ্টি করে, কীটমুক্ত করার পর সেগুলিকে নরম মোম দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এর ফলে কাঠে নতুন কোন আক্রমণ ঘটলে বোঝা যাবে।

নির্বীজিত করার পদ্ধতি ঃ কাঠের বস্তুকে নির্বীজিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা যায় ঃ (১) তাপমাত্রা বৃদ্ধি ক'রে ; (২) শূন্যতা সৃষ্টি ক'রে ; (৩) বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ ক'রে ; (৪) জলীয় কীটাণুনাশক ঔষধ ছিটিয়ে।

বাষ্পায়ন পদ্ধতিতে নির্বীজিত করা ঃ আক্রান্ত বস্তু নির্বীজিত করতে হলে প্রথমে একে একটি বাষ্পায়নকক্ষে রাখতে হবে। এখন বাষ্পায়নকক্ষটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর মধ্যে বায়ুর চাপ কমিয়ে দেওয়া দরকার ও তারপর এর মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এর ফলে স্থায়ীভাবে না হলেও সাময়িক-ভাবে এটি নির্বীজিত করা সম্ভব। হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস নির্বীজিত করার জন্য ব্যবহার করা যায়। এই গ্যাসের মধ্যে বস্তুটিকে ১২ থেকে ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা যায়। বড় বড় বস্তুর ক্ষেত্রে ইথাইল ব্রোমাইড ব্যবহার করা যায়। ইথাইল ব্রোমাইড পালক বা চামড়া যুক্ত কোন বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। এছাড়া কার্বন ডাই-সালফাইড খুবই ভালো কীটাণুনাশক এবং নির্বীজিত করার জন্য এটি ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। কার্বন ডাই-সালফাইড ব্যবহার করার জন্য

কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কারণ এটি বায়ুর সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এছাড়া এই গ্যাস যাতে আগুন এবং ধোঁয়ার সংস্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। ৮ কিউবিক ফিট জায়গা বাষ্পায়িত করার জন্য অন্ততঃ ২৮৫ গ্রাম কার্বন ডাই-সালফাইড দরকার হয়। যথাযথভাবে নির্বীজিত করার জন্য কাঠের শিল্পবস্তুকে অন্ততঃ ১৫ দিন বাষ্পায়নকক্ষে রাখা দরকার এবং ৭ দিন পর অবশিষ্ট কার্বন ডাই-সালফাইড ফেলে দিয়ে নতুন কার্বন ডাই-সালফাইড তরল ব্যবহার করা উচিত। যদি কাঠের শিল্পবস্তুতে অংকিত অংশ থাকে তাহলে রংটি কার্বন ডাই সালফাইডের সংস্পর্শে এলে ক্ষরিত হতে পারে। তাই ১ ভাগ কার্বন-ডাই-সালফাইডের সাথে ৪ ভাগ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হলে চিত্রিত অংশ ক্ষরিত হয় না।

সিক্ত করে নির্বীজিত করা ঃ পিপেট বা সিরিঞ্জে তরল কীটনাশক নিয়ে কাঠের গর্তগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নির্বীজিত করা যায়। এছাড়া ব্রাশ দিয়েও তরল কীটনাশক ঔষধ লাগিয়ে দেওয়া যায়। বড় আচিত্রিত বস্তুতে গর্ত করেও যথেষ্ট পরিমাণ কীটনাশক প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। কীটনাশক হিসাবে ডি ডি টি. গ্যামাক্সিন, পেণ্টাক্লোরোফেনল, ক্লোরোন্যাপথালিনস, মেটালিক ন্যাপথিনেটস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। যে কোন কীটনাশক বস্তুর উপর ব্যবহার করার পূর্বে অল্প জায়গায় প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

কীটাণুনাশক ছিটিয়ে নির্বীজিত করা ঃ ২ শতাংশ ডি ডি টি যদি জলে দ্রবীভূত করে ছিটানো যায় তাহলে লিকটাস (Lyctus) এর আক্রমণ থেকে কাঠকে বাঁচানো যায়।

ক্রিয়োজোট দ্রবণ ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে এগুলিকে উই ও হোয়াইট অ্যাণ্টস্ থেকে রক্ষা করা যায়।

কাঠের বস্তু সুদৃঢ় করা ঃ নানান কারণে এগুলি দুর্বল নরম ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। তাই সুদৃঢ় করার জন্য কোন বস্তুতে সিক্ত বা পরিপূর্ণ করে অথবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এদের শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করা যায়।

যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ (১) পাতলা ধাতুর পাত অথবা কাঠের পেরেক দিয়ে; (২) X (একস্) এর মত লোহার পাত লাগিয়ে, (৩) কাঠের টুকরো অথবা স্ক্রু দিয়ে আটকে।

রাসায়নিক বস্তু দিয়ে সিক্ত বা পরিপূর্ণ করা ঃ সচ্ছিদ্র কাঠের বস্তুগুলিকে সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা হয়, যেমন মোম, ভারনিস্, পুটি ইত্যাদি।

মোম দিয়ে পরিপূর্ণ করা ঃ মোমের গাহে দুর্বল বস্তুকে নিমজ্জিত করে সুদৃঢ় করা হয়। মোমের সঙ্গে ৫০ শতাংশ রেজিন মিশ্রিত করে দ্রবনটি তৈরী করা হয়। বস্তুটিকে গাহে নিমজ্জিত করার পূর্বে এটি যথেষ্ট শুকনো আছে কিনা তা পরীক্ষা করা দরকার। যদি শুকনো না থাকে তাহলে একে যথাযথভাবে শুকনো

করার পর মোমের গাহে ডুবিয়ে দিতে হবে। অনেক সময় বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত নাও হতে পারে. এই সব ক্ষেত্রে একটি ভারী জিনিষের সঙ্গে বেঁধে বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করতে হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বস্তুর মধ্যে জলীয় বাষ্প থাকলে তা বুদবুদ হয়ে বেরিয়ে আসবে এবং শূন্য স্থানটি মোমের দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। ১০৫° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বস্তুটি কিছুক্ষণ রাখলে এটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে জলীয় বাষ্প মুক্ত হতে পারে। বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে মোমের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার পর বার করে আনতে হবে এবং অতিরিক্ত মোম টারপেনটাইন ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হবে। মোম গরম করার সময় আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে তাই এটি প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

মোম ও রেজিনের মিশ্রণ স্থায়ী. নিষ্ক্রিয় এবং জল নিরোধক। তাই এটি আর্দ্র ও দূষিত পরিবেশ থেকে বস্তুকে রক্ষা করতে পারে। যদি বস্তুটি গরম আবহাওয়ার মধ্যে থাকে তাহলে বস্তুর উপরিভাগে মোমের একটি স্তর পড়তে পারে এবং এই স্তরে ধুলো, বালি, ময়লা আটকাতে পারে।

এছাড়া যদি বস্তুর উপর একটি মোমের স্তর তৈরী হয় তাহলে প্রতিসরাঙ্ক বৃদ্ধি পায় ফলে টোন নষ্ট হয়ে যায়।

পাতলা ভারনিস দিয়েও বস্তুকে সুদৃঢ় করা যায়। পলিভিনাইল অ্যাসিটেট ৯ ভাগ এবং টলুইন ১ ভাগ অ্যাসিটোনের সাথে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরী করে ব্যবহার করা যায়। বেডক্র্যাইল ১২২X কে প্রয়োজন মত টলুইন এ মিশ্রিত করে বস্তু সুদৃঢ় করার কাজে লাগানো যায়। পলিয়েস্টার রেজিন যেমন. মারকো এস. বি ২৬ সি অথবা ব্যাকেলাইট ১৭৪৪৯ ও ব্যবহার করা যায়।

জীর্ণসংস্কার ও সুরক্ষা ঃ কাঠের বস্তু মেরামত করার জন্য খুব ভালো আঠার দরকার। এই কাজে ফেবিকল. মোয়িকল, ক্যালসিয়াম ক্যাসিনেট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। জীর্ণসংস্কার করার পর পরিমিত আর্দ্রতায়. তাপমাত্রায় ও দূষণমুক্ত পরিবেশ এটি রাখা উচিত। যদি বস্তুর কোথাও রন্ধ্র দেখা যায় তাহলে অ্যারোলাইট ৩০০এ, ইউ এফ রেজিন ব্যবহার করা যায়। সাধারণ পুট্টি (হোয়াইটিং ও লিনসিড তেলের মিশ্রণ), অ্যালব্যাসটাইন, ও স্বচ্ছ সেলুলয়েড রন্ধ্র বন্ধ করার কাজে ব্যবহার করা যায়।

জলে পড়ে থাকা কাঠের বস্তু সংরক্ষণ ঃ (Preservation of water-logged wood) ঃ

দীর্ঘদিন যদি কোন কাঠের বস্তু জলে নিমজ্জিত থাকে তাহলে এর কোষগুলির লিগনো-সেলুলোজ কণাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোষের সেলুলোজ কণাগুলি মোটামুটি ভাবে অবিকৃত থাকে। এই লিগনিস কণাগুলিই বস্তুর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই পরিবর্তনগুলির ফলে বস্তুটি রন্ধ্রবহুল ও স্পঞ্জ-এর মত হয়ে যেতে দেখা যায়। এটি প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ করতে পারে—ফলে নরম ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করে যদি এটি নাড়াচাড়া করা

হয় তাহলে ভেঙ্গে যেতে পারে। এই ধরনের জলে নিমজ্জিত থাকা কাঠের শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

সংরক্ষণ : এই ধরনের কাঠ সংরক্ষণ করতে হলে প্রথমে একে একটি শক্ত অবলম্বনের উপর রাখতে হবে। এখন অবলম্বনসহ কাঠটিকে আস্তে আস্তে জলের বাহিরে আনা দরকার। বস্তুটিকে এবারে ভেজা মসৃণ তুলো, খবরের কাগজ অথবা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে ও এই অবস্থায় সংরক্ষণাগারে স্থানান্তরিত করতে হবে। সংরক্ষণাগারে এনে বস্তুতে জড়ানো জিনিষগুলি খুলে দেওয়া দরকার এবং এটি যাতে তাড়াতাড়ি শুকনো না হয়ে যেতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখন পরিশ্রুত জল গাহে অবলম্বনসহ বস্তুটিকে ডুবিয়ে দিয়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে করে বস্তুটির গায়ে লেগে থাকা কাদা মাটি নরম ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। ২ শতাংশ কার্বলিক অ্যাসিড যুক্ত জল গাহে এটি থাকলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়। কার্বলিক অ্যাসিড জলে মিশ্রিত থাকার ফলে কাঠের বস্তুর পচনক্রিয়া বিলম্বিত হয়। জলগাহ থেকে বার করে এনে পর্য্যায়ক্রমে এটি শুকনো করা উচিত।

এই ধরনের বস্তুকে সুদৃঢ়, আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও জলীয় বাষ্প নিস্কাশিত করার জন্য দুটি সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

ফটকিরি গাহতে নির্মজ্জিত করে সুদৃঢ় ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা : ফটকিরি সাধারণত স্ফটিক অবস্থায় পাওয়া যায়। গরম জলে এটি সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হতে পারে কিন্তু ঠাণ্ডা জলে মাত্র ১০ শতাংশ দ্রবীভূত হয়। অল্প গরম ফটকিরির সম্পৃক্ত দ্রবণে বস্তুটিকে যদি নিমজ্জিত করা যায় তাহলে এর কোষগুলিতে এই দ্রবণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করতে পারে। বস্তুটি এই দ্রবণ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সিক্ত ও পরিপূর্ণ হওয়ার পর যদি আস্তে আস্তে শুকনো করা যায় তাহলে কুঁচকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফটকিরি দ্রবণ যাতে এর কোষগুলিতে ভালো ভাবে প্রবেশ করতে পারে সেই জন্য অনেক সময় এই দ্রবণে কিছুটা গ্লিসারিন মিশ্রিত করা যায়। গ্লিসারিন ব্যবহার করার ফলে এর রং-ও সুরক্ষিত হয়।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ফটকিরির গাহ প্রস্তুত করা যায়ঃ প্রয়োজনমত একটি লোহা বা তামার পাত্র নিয়ে ৩ ভাগ ওজনের ফটকিরির সংগে ১ ভাগ ওজনের জল মিশ্রিত করে গরম করার দরকার। ফটকিরি জলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হওয়ার পর এতে সামান্য পরিমাণ গ্লিসারিন মিশ্রিত করতে হবে। এখন এই দ্রবণে বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করে ৯২-৯৬ সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অন্ততঃ ১০-১২ ঘণ্টা রাখতে হবে। গরম অবস্থায় থাকার ফলে এই দ্রবণে যদি জলের পরিমাণ কমে যায় তাহলে অল্প গরম জল মধ্যে মধ্যে মিশিয়ে দিতে হবে।

এতে বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে সিক্ত ও পরিপূর্ণ হওয়ার পর এটি বার করে নিয়ে গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। অনেক সময় গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলার পরও বস্তুর উপর সাদা সাদা ফটকিরির স্ফটিক জমতে দেখা যায়। একটি নরম ব্রাশ দিয়ে আস্তে

আস্তে ফটকিরির কণাগুলি পরিষ্কার করা যায়। এরপরও যদি ফটকিরির কণা আটকে থাকে তাহলে পরিষ্কার কাপড় গরম জলে ভিজিয়ে নিয়ে উপরিভাগটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা যায়। টারপেনটাইন ও তিসির তেল সমান সমান পরিমাণ মিশ্রিত করে একটি দ্রবণ তৈরী করা হয় যা বস্তুর সুরক্ষার জন্য উপরিভাগে লাগানো যায়।

অ্যালকোহল-ইথর-রেজিন ব্যবহার ঃ বস্তুটিকে ইথাইল অ্যালকোহল গাহে নিমজ্জিত করা যায়। তবে ইথাইল অ্যালকোহলের কয়েকটি গাহ দরকার যেমন— ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৭৫, ৯০, ১০০ শতাংশ। প্রতিটি অ্যালকোহল গাহে ১০-২০ মিনিট রাখার পর পরবর্তী গাহে স্থানান্তরিত করা দরকার। এইভাবে বস্তুটিকে শুকনো করা সম্ভব। অনেক সময় শুধু ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার করে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না। তাই ইথার গাহ ব্যবহার হয় এবং বস্তুটি অ্যালকোহল গাহ থেকে ইথার গাহে স্থানান্তরিত করা যায়। ইথার এর সঙ্গে অনেক সময় কিছুটা রেজিন মিশ্রিত করা হয় যা বস্তুর কোষের মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে পারে। প্রয়োজনমত এটি ইথার গাহে রাখার পর বাহিরে বার করে আনা হয় এবং তখন ইথার বাষ্পিত হয়ে যায়। কিন্তু রেজিন কোষগুলির মধ্যে থেকে যায়। এই রেজিন বস্তুর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। অ্যালকোহল বা ইথার আগুনের সংস্পর্শে এলে গলে যেতে পারে তাই এগুলি যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।

বস্ত্র

বস্ত্র তৈরী করার জন্য যে উপাদানগুলি ব্যবহার করতে দেখা যায় তা প্রধানত দুই ধরণের ঃ (১) উদ্ভিজ্জ (২) প্রাণীজ। উদ্ভিজ্জ উপাদান হিসাবে তুলো, পাট, শন, গাছের ছাল, গাছের পাতা এবং প্রাণীজ উপাদান উল, সিল্ক, লোম, পালক, জীবজন্তুর চামড়া ইত্যাদি প্রাচীন ও বর্তমান কালে বস্ত্র তৈরীর উপাদান হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। উদ্ভিজ্জ উপাদান ব্যবহার করে যে সব বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলি থেকে যদি একটি তন্তুর অল্প উপাংশ নিয়ে পোড়ানো হয় তাহলে পোড়া কাপড়ের গন্ধ পাওয়া যায়, কারণ এগুলি মূলত সেলুলোজকণা দিয়ে গঠিত। প্রাণীজ উপাদান থেকে প্রস্তুত বস্ত্র থেকে যদি একটি তন্তুর উপাংশ বিশেষ নিয়ে আগুনের সংস্পর্শে আনা যায় তা হলে এটি গুটিয়ে যায় এবং পালক পোড়ানোর গন্ধ পাওয়া যায়। প্রাণীজ উপাদান দিয়ে প্রস্তুত বস্ত্রে কেরাটিন জাতীয় পদার্থ থাকে।

বস্ত্রের বিশ্লেষণ ঃ বস্ত্রের মূল উপাদান উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ যাই হোক না কেন ক্ষতিগ্রস্ত বস্ত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য লেন্স বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ও

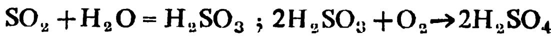
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নথিভুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন।

বস্ত্রের নাম, বুনন প্রণালী, প্রস্তুত করার কাল, শিল্প ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব, বস্ত্রের মূল উপাদান এবং একটি নির্দিষ্ট আয়তক্ষেত্রে টানা ও পোড়েনে কতকগুলি তন্তু ব্যবহৃত হয়েছে, পাক দেওয়া তন্তুগুলি কোন দিকে পাক দেওয়া হয়েছে, ও চিত্রিত কিনা—চিত্রিত হলে কতগুলি রং ব্যবহৃত হয়েছে, রংএর উপাদানগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও নির্ণয়, জলের সংস্পর্শে এলে বিশেষ কোন একটি রং বা সব ব্যবহৃত রং ক্ষরিত হয় কিনা, বস্ত্রের কোন অংশ দুর্বল বা ছেঁড়া আছে কিনা, কোন কোন অংশ সেলাই করার জন্য রন্ধ্রযুক্ত ও নমনীয় কিনা, বিশেষ কোন দাগ এবং অণুবীক্ষণিক প্রাণী বা পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকলে কি ধরনের আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও পোকার দ্বারা আক্রান্ত তা নির্ণয় করা। এছাড়াও সংরক্ষণ করার জন্য অন্য কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া গেলে তাও নথিভুক্ত করা দরকার।

বস্ত্রের উপর আলো ও আর্দ্রতার প্রভাব : উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উপাদান দিয়ে প্রস্তুত বস্ত্র যদি প্রত্যক্ষ সূর্যালোকে দীর্ঘদিন থাকে তাহলে এদের তন্তুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, নমনীয়তা নষ্ট হয় ও বিবর্ণ হয়ে যায়। এই পরিবর্ত্তনগুলির কারণ এরা বিকিরিত শক্তি (radiant energy) শোষণ করতে সক্ষম হয় যার ফলে আণবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। অতিবেগুনী রশ্মি বস্ত্রের সব চাইতে ক্ষতিসাধন করে। এগুলিতে যে রং ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে কিছু রং বস্ত্র সুরক্ষার কাজ করে। আবার অনেক সময় আলোর প্রভাবে কিছু রং-এর মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। সংগ্রহশালায় কৃত্রিম আলোতেও বস্ত্র পরিদর্শিত হয়ে থাকে। যদি যথাযথ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত আলো ব্যবহার না করা হয় তাহলে বস্ত্রের ক্ষতি হতে পারে অবশ্য উপাদানগুলির উপরই এদের ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ নির্ভর করে। কৃত্রিম আলোর উৎস হিসাবে বাল্ব, নিয়নবাতি, ঝাড়বাতি ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই আলোর উৎসগুলি থেকে ভিন্নভিন্ন পরিমাণ ও ধরনের আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে যা অনেক সময় বস্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া প্রদর্শ বস্তুর খুব কাছাকাছি যদি আলোর উৎসটি অবস্থিত হয় সেই জায়গায় বায়ু চলাচলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ফলে নানা ধরনের অপবস্তু এর উপর জমতে পারে। অপবস্তু জমার জন্য তন্তুগুলির নমনীয়তা ও স্বাভাবিক গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে। অনেক সময় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার তারতম্যে আণুবীক্ষণিক জীবের বংশবিস্তার হতে পারে। যেহেতু জৈব পদার্থ দিয়ে বস্ত্র তৈরী হয় তাই দূষিত ও আর্দ্র পরিবেশে ছত্রাক ও পোকার দ্বারাও বস্ত্র আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যে সব কারণে বিশেষভাবে এই জীবগুলির দ্বারা বস্ত্র আক্রান্ত হতে পারে তা হলো ঠাণ্ডা ও গরম পরিবেশ, বদ্ধ বায়ু এবং যদি কোন পচনশীল বা গলিত প্রাণী বা ভেষজ পদার্থের সংস্পর্শে আসে, আর্দ্রতার তারতম্য এবং পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি। আর্দ্রতার পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে সেলুলোজতন্তুগুলি নরম হয়ে যায়, ফুলে উঠে ও

পচনক্রিয়া শুরু হয়। প্রাণীজ উপাদান দিয়ে প্রস্তুত, বিশেষত চামড়ার বস্ত্রে, একই ধরনের জীবের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। তবে লোম, সিল্ক, ইত্যাদি বস্তুগুলির ক্ষেত্রে আর্দ্রতার পরিমাণে তারতম্য হলেও খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অবশ্য যদি যথেষ্ট তাপমাত্রাযুক্ত জায়গায় বেশি দিন রাখা হয় তাহলে এগুলি অতিরিক্ত পরিমাণ জল বর্জন করে ও তন্তুগুলি শক্ত, দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায়।

বস্ত্রের উপর সালফার ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়া ঃ বাতাসে দ্রবীভূত অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। সাধারণত দাহ্য বস্তু থেকে এই গ্যাস নির্গত হয় এবং বাতাসের জলীয় অংশের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সালফিউরাস অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। সালফিউরাস অ্যাসিড স্থায়ী হতে পারে না এবং O_2 সংস্পর্শে এসে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।



$$SO_2 + H_2O = H_2SO_3 \ ; \ 2H_2SO_3 + O_2 \rightarrow 2H_2SO_4$$

লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বস্ত্রের উপর জমতে থাকে এবং এর ফলে কিছু দিন পর অ্যাসিড-জমা জায়গাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্ত্র প্রদর্শনের সময় লোহার পিন বস্ত্রের কোন অংশে ব্যবহার করা হলে সেই জায়গাগুলিও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়।

ছত্রাক ও পোকার আক্রমণ ঃ বস্ত্রে প্রায়ই ছত্রাকের আক্রমণ দেখা যায়। কিন্তু যদি পরিষ্কার দূষণমুক্ত ও পরিমিত তাপমাত্রায় এটি সংরক্ষণ করা যায় তাহলে ছত্রাক বংশবিস্তার করতে পারে না। ছত্রাকের আক্রমণ হয়েছে এমন বস্ত্র যদি যথেষ্ট বায়ু চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা হয় তাহলে এই আক্রমণ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। ছাতা পড়ার ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বস্ত্রকে থাইমল বাষ্পায়ন কক্ষে রেখে নির্বীজিত করা যায়। অবশ্য যদি বস্ত্রটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় তাহলে থাইমল বাষ্পায়ন কক্ষে রেখে নির্বীজিত করার প্রয়োজন হয় না। এছাড়া নানান ধরনের পোকা বস্ত্রের খুব ক্ষতি করে। পোকায় আক্রান্ত বস্ত্র ভাঁজ খুলে, ধুলো ময়লা পরিষ্কার করে অল্প সময় রোদে রাখা দরকার এবং তারপর নরম ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে আবার গুছিয়ে রাখা যায়। সম্পূর্ণভাবে কীটমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কীটানুনাশক ব্যবহার করা যায় যেমন ডাইক্লোরোবেঞ্জিন, ডি. ডি. টি, পাইরিথ্রাম-একসট্রাকটস্।

বস্ত্র পরিষ্কার করা ঃ বস্ত্রে খুব তাড়াতাড়ি ধুলো, বালি, ময়লা লাগে। কোন পচা জিনিষের সংস্পর্শে এলেও এতে দাগ পড়তে দেখা যায়। এছাড়া আণুবীক্ষণিক জীব ও পোকার দ্বারা আক্রান্ত হলে বস্ত্রের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে এবং এর উপর দাগ পড়তে দেখা যায়। রঙীন বস্ত্রে ধুলো, বালি, ময়লা, ধোঁয়াশা লাগার ফলে রং বিবর্ণ হয়ে যায় ও অনেক সময় রং ক্ষরিত হয়ে যেতে পারে। বস্ত্রের উপাদান ও অবস্থার উপর পরিষ্কার করা সম্ভব কিনা এবং কি পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা যায় তা স্থির করা উচিত।

বস্ত্রের উপাদান যাই হোক না কেন যদি খুব স্পর্শকাতর বা দুর্বল বস্ত্র হয় তাহলে জলীয় বস্তুতে নিমজ্জিত করে এটি পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। যদি বস্ত্র স্পর্শকাতর

এবং হাতে নাড়াচাড়া করলে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহলে জলীয় বস্তুতে নিমজ্জিত করে এটি পরিষ্কার করা যায়।

জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা : মৃদু জল সাধারণত বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, যদিও পরিশ্রুত জল বা বৃষ্টির জল এই কাজে ব্যবহার করা যায়। মৃদু জল, পরিশ্রুত জল বা বৃষ্টির জল যদি না পাওয়া যায় তাহলে কয়েক ফোঁটা জিয়োলাইট জলে মিশ্রিত করে সেইজল দিয়ে বস্ত্র পরিষ্কার করা যায়। বস্ত্র জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য নানান আয়তনের পলিথিনের পাত্র ব্যবহার করা দরকার। প্রয়োজন হলে সাইফন পদ্ধতিতে জল পলিথিনের পাত্র থেকে নিষ্কাশিত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। দুর্বল বস্ত্রের ক্ষেত্রে অবলম্বন হিসাবে পাত্রের মধ্যে প্রথমে একটি পাতলা পলিথিনের কাপড় দিয়ে তারপর বস্ত্রটিকে রাখতে হবে। পরিষ্কার করার পর পলিথিনের কাপড়টিকে সাবধানে জলের বাইরে তুলে আনতে হবে ও জল বার করে দিতে হবে। এর ফলে বস্ত্রের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। বস্ত্রটি যদি রঙীন হয় তাহলে জল দিয়ে অল্প একটি জায়গায় পরীক্ষা করা দরকার। জল দেওয়ার ফলে যদি রঙীন অংশটি বিবর্ণ বা ক্ষরিত হয় তাহলে জল দেওয়ার আগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রংএর ক্ষরিত বা বিবর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রোধ করা প্রয়োজন। রঙীন অংশটিকে সুরক্ষার জন্য ৫ শতাংশ সাধারণ লবণের দ্রবণ অথবা ২০ শতাংশ অ্যাসেটিক অ্যাসিডে বস্ত্রটিকে সিক্ত করার দরকার। অবশ্য লবণের দ্রবণ বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড দ্রবণ ব্যবহার করার ফলে রংগুলি স্থায়ী হবে কিনা তা বস্ত্রের অল্প একটি রঙীন অংশে পরীক্ষা চালিয়ে প্রথমে স্থির করা দরকার। সিক্ত বস্ত্রটিকে বার করে আনার পর মৃদু জলে অন্ততঃ ৬০ থেকে ১০০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। প্রতি ২০-২৫ মিনিট অন্তর জল পরিবর্তন করা দরকার। জলে নিমজ্জিতকরার ফলে কিছু কিছু অপবস্তু জলে দ্রবীভূত হবে. কিন্তু কিছু অপবস্তু আবার জলে দ্রবীভূত হয়না। অদ্রবীভূত অপবস্তু অনেক সময় বস্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে পাত্রের নীচে জমতে পারে এবং একটি নরম ব্রাশ দিয়েও কিছু ময়লা বস্ত্র থেকে তুলে দেওয়া যায়। এটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করার পর পলিথিনের কাপড়সহ বস্ত্রটি এমন ভাবে বার করে আনা দরকার যার ফলে অদ্রবীভূত ময়লা ও অপবস্তুর অবশিষ্টাংশ না লেগে থাকে। এটি ঘরের মধ্যে অল্প শুকিয়ে নিয়ে তারপর একটি জল শোষণকারী গরম তোয়ালের উপর রাখতে হবে। কিছু সময় এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর যখন বস্ত্রটি প্রায় শুকনো হয়ে যাবে তখন একে একটি পরিষ্কার পলিথিনের উপর টানটান করে বিছিয়ে দিতে হবে। এখন ছোট ছোট তামার পিন একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর এর উপর লাগাতে হবে এবং এটি শুকনো হওয়ার সাথে সাথে পিনগুলিও তুলে তুলে এমনভাবে লাগাতে হবে যার ফলে বস্ত্রের কোন অংশ কুঁচকে না যায়। দূষণমুক্ত পরিবেশে পরিমিত তাপমাত্রায় ও আর্দ্রতার মধ্যে এটি শুকনো করা উচিত।

পরিষ্কারক পদার্থ ব্যবহার : বস্ত্রে এমন অনেক দাগ দেখা যায় যা জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় না। তাই সংরক্ষণাগারে নানান ধরনের পরিষ্কারক পদার্থ ব্যবহার

করা হয়। বিশেষভাবে যে সব পরিষ্কারক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা হলো লিসাপল-এন এবং ইজিপল-সিএ-একসট্রা। সংগ্রহশালায় রক্ষিত কোন মলিন বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য সাবান বা এই জাতীয় কোন পাউডার একেবারেই ব্যবহার করা ঠিক নয় কারণ অনেক সময় এগুলিতে এমন ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা বস্ত্রের ক্ষতিসাধন করতে পারে। পরিষ্কারক পদার্থ দিয়ে রঙীন বস্ত্র পরিষ্কার করার পূর্বে পরিষ্কারক পদার্থের সংস্পর্শে এলে এর রঙীন অংশটি ক্ষরিত বা বিবর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা দরকার। পরিষ্কার করতে গিয়ে যদি রংটি ক্ষরিত বা বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখা যায় তাহলে ৫ শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে অথবা ২০ শতাংশ অ্যাসেটিক অ্যাসিডের দ্রবণে নিমজ্জিত করে রংগুলি স্থায়ী করা দরকার। পরিষ্কারক পদার্থের লঘু দ্রবণ বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়াও এটি সমসত্ব দ্রবণ ফলে বস্ত্রের সব অংশে সমান ভাবে কাজ করতে পারে। বস্ত্রটিকে সমসত্ত্ব দ্রবণে অন্ততঃ ৩০ মিনিট রাখার দরকার এবং খুবই অপরিষ্কার বস্ত্রের ক্ষেত্রে এই দ্রবণ একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবর্ত্তন করা দরকার। সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করার পর বস্ত্রটিকে মৃদু বা পরিশ্রুত জলে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে শুকনো করা প্রয়োজন। জল দিয়ে পরিষ্কার করার সময় যে পদ্ধতিতে এটি শুকনো করা হয়েছে এক্ষেত্রেও একইভাবে এটি শুকনো করা যায়।

ইজিপল-সিএ-একসট্রা বা লিসাপল-এন ইত্যাদি না পাওয়া গেলে রিটাফল বস্ত্র পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করা যায়। এটি ঘষে সহজে ফেনা বার করা যায়। এটি একটি প্রশমিত (neutral) দ্রবণ। রঙীন বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য অল্প জায়গায় পরীক্ষা করে রঙীন অংশের কোন গুণগত পরিবর্ত্তন হচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার।

ড্রাইক্লিনিং ঃ সংগ্রহশালায় এমন অনেক বস্ত্র দেখা যায় যা পরিষ্কার করার জন্য জল বা অন্য কোন পরিষ্কারক বস্তু ব্যবহার করা যায় না। এই সব ক্ষেত্রে ড্রাইক্লিনিং পদ্ধতিতে এগুলি পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট যান্ত্রিক বন্দোবস্ত ও সুদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। গরম বাষ্প অথবা জৈব দ্রবণ ব্যবহার করে ড্রাইক্লিনিং করা যায়।

গরম বাষ্প ব্যবহার ঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করার জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। বাষ্প দিয়ে অনেক সময় পোষাক-পরিচ্ছদের উপর থেকে নানান ধরনের দাগও পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। লণ্ড্রিতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে বাষ্প ব্যবহার করে বস্ত্র পরিষ্কার করা হয় ঠিক একই ভাবে সংগ্রহশালাতেও বস্ত্র পরিষ্কার করা যায়।

জৈব দ্রাবক (organic solvents) ব্যবহার করে ও বস্ত্র পরিষ্কার করা যায় বিশেষতঃ যখন কোনভাবেই জল দিয়ে এটি পরিষ্কার করা যায় না। জৈব দ্রাবক হিসাবে ট্রাইক্লোরোইথিলিন (ওয়েস্টরোসল) এবং ডাইক্লোরোইথিলিন ব্যবহার করা যায়।

এগুলি ব্যবহার করার আগে রং-এর উপর এদের প্রভাব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া দরকার কারণ অনেক সময় এটি রং-এর ক্ষতিসাধন করে। ট্রাইক্লোরোইথিলিন অদাহ্য এবং এটি খাঁটি ও ঠাণ্ডা অবস্থায় ব্যবহার করা যায়। বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য ১০ থেকে ৩০ মিনিট এই জৈব দ্রবণে নিমজ্জিত করে রাখা যায়। ডাইক্লোরোইথিলিন রঙীন বস্ত্র পরিষ্কার করার কাজে কোন পরীক্ষা না করেই ব্যবহার করা যায় কারণ এটি রং-এর কোন ক্ষতি করে না।

দাগ ও রং পরিষ্কার করা ঃ দুর্বল অথবা খুব পুরানো বস্ত্র থেকে দাগ পরিষ্কার করা বিপজ্জনক ও সব সময় তা করা উচিত নয়। দীর্ঘদিন যদি কোন রং বা দাগ বস্ত্রে লেগে থাকে তাতে এদের মধ্যে একটি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে যা মলিনতা-অপনোদক বস্তু ব্যবহার করে পরিষ্কার করা যায়। মলিনতা-অপনোদক বস্তু ব্যবহার করলে বস্ত্রের ক্ষতি হতে পারে তাই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য এটি ব্যবহার না করাই বিধেয়। এছাড়াও দাগ বা রং তোলার পূর্বে বস্ত্রের গঠন, দাগ ও রং-এর রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করা উচিত। দাগ পড়ার কারণ কি এবং জলের সংস্পর্শে এলে দাগটি দ্রবীভূত ক্ষরিত বা বিবর্ণ হতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করা দরকার। কোন বিশেষ দ্রাবকে দাগটি দ্রবীভূত হয় কিনা এবং কি ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত তা স্থির করা দরকার।

চর্বিজাতীয় বা তৈলজাতীয় কোন দাগ বস্ত্রের উপর থাকলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দাগ পরিষ্কার করা যায় ঃ প্রথমে বস্ত্রটি টানটান করে একটি কাঁচের উপর এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে দাগ পড়া দিকটি নীচের দিকে থাকে। কাঁচের উপর দাগযুক্ত অংশটিতে একটি ব্লটিং পেপার রেখে তারপর বস্ত্রটিকে রাখতে হবে। এখন উপর থেকে প্রয়োজনীয় দ্রাবক অল্প অল্প দাগটির পিছনে লাগানো দরকার। সাধারণ উলের বস্ত্রে এই ধরণের দাগ পাওয়া গেলে ট্রাইক্লোরোইথিলিন অথবা স্পিরিট ব্যবহার করা যায়। সিল্ক, তুলো, পাট ইত্যাদি বস্ত্রের ক্ষেত্রেও ট্রাইক্লোরোইথিলিন অথবা স্পিরিট ব্যবহার করে দাগ পরিষ্কার করা যায়। অতিরিক্ত দ্রবণ যদি কিছু ব্যবহৃত হয় তা হলে ব্লটিং পেপার শোষণ করে নিতে পারে।

এছাড়া মোমের দাগ তোলার জন্য দাগযুক্ত জায়গাটির উভয় দিকে ব্লটিং পেপার দিয়ে একটি গরম ইস্ত্রি আস্তে আস্তে চালাতে হবে ; ফলে মোম গলে যায়, কিছু অংশ ব্লটিং কাগজে শোষিত হয় এবং কিছু অংশ বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। এখন ব্লটিং কাগজটি তুলে নিতে হবে ও যদি বস্ত্রের উপর এর পরেও অল্প দাগ দেখা যায় তাহলে তা বেঞ্জিন, টারপেনটাইন অথবা ট্রাইক্লোরোইথিলিন দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছুরি দিয়ে আস্তে আস্তে উপরিভাগের মোম পরিষ্কার করা যায় এবং তারপর উপযুক্ত দ্রাবণ ব্যবহার করে সম্পূর্ণভাবে দাগমুক্ত করা যায়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মোম পরিষ্কার করতে হলে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

কাদার দাগ পরিষ্কার করা ঃ উলের বস্ত্র থেকে কাদার দাগ পরিষ্কার করার জন্য ১০ ভাগ হাইড্রোজেন পারক্সাইডের সঙ্গে ৯০ ভাগ অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করে

যে দ্রবণ পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা যায়। যদি এই দ্রবণ দিয়ে কাদার দাগ তোলা না যায় তাহলে ০·১ শতাংশ অ্যামোনিয়া দ্রবণ ব্যবহার করে এটি পরিষ্কার করা যায়। কাদার দাগ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর জায়গাটি অল্প গরম জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা দরকার।

সিল্কের বস্ত্রের উপর যদি কাদার দাগ তোলার জন্য হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্যবহার করা যায় এবং যদি এতে দাগ পরিষ্কার না হয় তাহলে ০ ১ অ্যামোনিয়া দ্রবণ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। অ্যামোনিয়া দ্রবণে দাগ পরিষ্কার করার পর মৃদু জল দিয়ে দাগমুক্ত জায়গাটি পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে। তুলো পাট অথবা শনের বস্ত্রের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

মরচে পড়া দাগ পরিষ্কার করা ঃ উলের বস্ত্রে মরচের দাগ পড়লে এই দাগ পরিষ্কার করার জন্য ১ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও ৩ ভাগ জল মিশ্রিত করে যে দ্রবণ পাওয়া যায় সেই দ্রবণ ব্যবহার করা যায়। জায়গাটি দাগমুক্ত হওয়ার পর মৃদু জল দিয়ে এটি ধুয়ে দিতে হবে। সিল্কের বস্ত্রে মরচের দাগ তোলা যায় ১ শতাংশ অকজ্যালিক অ্যাসিড দিয়ে। যদি এতেও দাগ পরিষ্কার না হয় তাহলে ০·৫ শতাংশ অ্যাসেটিক অ্যাসিড জায়গাটিতে লাগাতে হবে। দাগমুক্ত হওয়ার পর মৃদু জল দিয়ে জায়গাটি ধুয়ে ফেলতে হবে। তুলো বা পাটের বস্ত্রের ক্ষেত্রে যদি মরচের দাগ দেখা যায় তাহলে উলের বস্ত্রে মরচের দাগ পরিষ্কার করার জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে সেই একই পদ্ধতিতে মরচের দাগ পরিষ্কার করা সম্ভব।

লাল কালির দাগ পরিষ্কার ঃ উলের বস্ত্রে লাল কালির দাগ পরিষ্কার করতে হলে প্রথমে দাগযুক্ত জায়গাটিকে মৃদু জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে; তারপর মেথিলেটেড স্পিরিট লাগাতে হবে এবং তারপর ০ ১ শতাংশ অ্যামোনিয়া দ্রবণ লাগিয়ে দিতে হবে। দাগ মুক্ত হওয়ার পর আবার মৃদু জল দিয়ে জায়গাটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। সিল্কের বস্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রথমে অ্যামোনিয়া মিশ্রিত হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও পরে ১ শতাংশ অকজ্যালিক্ অ্যাসিড সবশেষে ২ শতাংশ হাইড্রোক্লোরিক্ অ্যাসিড ব্যবহার করে লাল কালির দাগ পরিষ্কার করা যায়। তুলো, পাট বা শনের বস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রথমে ২ শতাংশ ক্লোরোমাইন-টি অথবা ০·১ শতাংশ অ্যামোনিয়া লাগিয়ে লাল কালির দাগ সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার করা যায়।

নীল, কালো কালির দাগ পরিষ্কার ঃ উলের বস্ত্রের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াযুক্ত হাইড্রোজেন পারক্সাইড (হাইড্রোজেন পারকসাইডে অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করে ক্ষারীয় (alkaline) দ্রবণ করা হয়), পরে ২ শতাংশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও সবশেষে দরকার হলে ০·৫ শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিড লাগিয়ে পরিষ্কার করা যায়। পরিষ্কার করার পর জায়গাটিকে মৃদু জল দিয়ে পরিষ্কার করা দরকার। সিল্কের বস্ত্রের ক্ষেত্রে এই দাগ পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে ক্ষারীয় হাইড্রোজেন পারক্সাইড (অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করে), ও পরে ০·৫ শতাংশ অ্যাসেটিক অ্যাসিড সবশেষে প্রয়োজন হলে ২ শতাংশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়। দাগ পরিষ্কার করার পর মৃদু

জল দিয়ে জায়গাটি ধুয়ে দিতে হবে। পাট, শন বা তুলোর বস্ত্রে এই ধরনের দাগ পরিষ্কার করার জন্য ক্লোরোমাইন-টি ব্যবহার করা যায়।

নকল করার জন্য ব্যবহৃত কালির দাগ পরিষ্কার: উলের বস্ত্রে এই ধরনের কালির দাগ পাওয়া গেলে মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। পরিষ্কার করার পর জায়গাটিকে মৃদু জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়ার দরকার। সিল্কের বস্ত্র ও উলের বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

তুলো, শন বা, পাটের বস্ত্রের ক্ষেত্রে সিল্কের বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে সেই পদ্ধতিতে দাগ মুক্ত করা যায়। যদি এতে দাগ মুক্ত করা না যায় তাহলে ৫ শতাংশ সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইটের সঙ্গে অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করে দাগ পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা যায়।

মার্কিং কালির দাগ পরিষ্কার: উলের বস্ত্রে এই কালির দাগ পরিষ্কার করার জন্য স্পিরিট সোপ প্রথমে লাগাতে হবে পরে ট্রাইক্লোরোইথিলিন দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। সিল্কের বস্ত্র হলে প্রথমে ০·১ শতাংশ অ্যামোনিয়া ও পরে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্যবহার করে দাগ পরিষ্কার করা যায়। পাট, শন বা তুলোর বস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রথমে দাগযুক্ত জায়গাটিকে মৃদু জল দিয়ে সিক্ত করা দরকার, পরে ৫ শতাংশ সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট, (অ্যামোনিয়া মিশিয়ে ক্ষারে পরিণত করার পর) দাগের উপর লাগিয়ে দাগ পরিষ্কার করা যায়।

তেল-রং পরিষ্কার: উলের বস্ত্রে তেল রং লাগলে প্রথমে মেথিলেটেড স্পিরিট সোপ ও দরকার মত সাদা স্পিরিট ব্যবহার করে দাগ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা যায়। সিল্কের বস্ত্রে প্রথমে মেথিলেটেড স্পিরিট পরে স্পিরিট সোপ লাগিয়ে দাগ পরিষ্কার করা সম্ভব।

তুলো, পাট বা শনের বস্ত্র হলে প্রথমে ১ শতাংশ অকজ্যালিক অ্যাসিড লাগিয়ে ও পরে জায়গাটিকে মৃদু জলে সিক্ত করে করে দাগ পরিষ্কার করা উচিত।

পুরাতন তেল রং-এর দাগ পরিষ্কার: উলের বস্ত্রে পুরাতন তেল রং-এর দাগ লাগলে পাইরিডিন দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। দাগ পরিষ্কার হওয়ার পর দাগমুক্ত জায়গাটি মৃদু জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। উলের বস্ত্রের মত একই ভাবে সিল্কের বস্ত্রও পরিষ্কার করা যায়। পাট, শন বা তুলোর বস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রথমে মরফোলাইন দিয়ে পরে জায়গাটি মৃদু জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়।

ঠোঁটে দেওয়ার রং পরিষ্কার: উলের বস্ত্রে যদি ঠোঁটে দেওয়ার রং লেগে যায় তাহলে ৫ শতাংশ টার্টারিক অ্যাসিড লাগিয়ে পরে মৃদু জল দিয়ে জায়গাটি থেকে রং-এর দাগ পরিষ্কার করা যায়। সিল্কের বস্ত্রে এই রং পরিষ্কার করার জন্য ০·৫ শতাংশ অ্যাসেটিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। মৃদু জল দিয়ে জায়গাটি পরে ধুয়ে পরিষ্কার করা উচিত। এই পদ্ধতিতে পাট, শন বা তুলোর বস্ত্র থেকে ঠোঁটে দেওয়ার রং তুলে বস্ত্র পরিষ্কার করা সম্ভব।

জীর্ণ ও দুর্বল বস্ত্র সংরক্ষণ: বস্ত্র যখন মাটির নীচ থেকে পাওয়া যায়

তখন এটি খুবই শক্ত, জীর্ণ, স্পর্শকাতর ও ভঙ্গুর হয়। অনেক সময় এই বস্ত্র মাকড়শার ফাঁদের (spiders web) মত দেখতে হয়। এছাড়া সিক্ত ও নানান রকম রং-এর দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে। সংগ্রহশালায় এই ধরণের বস্ত্র সংরক্ষণ করা খুব কঠিন ব্যাপার।

বস্ত্রটিকে খুব সাবধানে মাটির নীচ থেকে তুলে আনতে হবে। তুলে আনার সময় যাতে কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য একে একটি অবলম্বনের উপর রেখে উপরে তুলে আনা দরকার। এখন এর উপর লেগে থাকা অপবস্তু পরিষ্কার করে দিতে হবে। যদি কোন মৃত পোকা, কাদা, বা অন্য কোন বস্তু লেগে থাকে তাহলে ছুরি বা চিমটে দিয়ে এগুলি তুলে দিতে হবে। বস্ত্রটি যদি সিক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে এটি যত শুকনো হবে ততই এর গায়ে সাদা সাদা দাগ দেখা যেতে পারে; এই সাদা দাগগুলি হলো লবণ জাতীয় পদার্থ। যদি পরিশ্রুত জল আস্তে আস্তে ছিটানো হয় তাহলে লবণ দ্রবীভূত হয়ে অনেকখানি জলের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে। অল্প শুকিয়ে নেওয়ার পর এটি উল্টে দিয়ে আবার পরিশ্রুত জল ছিটিয়ে বস্ত্রটি সম্পূর্ণ লবণমুক্ত করা যায়।

এই ধরনের স্পর্শকাতর, জীর্ণ, শক্ত, ভঙ্গুর বস্ত্রকে ধুয়ে পরিষ্কার করা অসম্ভব। অবশ্য যদি কোন অবলম্বনের উপর রেখে এটি পরিষ্কার করা যায় তাহলে বস্ত্রে লেগে থাকা অপবস্তুগুলি যা বস্ত্রের ক্ষতির কারণ হয় সেইগুলি খুব সাবধানে ধুয়ে সম্ভব মত পরিষ্কার করা উচিত। যদি বস্ত্রে কোন চিত্রিত অংশ থাকে এবং জলের সংস্পর্শে এলে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই সব ক্ষেত্রে জলে ধুয়ে বস্ত্র পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বস্ত্র খুব শক্ত হয়ে একটির সাথে আর একটি জড়িয়ে ভাজ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় বস্ত্রটিকে একটি পরিষ্কার কাঁচের উপর রেখে সাবধানে ভাঁজগুলি খুলতে হবে এবং দরকার হলে অল্প জল ছিটিয়ে বস্ত্রটিকে নমনীয় করে নেওয়া উচিত। ভাঁজ মুক্ত করার পর এটি জল দিয়ে সিক্ত করে আবার শুকনো করলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

বস্ত্র ধুয়ে পরিষ্কার করার পদ্ধতি আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে যা করণীয় তাহলো একটি রন্ধ্রবহুল অবলম্বনের উপর এটি রাখতে হবে যার ফলে জলে দ্রবীভূত হয়ে ধুলো বালি ময়লা সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। এইভাবে বস্ত্রটি ময়লা পরিষ্কার করার পর একটি টেরিলিন জাতীয় কাপড়ের মধ্যে রেখে গরম তোয়ালে দিয়ে আর্দ্রতার পরিমাণ কমিয়ে নিতে হবে। এখন বস্ত্রটিকে একটি পলিথিন চাদরের উপর রেখে শুকনো করা দরকার।

জীর্ণ সংস্কার ঃ অনেক সময় বস্ত্র একেবারে টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া যায়। এই টুকরো অংশগুলি কখন আঠা জাতীয় পদার্থ দিয়ে জোড়া উচিত নয়। কারণ এর ফলে আণুবীক্ষণিক জীবের আক্রমণ ঘটতে পারে। টুকরো টুকরো বস্ত্রের অংশগুলি প্লাসটিকের অবলম্বনের উপর আটকে রাখা যায়। কোন বস্ত্রের অবস্থা যদি এমন হয় যে এটি ঝুলিয়ে রাখা যায় না তখন বস্ত্রটির পেছনের দিকে একটি অবলম্বন

দেওয়া বিশেষ দরকার। অবলম্বন হিসাবে টেরিলিন জাতীয় কাপড় ব্যবহার করা যায়। বস্ত্রে জীর্ণসংস্কার করার জন্য বস্ত্র যে সুতো দিয়ে প্রস্তুত ঠিক সেই জাতীয় সুতো ব্যবহার করা উচিত। জোড়া দেওয়ার জন্য অবশ্য অনেক সময় কৃত্রিম সুতো ব্যবহার করতে দেখা যায়।

কীটাণুনাশক ব্যবহার ঃ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বস্ত্র রাখার জায়গাগুলিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কীটাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত। কীটাণুনাশক পদার্থ হিসাবে ডাইক্লোরোবেঞ্জিন ব্যবহার করা যায়। এছাড়া পাইরিথ্রাম একসট্রাকস, ডি. ডি. টি., ইত্যাদি ছিটিয়েও পোকা ও অন্যান্য আণুবীক্ষণিক প্রাণীর আক্রমণ থেকে বস্ত্র রক্ষা করা যায়।

ধাতব শিল্পবস্তু সংরক্ষণ

বিশ্বে চুয়াত্তরটি আবিষ্কৃত এবং কৃত্রিমভাবে তৈরী ধাতু জাতীয় মৌলিক পদার্থের মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশটি ধাতু মোটামুটিভাবে শিল্পসৃষ্টি ও সভ্যতার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। সংগ্রহশালায় যে সব ধাতব শিল্পবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, লোহা, টিন, সীসা, তামা, রুপা ও সোনার বস্তু বেশি পরিমাণ দেখা যায়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সব ধাতব শিল্পবস্তুর অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে শিল্পবস্তুর শিল্প ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্য, দ্যুতি, উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুটি দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং নানান ধরনের পদার্থের আস্তরণ বস্তুটিকে আবৃত করে ফেলে। রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি বস্তুর উপর পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হয় এবং অনেক সময়ই এটি তড়িত-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পর্যবসিত হতে দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ধাতুর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে রাসায়নিক ক্রিয়া ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত হতে পারে। যে কোন ধাতুর শিল্পবস্তু হোক না কেন অবক্ষয় শুরু হলে বা অবক্ষয় বিক্রিয়া সক্রিয় থাকলে প্রথমে অবক্ষয়ের সম্ভাব্য কারণগুলি নির্ণয় করা দরকার। ক্লোরিন অনেক সময় ধাতব বস্তুর অবক্ষয়ের কারণ হয় এবং এই সব ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রথমে বস্তুকে ক্লোরিনমুক্ত করা দরকার। বস্তু অনেক সময় 'সম্ভ্রান্ত' আস্তরণ (noble patina) দ্বারা আবৃত থাকে তখন এই সম্ভ্রান্ত আস্তরণটিকে সুরক্ষিত করে এটি সংরক্ষণ করা উচিত। কারণ এটি বস্তুটিকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

ক্ষয়িষ্ণু ও অবক্ষয়যুক্ত ধাতব শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়—যেমন (ক) দ্রাবক ব্যবহার করে, (খ) রাসায়নিক ও তড়িৎবিশ্লিষ্ট বিজারণ পদ্ধতি ও (গ) যান্ত্রিক পদ্ধতি। ধাতব বস্তুর বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক গঠন ও অবক্ষয় বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির ধরনের উপর নির্ভর করে, কি পদ্ধতিতে বস্তুর সুরক্ষা ও অবক্ষয় মুক্ত করা সম্ভব।

ক্ষয়িষ্ণু ধাতব শিল্পবস্তুকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রথমে বস্তুটিকে ভৌত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। নানান পদ্ধতিতে বস্তুর ভৌত পরীক্ষা করা যায়, যেমন : বস্তুটিকে খালি চোখে ও লেন্সের সাহায্যে পরীক্ষা করা, ছুঁচ দিয়ে গর্ত করে গর্ভধাতুর পরিমাণ নির্ণয় করা, চুম্বক দিয়ে পরীক্ষা করা ইত্যাদি। বস্তুর উপর যদি কোন আস্তরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার রং, ঘনত্ব, কতখানি নিয়মিত (regular), আস্তরণটি কতটা দৃঢ়, এবং বস্তুতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বা খোদাই করা কিছু আছে কিনা, কোন ফাটল আছে কিনা তা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। পুরু আস্তরণযুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে একস্-রে পদ্ধতিতে বস্তুর অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া সম্ভব। যদি কোন শিল্পবস্তু দীর্ঘদিন মাটির নীচে পড়ে থাকে তাহলে অবক্ষয়ের হার নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক মৃত্তিকার অম্লত্বের পরিমাণ, সরন্ধ্রতা (porosity) এবং দ্রবীভূত লবণের পরিমাণের উপর। এই বস্তুগুলি জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎ-সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়। ধাতুর অবক্ষয়ের পরিমাণবৃদ্ধির সাথে সাথে বস্তুর ওজন বৃদ্ধি পায়।

ধরা যাক মাটির নীচে পড়ে থাকা একটি ধাতব বস্তু, যদি এতে অবক্ষয় বিক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে এবং বস্তুটি যদি সচ্ছিদ্র হয় তাহলে এই ছিদ্রগুলিতে ক্ষতিকারক লবণ জমতে পারে। এই ধরনের বস্তুর উপর যদি সম্ভ্রান্ত আস্তরণ সৃষ্টি হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিকারক লবণ বস্তুর আস্তরণের নীচে থেকে যেতে পারে।

যদি এই ধরনের বস্তুকে উৎখনন করে বাহিরে নিয়ে আসা হয় তাহলে বস্তুর ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে কারণ যখন এটি বাইরের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে তখন নতুন করে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হতে পারে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উপরের আস্তরণটির ঘনত্ব বাড়তে পারে এবং গর্ভধাতুর পরিমাণ কমতে পারে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আস্তরণটি আয়তন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বস্তুকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করে। আবার মাটির নীচে যদি দীর্ঘদিন কোন শিল্পবস্তু থাকে তাহলে এটি যে ক্ষয়িষ্ণু হবে তার কোন মানে নেই। বহুক্ষেত্রে একেবারেই অবিকৃত অবস্থায় শিল্পবস্তু মাটির নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়। সংগ্রহশালায় যদি ধাতব বস্তু আর্দ্র ও অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে রাখা হয় তাহলে আস্তে আস্তে এটি মলিন ও বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া সালফিউরাস গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলেও এই বস্তুগুলির উপরিভাগ মলিন হয়ে যেতে পারে। ধাতব অকসাইডের একটি পাতলা আস্তরণ পড়ার ফলেই এই পরিবর্ত্তন হতে দেখা যায়। ধাতব বস্তুর বাহ্যিক এই রূপান্তরকে দ্যুতিহীন বা বিবর্ণ (Tarnish) অবস্থা বলা যায়।

সংগ্রহশালায় যেমন বিভিন্ন মৌল ধাতুর শিল্পবস্তু দেখা যায় সেইরকম বিভিন্ন ধাতু বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত করে যে ধাতু-সংকর (alloy) হয় সেগুলি দিয়ে প্রস্তুত শিল্পবস্তুও পাওয়া যায়। আমরা জানি একাধিক ধাতুর সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব (homogeneous বা heterogeneouos) মিশ্রণকে ধাতু-সংকর বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যায়।

নাম	উপাদান
পিতল—	Cu ঃ Zn (তামা ঃ দস্তা) ৭০-৮০% ঃ ৩০-২০%
	Cu ঃ Sn (তামাঃ টিন) ৮০-৯০% ঃ ২০-১০%
কলংকহীন ইস্পাত— (Stainless Steel)	Fe ঃ Cr ঃ Ni (লোহা ক্রোমিয়াম ঃ নিকেল)
ইস্পাত-সংকর—	Fe ঃ Ni ; Fe ঃ Mg ৯০ ঃ ১০
জার্মান সিলভার-	Cu ঃ Zn ঃ Ni ৫০-৬০% ঃ ৩০-২০ ঃ ২০
টাইপ মেটাল—	Pb ঃ Sb ঃ Sn ৮০ ঃ ১৫ ঃ ৫
ঝালাই ধাতু—	Pb ঃ Sn ৫০ ঃ ৫০
গান মেটাল—	Cu ঃ Sn ঃ Zn ৮৫ ঃ ৫ ঃ ১০
মোনেট মেটাল—	Cu ঃ Ni ঃ Fe ২৭ ঃ ৭০ ঃ ২-৩

সংগ্রহশালায় ধাতু ও ধাতুসংকরের শিল্পবস্তুগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ধাতুর সাধারণ ধর্মগুলি জানা বিশেষ প্রয়োজন।

ধাতুর ভৌতধর্ম ঃ (i) ধাতব বস্তু দেখতে চকচকে ও উজ্জ্বল (ii) আঘাত করলে বিশেষ একপ্রকার ধাতব শব্দ পাওয়া যায়, যদিও ব্যতিক্রম আছে (iii) নমনীয় ও সম্প্রসারণশীল (কিন্তু অ্যান্টিমনি ও বিসমাথ ভঙ্গুর এবং পারদ তরল) (iv) পারদ অল্প মাত্রায় কিন্তু অন্য সব ধাতব বস্তু অধিক মাত্রায় তাপ ও তড়িতের পরিবাহী। (v) ধাতুর ঘনত্ব বেশি যদিও সোডিয়াম, পটাসিয়াম জলের চাইতে হাল্কা এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ঘনত্ব অন্য ধাতুর তুলনায় কম। (vi) পারদ ছাড়া অন্য সব ধাতুর গলনাংক ও স্ফুটনাংক অ-ধাতুর চেয়ে বেশি। (vii) বিভিন্ন ধাতু গলিয়ে ও মিশ্রিত করে ধাতু-সংকর তৈরী করা যায়।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ

(i) **মৌলের তড়িৎ ধর্ম ঃ**

ধাতু ধনাত্মক তড়িৎ ধর্মী (Electro-positive) তাই এগুলি ইলেকট্রন বর্জন করে ক্যাটায়নে পরিণত হয়। $Na - e \rightarrow Na^+$; তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় ধাতব যৌগের ধনাত্মক তড়িৎ ধর্মী ধাতব আয়ন বা ক্যাটায়ন ঋণাত্মক তড়িৎ দ্বারের দিকে আকৰ্ষিত হয়। যথা ঃ $NaCl \rightleftharpoons Na^+$(ক্যাথোড) $+ Cl^-$।

(ii) **অকসাইডের প্রকৃতি :**

ধাতুর অকসাইড (Cuo, Fe_2O_3, CaO) ধর্মে ক্ষারীয়। ধাতুর অক্সাইড অ্যাসিডকে প্রশমিত করে লবণ ও জল গঠন করতে পারে। যথা $Na_2O+2HCl=2NaCl+H_2O$। ব্যতিক্রম : সাধারণতঃ ধাতুর অকসাইড ক্ষারীয় কিন্তু দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, সীসা, ইত্যাদির অক্সাইড (ZnO, Al_2O_3, PbO) অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সাথে বিক্রিয়ার ফলে লবণ গঠন করতে সক্ষম হয় বলে উভধর্মী। উচ্চতর যোজ্যতার ক্রোমিয়াম অকসাইড ও ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (CrO_3, Mn_2O_7) জাতীয় ধাতব অকসাইডগুলি অ্যাসিড ধর্মী।

(iii) **অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া :**

ধাতব শিল্পবস্তু সাধারণতঃ ঘন ও লঘু HCl ও H_2SO_4 এ দ্রবীভূত হয় এবং হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করে। $Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$ ব্যতিক্রম : তড়িৎ রাসায়নিক তালিকায় হাইড্রোজেনের নীচে অবস্থিত কোন ধাতু হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করতে পারে না।

(iv) **হ্যালোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া**

ধাতব শিল্পবস্তু হ্যালোজেনের সঙ্গে হ্যালাইড যৌগ গঠন করে। যথা : NaCl, $ZnCl_2$; এরূপ হ্যালাইড সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শে স্থায়ী থাকে ; কিন্তু $FeCl_3$, $AlCl_3$ জলে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে যায়। যেমন—$FeCl_3+3H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3+3HCl$। এগুলি প্রধানতঃ অনুদ্বায়ী প্রকৃতির যৌগ।

ব্যতিক্রম : সাধারণতঃ ধাতব হ্যালাইড অনুদ্বায়ী ; কিন্তু স্ট্যানিক ও অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ($SnCl_4$, $AlCl_3$) উদ্বায়ী।

(v) **হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া :**

ধাতব শিল্পবস্তু সাধারণতঃ হাইড্রোজেনের যে হাইড্রাইড যৌগগুলি গঠন করে সেই যৌগগুলি অনুদ্বায়ী (non-volatile), যথা : NaH, CaH_2 ইত্যাদি। $2Na+H_2=2NaH$। জলীয় দ্রবণে এদের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটে : $CaH_2+2H_2O=Ca(OH)_2+2H_2$

(vi) **জটিল যৌগ গঠন :**

ধাতব শিল্পবস্তু জটিল লবণ (Compelx salt) গঠন করতে সক্ষম। এরূপ যৌগে ধাতু ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন উভয় আয়নের অংশ হতে সক্ষম। যথা :

$[Cu(NH_3)_4]SO_4 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{++}+SO_4^{=}$

বা, $K_4[Fe(CN)_6] \rightleftharpoons 4K^{+}+[Fe(CN)_6]^{\equiv}_{4}$

(vii) **যৌগের ইলেকট্রনীয় প্রকৃতি**

ধাতু সাধারণতঃ অধাতুর সঙ্গে তড়িৎযোজী যৌগ গঠন করে। তাই এরূপ যৌগে দ্রবীভূত বা বিগলিত বা অস্থায়ী তড়িৎ বিয়োজন ঘটতে পারে। যথা :

$NaCl \Rightarrow Na^{+}Cl^{-}$ তড়িৎযোজী যৌগ $[Na^{+}Cl^{-}]$, [$(Mg^{+2}\ 2Cl^{-})$]।

ধাতুর রাসায়নিক ধর্ম (Electro-chemical Character of Metals) : কপার সালফেট দ্রবণে একটি লোহার দণ্ড যদি ডুবানো হয় তাহলে দ্রবণ থেকে কপারের

অধঃক্ষেপ ঘটে এবং লোহা দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। এই অধঃক্ষিপ্ত তামা লোহার পাতের উপর একটি আস্তরণ ফেলে। অনুরূপভাবে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে যদি একটি জিংকের দণ্ড ডুবানো হয় তাহলে জিংক দ্রবীভূত হয় এবং সিলভার অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধঃক্ষিপ্ত সিলভার জিংকদণ্ডের উপর প্রলেপ বা আস্তরণ সৃষ্টি করে। যেমন—$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu \downarrow$; $Zn + 2AgNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2Ag \downarrow$ । কিন্তু যদি ফেরাস সালফেট দ্রবণে কপার দণ্ড ডুবানো হয় অথবা জিংক নাইট্রেট দ্রবণে সিলভার পাত ডুবানো হয় তাহলে কোন বিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়না। এর মূল কারণ হলো প্রশম ধাতব পরমাণু ইলেকট্রন বর্জন করে আয়নে রূপান্তরিত হলে পজিটিভ আয়ন গঠন করে। ধাতুমাত্রেই আয়নরূপে ক্যাটায়ন বা পজিটিভ আয়নে রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায়ঃ $M - ne \rightarrow M^{n}$, $Na - e \rightarrow Na^{+}$; $Zn - 2e \rightarrow Zn^{+2}$ । তাই ধাতু মাত্রেই পজিটিভ তড়িৎ ধর্মী যদিও সমস্ত ধাতুর পজিটিভ আয়ন গঠন করার ক্ষমতা সমান নয়।

তড়িৎ রাসায়নিক সার ঃ (Electro-Chemical Series) ঃ বিভিন্ন ধাতুর তড়িৎ ধর্মের অর্থাৎ পজিটিভ আয়ন গঠনের ক্ষমতার ক্রমমাত্রা অনুযায়ী উচ্চতম পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী ধাতু হতে নিম্নতম পজিটিভ তড়িৎ ধর্মী ধাতু সমূহ উপরে নীচে পর পর সাজালে ধাতু সমূহের যে সারি বা শ্রেণী গঠিত হয় তাকে ধাতুর তড়িৎ রাসায়নিক সারি বা শ্রেণী (Electrochemical or Electromotive series) বলা হয়। যথা ঃ

লঘু ধাতু	K : পটাসিয়াম
	Ba : বেরিয়াম
	Ca : ক্যালসিয়াম
	Na : সোডিয়াম
	Mg : ম্যাগনেসিয়াম
ভারী ধাতু ও হাইড্রোজেন	Al : অ্যালুমিনিয়াম
	Mn : ম্যাঙ্গানিজ
	Zn : জিংক
	Fe : আয়রণ
	Sn : টিন
	Pb : লেড
	H : হাইড্রোজেন
সম্ভ্রান্ত ধাতু (noble metal)	Cu : কপার
	Hg : মার্কারী
	Ag : সিলভার
	Au : গোল্ড
	Pt : প্লাটিনাম

উপর থেকে নীচের দিকে ক্রমশঃ ধাতুর আয়ন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

উপর থেকে নীচের দিকে ধাতুর অক্সাইডকে সহজে বিজারিত করা যায়।

তড়িৎ রাসায়নিক সারি ও ধাতুর রাসায়নিক ধর্ম ঃ তড়িৎ রাসায়নিক তালিকায় ধাতুর স্থান নির্ণয় করে সাধারণভাবে বিভিন্ন ধাতুর রাসায়নিক ধর্ম নির্দেশ করা যায়। সারির উচ্চতম স্থানের ধাতুগুলি বিশেষ সক্রিয় এবং নিম্নতম স্থানের ধাতুগুলির সক্রিয়তা খুব কম।

ধাতুর সক্রিয়তা (Chemical reactivity) সারির উপর হতে নীচের দিকে অবস্থিত ধাতুর ক্ষেত্রে ক্রমশঃ হ্রাস পায়। ধাতুর উপরে বায়ু, জল, অ্যাসিড ইত্যাদির বিক্রিয়ার ক্ষমতা বা রাসায়নিক সক্রিয়তাও উপর হতে নীচের দিকে ক্রমশঃ হ্রাস পায়। বস্তুতঃ সারির সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত পটাসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি ক্ষারীয় ধাতুগুলি সবচেয়ে সক্রিয় এবং সারির সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থিত সোনা, রুপা, প্লাটিনাম ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত ধাতু (noble metal)-গুলি সবচেয়ে নিষ্ক্রিয়।

ধাতুর উপর বায়ুর বিক্রিয়া ও যৌগগুলির ধাতুতে বিজারণ ঃ তড়িৎ রাসায়নিক সারির উচ্চতম স্থানে অবস্থিত এই হালকা ও তীব্র ইলেকট্রোপজিটিভ ধাতুগুলি বায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক তাপে বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিশেষ ধরনের স্থায়ী অক্সাইড গঠন করতে পারে। বায়ুতে দ্রুত বিক্রিয়ার ফলে এগুলির উপর অক্সাইডের একটি আস্তরণ পড়ে বলে শুষ্ক বায়ুতে বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলির বিক্রিয়া সুরু হওয়ার পরই বন্ধ হয়ে যায়। তাই এদের পূর্ণ বিক্রিয়ার জন্য আর্দ্রবায়ুর বিশেষ প্রয়োজন। যেমন $4Na + O_2 = 2Na_2O$; $2Ca + O_2 = 2CaO$; লঘুধাতুর অক্সাইড জলের সঙ্গে দ্রবণীয় হাইড্রক্সাইড গঠন করতে পারে এবং ইহাদের হাইড্রক্সাইড তীব্র ক্ষারধর্মী (alkaline) ঃ $K_2O + H_2O = 2KOH$। অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থানের কম ইলেকট্রো-পজিটিভ ভারী (heavy metals) আয়রণ, টিন, লেড, ইত্যাদি অক্সিজেনের সঙ্গে সহজে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। এদের অক্সাইড গঠনের জন্য উচ্চতাপ প্রয়োজন। সারির নিম্নতম স্থানে সব চেয়ে কম ইলেকট্রোপজিটিভ সম্ভ্রান্ত ধাতু, সিলভার, গোল্ড ও প্লাটিনাম প্রত্যক্ষভাবে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অক্সাইড গঠন করতে পারেনা।

ধাতুর উপর জলের বিক্রিয়া ঃ সারির উচ্চতম স্থানে অবস্থিত এই ক্ষারীয় ধাতুগুলি জলের সঙ্গে তীব্রভাবে বিক্রিয়া ঘটিয়ে দ্রবণীয় হাইড্রক্সাইড বা ক্ষার এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। সারির মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ভারী ধাতুগুলি উচ্চতাপে বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোজেন ও অদ্রবণীয় অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড গঠন করতে পারে। অনেক সময় এই ধরনের অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড ধাতুর উপর আস্তরণ সৃষ্টি করে ধাতব শিল্পবস্তু রক্ষা করে বলে বাষ্পের বিক্রিয়া খুব আস্তে আস্তে ঘটতে দেখা যায়।

$2Al + 6H_2O = 2Al(OH)_3 + 3H_2 \uparrow$; $3Fe + 4H_2O = Fe_3O_4 + 4H_2 \uparrow$। হাইড্রোজেনের নীচে অবস্থিত ভারী ও নিষ্ক্রিয় ধাতুগুলি উচ্চতাপে ও বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম নয়।

ধাতুর উপর অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঃ তড়িৎ-রাসায়নিক সারির হাইড্রোজেনের উপর অবস্থিত সমস্ত ধাতু লঘু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন অপসারণ বা উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু হাইড্রোজেনের নীচে অবস্থিত কপার, সিলভার, গোল্ড ইত্যাদি ধাতু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে না।

অপেক্ষাকৃত কম ক্ষারধর্মী ধাতুগুলি বিস্ফোরণের আকারে অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়। মধ্যম-ভারী ধাতু যেমন অ্যালুমিনিয়াম, জিংক, আয়রণ ইত্যাদি ধাতুর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণ যদি ধাতুর উপর আচ্ছাদক (protective) আবরণ সৃষ্টি না করে তবে এরূপ বিক্রিয়াগুলিও বেশ তীব্রবেগে হতে দেখা যায়। অবশ্য অ্যাসিডের তীব্রতা, ঘনত্ব, বিক্রিয়ার তাপমাত্রা, ধাতুর বিশুদ্ধতা ইত্যাদির উপর ধাতুর উপর অ্যাসিডের বিক্রিয়া নির্ভর করে। মৃদু কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড (CH_3COCH) খুব আস্তে আস্তে ধাতুর উপর বিক্রিয়া ঘটায়। লোহা ও সীসার উপর শীতল ও ঘন অ্যাসিড বিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। কিন্তু উত্তপ্ত অ্যাসিডে বিক্রিয়া ঘটে। বিশুদ্ধ দস্তা সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতে অক্ষম।

ধাতুর দ্বারা প্রতিস্থাপন ঃ তড়িৎ রাসায়নিক সারির ক্রম অনুসারে উচ্চতর স্থানে অবস্থিত ধাতুগুলি নিম্নতর স্থানে অবস্থিত ধাতু হতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী।

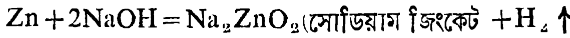
উচ্চতর পজিটিভ তড়িৎ ধর্মী ধাতুগুলির ইলেকট্রন বর্জনের আগ্রহ বা ক্যাটায়ন গঠনের প্রবণতা নিম্নতর পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী ধাতু হতে অধিকতর। তাই তড়িৎ রাসায়নিক সারির ক্রম অনুসারে উচ্চতর স্থানে অবস্থিত অধিকতর পজিটিভ তড়িৎ ধর্মী ধাতু নিম্নতর স্থানের অপেক্ষাকৃত কম পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী ধাতুর লবণ হতে সেই ধাতুকে প্রতিস্থাপিত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু নিম্নতর স্থানের অপেক্ষাকৃত কম পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী ধাতু উচ্চতর স্থানের অধিকতর পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী ধাতুকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না।

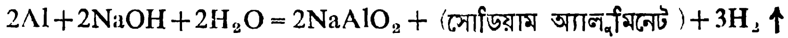
ধাতুর বিজারণ ক্ষমতা ঃ তড়িৎ-রাসায়নিক সারির উচ্চতম স্থানে অবস্থিত ক্ষারীয় ধাতুর প্রবল বিজারন ধর্ম বর্তমান। যদিও নিম্নতম স্থানে অবস্থিত ভারী ধাতুগুলির বিজারণ ক্ষমতা নাই। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম তীব্র বিজারণধর্মী ধাতু কিন্তু কপার বা সিলভারের প্রায় কোন বিজারণ ক্ষমতা নেই। লোহার তুলনায় অ্যালুমিনিয়ামের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বিজারণধর্ম বর্তমান।

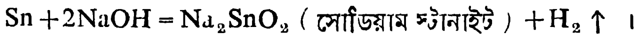
ধাতুর উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঃ হাইড্রোজেন অপেক্ষা উচ্চতর ইলেকট্রোপজিটিভ ধাতুর সাথে অন্যান্য অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় সাধারণতঃ হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। কিন্তু HNO_3 বিক্রিয়া ঘটায় অন্য ভাবে। নাইট্রিক অ্যাসিড সোনা বা প্লাটিনামের উপর কোন বিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। অধিকাংশ ধাতু HNO_3 র সঙ্গে বিক্রিয়ায় নাইট্রেট লবণ, জল ও নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং কোন কোন জায়গায় আবার অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট লবণ তৈরী করে। নাইট্রিক অ্যাসিড একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন

জারক-দ্রব্য। নাইট্রিক অ্যাসিডের জারণক্ষমতার জন্যই এরূপ বিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় ঃ $Cu(\text{তপ্ত}) + 4HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2 \Uparrow$

ধাতুর উপর কস্টিক সোডার বিক্রিয়া ঃ জিংক, অ্যালুমিনিয়াম এবং টিন, সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর উপর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিশেষ কোন ক্রিয়া দেখা যায় না।

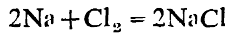

$Zn + 2NaOH = Na_2ZnO_2(\text{সোডিয়াম জিংকেট}) + H_2 \uparrow$

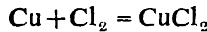

$2Al + 2NaOH + 2H_2O = 2NaAlO_2 + (\text{সোডিয়াম অ্যালুমিনেট}) + 3H_2 \uparrow$

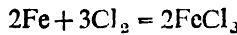

$Sn + 2NaOH = Na_2SnO_2 \ (\text{সোডিয়াম স্টানাইট}) + H_2 \uparrow$ ।

ধাতুর উপর ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঃ ক্লোরিন একটি তীব্র-নেগেটিভ তড়িৎধর্মী অধাতু। ক্লোরিন গ্যাসের মধ্যে স্বাভাবিক পজিটিভ তড়িৎধর্মী সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং উত্তপ্ত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম, জিংক, কপার ও টিন উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে ওঠে এবং ধাতুর ক্লোরাইড গঠন করতে পারে। প্লাটিনাম ধাতু ছাড়া অন্য সব ধাতু ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে ক্লোরাইড গঠনে সক্ষম।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ


$2Na + Cl_2 = 2NaCl$


$Cu + Cl_2 = CuCl_2$


$2Fe + 3Cl_2 = 2FeCl_3$

সালফারের সঙ্গে ধাতুর বিক্রিয়া ঃ সোনা ও প্লাটিনাম ব্যতীত সব ধাতু সালফারের সংস্পর্শে এলে সালফাইড যৌগ গঠন করতে পারে। $Fe + S = FeS$; $Hg + S = HgS$ ।

অকসাইড ও হাইড্রক্সাইড ঃ প্রায় সমস্ত ধাতুই অক্সাইড এবং অনেক ধাতুই হাইড্রক্সাইড যৌগ গঠন করতে পারে। আবার কোন কোন ধাতু একাধিক অকসাইড গঠন করতে পারে যথা ঃ Na_2O, Na_2O_2 ; FeO, $Fe\ O_3$, Fe_3O_4 ; PbO, Pb_2O_3 PbO_2, Pb_3O_4 ; CuO, Cu_2O ইত্যাদি।

দ্রাবক ব্যবহার করে শিল্পবস্তু সংরক্ষণ ঃ ধাতব শিল্পবস্তুর উপরিভাগ অবক্ষয়মুক্ত ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য নানা ধরনের দ্রাবক ব্যবহার করা হয়। অবশ্য বস্তুর উপর অবক্ষয়ের কারণ ও আস্তরণটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ, বস্তুর ভৌত পরীক্ষা ইত্যাদি করার পরই কি ধরনের দ্রাবক ব্যবহার করা দরকার তা নির্ণয় করা হয়। দ্রাবকগুলি বস্তুর উপরিভাগের আস্তরণটিকে নরম করে দেয় এবং অনেক সময় আস্তরণটিকে দ্রবীভূত করতেও পারে। দ্রাবক ব্যবহার করার ফলে যদি আস্তরণটি নরম হয়ে যায় তাহলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগুলি উপরি ভাগ থেকে তুলে পরিষ্কার করা যায়।

রূপা এবং রূপার সংকর-ধাতুর উপরিভাগটি আস্তরণমুক্ত ও অবক্ষয় বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানান ধরনের দ্রাবক ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন ঃ ঘন গরম জলীয় অ্যামোনিয়া দ্রবণ, পটাসিয়াম সায়ানাইড, নাইট্রিক অ্যাসিড (৫%), গরম ফরমিক অ্যাসিড (৩০%), ক্ষারীয় রচেলী সল্ট, সালফিউরিক অ্যাসিড (৫%), সিলভার ডিপ, অ্যামোনিয়াম থায়োসালফেট ও লিসাপল, থায়োইউরিয়া ও লিসাপল, সাইট্রিক অ্যাসিড (৫%), সিলভার নাইট্রেট (২০%), ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও ফেরিক ক্লোরাইডের মিশ্রণ (১০ঃ১), গ্লাসিয়েল অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও ২০ আয়তন হাইড্রোজেন পারকসাইডের মিশ্রণ (৩ঃ১)। তামার শিল্পবস্তুগুলির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দ্রাবক ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন ঃ সালফিউরিক অ্যাসিড (৫-১০% অথবা ১৫-২০%), সাইট্রিক অ্যাসিড (৫%), সোডিয়াম সেসকিউ কার্বনেট (৫%), ফরমিক অ্যাসিড (৩০%), নাইট্রিক অ্যাসিড (১%), ক্ষারীয় রচেলী সল্ট ও পরে সালফিউরিক অ্যাসিড (১০%), সোডিয়াম হেক্সামেটাফসফেট (ক্যালগন) (৫% অথবা ২৫%) প্রয়োজন অনুযায়ী, দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিড, ইত্যাদি।

সীসার শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত দ্রাবকগুলি প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যায়। যেমন ঃ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে তারপর যথাক্রমে অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেট দিয়ে পরিষ্কার করা।

লোহা ও স্টীলের শিল্পবস্তুতে মরিচা নরম ও দ্রবীভূত করে সংরক্ষণ করার কাজে নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি ব্যবহার করা যায়। মরিচা নরম করার জন্য প্যারাফিন তৈল, প্লাস-গ্যাস ফ্লুয়িড-এ, পেট্রোলিয়াম-জেলি, ক্লকঅয়েল এবং ল্যানোলিনের মিশ্রণ, ডিঅকসিডাইন, জেনোলাইট এবং মরিচা দ্রবীভূত করার কাজে অকজালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড (অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করে প্রশমিত করার পর), ডিঅক্সিডাইন, জেনোলাইট ব্যবহার করা যায়।

বিজারণ পদ্ধতি (Reduction Methods) ঃ সাধারণতঃ দুটি পদ্ধতিতে ক্ষয়িষ্ণু, অবক্ষয়যুক্ত ধাতব শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করা যায় ঃ (ক) বিদ্যুৎ রাসায়নিক বিজারণ পদ্ধতি (Electro-chemical Reduction Method এবং (খ) তড়িৎবিশ্লেষ্ট বিজারণ পদ্ধতি (Electrolytic Reduction Method) ঃ

(ক) **বিদ্যুৎ রাসায়নিক-বিজারণ পদ্ধতি ঃ** একটি লোহার পাত্র নিতে হবে এবং তার মধ্যে কিছুটা দস্তার দানা দিতে হবে। এখন কস্টিক সোডার দ্রবণ (১০ শতাংশ অথবা বেশি) প্রয়োজন মত পাত্রটিতে ভরে নিতে হবে। অবক্ষয় মুক্ত করার জন্য ধাতব শিল্পবস্তুটিকে এখন এই দ্রবণে নিমজ্জিত করা দরকার। লোহার পাত্রটিকে এবার বুনসেন বার্নারের উপর রেখে গরম করা দরকার। গরম করার ফলে দ্রবণটির পরিমাণ কমে যাবে তাই মধ্যে মধ্যে পরিশ্রুত জল দ্রবণটিতে যুক্ত করা দরকার। এই ভাবে দ্রবণটি গরম করার সময় একটি ঝাঁঝালো গন্ধ দ্রবণ থেকে নির্গত হতে থাকে। তাপবৃদ্ধি করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ গরম দ্রবণের মধ্যে থাকার ফলে বস্তুর উপরের আস্তরণটি নরম হয়ে যায় এবং যদি

কোন রং বস্তুটিকে আবৃত করে রাখে তাও লুপ্ত হয়। এবার যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বস্তুটিকে দ্রবণ থেকে বার করে নিয়ে এটি প্রবহমান জল স্রোতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এই ধোয়ার ফলে যদি বস্তুর উপর কোন রং লেগে থাকে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটি এমন ভাবে পরিষ্কার করা দরকার যাতে এতে অবশিষ্ট কোন ক্লোরাইড না থাকে কারণ সামান্য পরিমাণ ক্লোরাইড থেকে গেলে তা পরবর্ত্তীকালে আবার বস্তুটিকে আক্রমণ করতে পারে। বস্তুর গুণাগুণ, আস্তরণের রাসায়নিক গঠন, ঘনত্ব ও গর্ভধাতুর পরিমাণ, এগুলি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করার পর তড়িৎ-বিশ্লেষ্য (Electrolyte) হিসাবে কস্টিক সোডা দ্রবণের ঘনত্ব কম না বেশি হবে তা ঠিক করা উচিত। এই ভাবে বিজারিত করার পরও যদি বস্তুটি অবক্ষয় মুক্ত না হয় তাহলে এই পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি করে অবক্ষয় মুক্ত করা যায়।

অনেক সময় তামার বস্তুর উপর কপার অক্সাইডের একটি আস্তরণ পাওয়া যেতে পারে যা পরিষ্কার করা খুব কঠিন ব্যাপার। এটি পরিষ্কার করার জন্য কোন যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া উচিত নয় কারণ এতে বস্তুটির নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য যদি অন্য কোন পদ্ধতিতে এই আস্তরণ মুক্ত করা না যায় তাহলে অভিজ্ঞ মিউজিওলজিস্টের সহায়তায় খুব সাবধানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আস্তরণটি পরিষ্কার করা যায়। অনেক সময় কপার অক্সাইড আস্তরনটি বস্তুর উপর থেকে অপসারিত করার পর নীচে সবুজ রং-এর রাসায়নিক পদার্থ লেগে থাকতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে আবার বিজারিত করে এই সবুজ রং পরিষ্কার করা দরকার।

এই পদ্ধতিতে শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা হলো (১) যদি বস্তুটিতে ধাতব অক্সাইড ছাড়া ও চুন জাতীয় পদার্থ দিয়ে আবৃত থাকে তাহলে কস্টিক সোডার দ্রবণ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য হিসাবে ব্যবহার না করে ১০ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়। (২) যদি বস্তুর কোন একটি বিশেষ অংশে অবক্ষয় মুক্ত করার দরকার হয় তাহলে এই জায়গায় দস্তার পাউডার লাগিয়ে তারপর ৯০ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড ফোঁটা ফোঁটা করে প্রয়োগ করা যায়। (৩) রুপার শিল্পবস্তুতে যদি খুব অল্প পরিমাণ আস্তরণ পাওয়া যায় তাহলে দস্তা ও ফরমিক অ্যাসিড ব্যবহার করে অবক্ষয় মুক্ত ও সংরক্ষণ করা যায়। দস্তার পরিবর্তে অনেক সময় অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা যায়।

(খ) তড়িৎ বিশ্লিষ্ট বিজারণ (Electrolytic reduction) ঃ এই পদ্ধতিতে আস্তরণ যুক্ত ধাতব শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করা সম্ভব। সংরক্ষণ করার জন্য নির্দিষ্ট শিল্প বস্তুকে ঋণাত্মক তড়িৎ-দ্বার (Negative electrode) বা ক্যাথোড (Cathode) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উপযুক্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসাবে কস্টিক সোডার দ্রবণ ও ধনাত্মক-তড়িৎ দ্বার (Positive electrode) বা অ্যানোড (Anode),

হিসাবে দুটি লোহার খণ্ড ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজন মত তড়িৎ-বিশ্লেষ্য দ্রবণ একটি পাত্রে নেওয়ার পর এতে ক্যাথোড (শিল্পবস্তু) ও অ্যানোড লোহার খণ্ড নিমজ্জিত করা দরকার এবং ব্যাটারী থেকে বা সরাসরি প্রয়োজন মত বিদ্যুৎপরিবাহিত করার প্রয়োজন। বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হলে ক্যাথোড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হতে দেখা যায় এবং বস্তুর উপর আবৃত আস্তরণটি আস্তে আস্তে বিজারিত হতে থাকে। বস্তুতে যদি লবণাক্ত কোন বস্তু থাকে তাহলে তা ভেঙ্গে যায়। এই ভাবে যখন শিল্পবস্তু বিজারিত করা হয় তখন ক্লোরাইড লবণ ক্যাথোড থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অ্যানোডে জমা হয়। খুব বেশী ক্ষয়িষ্ণু ও আস্তরণযুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যায়।

তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট বিজারণ পদ্ধতিতে শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলির দরকার, যেমনঃ একটি কাঁচের পাত্র, দুটি লোহার পাত, কয়েকটি পেতলের দণ্ড, তামার তার, তড়িৎ-বিশ্লেষ্য, (৫ শতাংশ) কস্টিক সোডা দ্রবণ), বিদ্যুৎ প্রবাহিত করার জন্য ব্যাটারী অথবা সরাসরি ও বিদ্যুৎ প্রবাহিত করার যথাযথ যান্ত্রিক বন্দোবস্ত, বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রোধ (Resistance) ব্যবহার করা বিশেষ প্রয়োজন।

পদ্ধতি ঃ সাধারণত কাঁচের পাত্রে প্রয়োজন মত কস্টিক সোডার দ্রবণ নিতে হবে। এটি তড়িৎ-বিশ্লেষ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের পরিমাণ নির্ভর করে বস্তুর আয়তনের উপর। কষ্টিক সোডার দ্রবণ ৫ শতাংশ অথবা তার বেশিও হতে পারে। এটি নির্ভর করে তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ-দ্বারের (Electrodes) আয়তনের উপর। অবক্ষয় মুক্ত করার জন্য প্রথমে শিল্পবস্তুটিকে নিয়ে একটি তামার তারে বাঁধিতে হবে এবং তারপর পাত্রের উপর আড়াআড়ি করে রাখা পেতলের দণ্ডের সাথে বেঁধে বস্তুটিকে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করতে হবে। এটি ক্যাথোড বা ঋণাত্মক তড়িৎ দ্বার (Negetive Electrode) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখন ক্যাথোড থেকে দুদিকে সমদূরত্বে দুটি লোহার পাত একই ভাবে তামার তারে বেঁধে নিয়ে পাতের উপর রাখা পেতলের দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে নিমজ্জিত করতে হবে। এগুলি অ্যানোড বা ধনাত্মক তড়িৎ দ্বার (Positive Electrodes) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এবারে নিয়ন্ত্রক (Resistance) এর সাহায্যে প্রয়োজন মত বিদ্যুৎ প্রবাহিত করার দরকার। বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হলে ক্যাথোড থেকে বুদবুদ আকারে গ্যাস নির্গত হতে থাকে। লোহা ও ইস্পাতের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণের অল্প তারতম্য হলে খুব বেশি সমস্যা দেখা যায় না কিন্তু তামা ও রূপার বস্তুর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ অন্ততঃ ২ অ্যামপায়ার প্রতি স্কোয়ার ডেসিমিটারের নীচে যাতে না হয় তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। বিদ্যুৎ প্রবাহ, এর কম হলে অবক্ষয় যুক্ত শিল্পবস্তুর উপর একটি আস্তরণ পড়তে পারে। যথাযথ পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ন্ত্রক ও অ্যামমিটার ব্যবহার করা উচিত।

লোহার খণ্ডগুলি যা অ্যানোড হিসাবে ব্যবহৃত হয় তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট বিজারণ পদ্ধতিতে অবক্ষয় মুক্ত করার সময় সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হতে পারে ফলে গ্রাফাইট অথবা কার্বন দণ্ড লোহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ক্ষারীয় দ্রবণ বা তড়িৎ-বিশ্লেষ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা এর ফলে ভেঙ্গে যেতে পারে এবং বস্তুর উপর একটি প্রলেপ পড়তে পারে।

ক্ষয়িষ্ণু, আস্তরণ যুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কত সময় এবং কি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা দরকার তা নির্ভর করে বস্তুর গর্ভধাতু, আস্তরণের রাসায়নিক ধর্ম, ঘনত্ব ও বস্তুর আয়তনের উপর। অনেক সময় বিজারিত করার সময় বস্তুকে প্রলেপ মুক্ত করার জন্য বাইরে এনে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করার দরকার। এটি বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু থাকা অবস্থাতে, বস্তুকে বাইরে এনে করা উচিত। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করার পর বস্তুটিকে একেবারেই তড়িৎ-বিশ্লেষ্যে নিমজ্জিত রাখা ঠিক নয়, এতে বস্তুর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

সবশেষে মুক্ত বস্তুটিকে প্রবহমান পরিশ্রুত জল স্রোতে ধুয়ে নিয়ে তারপর শুকনো করতে হবে। এখন শুকনো বস্তুটিকে সুরক্ষিত করার জন্য উপরে একটি ল্যাকার প্রলেপ লাগাতে হবে।

যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical Methods) ঃ ধাতব শিল্পবস্তু যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার জন্য নানান ধরনের দ্রাবক অথবা বিজারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু অনেক সময় আবার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সুফল পাওয়ার জন্য কতগুলি যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও বস্তুর উপরিভাগটি অবক্ষয় মুক্ত ও পরিষ্কার করা যায়।

ছুঁচ ও চিজেল দিয়ে বস্তুর উপরিভাগ পরিষ্কার করা ঃ বিশেষ ধরনের ছুঁচ ও চিজেল ব্যবহার করে বস্তুর উপর আস্তরণটি পরিষ্কার করা যায়। এছাড়াও নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলিতে বস্তুর উপরিভাগ পরিষ্কার করা যায়।

তুলে নেওয়া (Picking) ঃ বস্তুর উপরিভাগে মরিচা পরিষ্কার করার জন্য চিমটে ও ছুঁচ ব্যবহার করে মরিচার কণাগুলি আস্তে আস্তে তুলে আনা যায়।

ফালি করা ও চেঁছে ফেলা ঃ ছোট চিজেল ও স্বর্ণকারের ব্যবহৃত হাতুড়ি দিয়ে ধাতব বস্তুর উপর ক্ষতিকারক আস্তরণ পরিষ্কার করা যায়। অবশ্য যদি বস্তুটি পাতলা ও দুর্বল হয় তাহলে চিজেল ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ এতে বস্তুটি ভেঙ্গে যেতে পারে। এছাড়াও বস্তুর উপরিভাগ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চেঁছে বা ছিলে অপবস্তু মুক্ত করা যায়।

চূর্ণন (Grinding) ঃ বস্তুর উপর যখন আস্তরণটি খুব দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে তখন চূর্ণন পদ্ধতিতে আস্তরণটিকে চূর্ণ করে তারপর পরিষ্কার করা যায়। এটি করার জন্য যথেষ্ট যান্ত্রিক বন্দোবস্ত থাকা দরকার।

কেটে আলাদা করা (Cutting) ঃ ধাতব শিল্পবস্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একটির

সাথে আর একটি এমনভাবে লেগে থাকে যা সহজে আলাদা করা যায় না। এই ধরনের শিল্পবস্তু করাত দিয়ে কেটে আলাদা করার দরকার হয়।

ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা ঃ অনেক সময় বস্তুর উপর লেগে থাকা অপবস্তু ও আস্তরণ বিশেষ ধরনের ধাতব ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা যায়।

ধাতব শিল্পবস্তুকে ধুয়ে পরিষ্কার করা ঃ দ্রাবক ব্যবহার করে, বিজারণ পদ্ধতি বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধাতব শিল্পবস্তুকে অবক্ষয় মুক্ত করা যায়। কিন্তু বস্তুর অবক্ষয় মুক্ত করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হোক না কেন, অবক্ষয় মুক্ত করার পর খুব ভালো ভাবে ধুয়ে এটি পরিষ্কার করা উচিত। কারণ অনেক সময় বস্তুর উপর নানা ধরনের ক্লোরাইড লবণ বা অপবস্তুর সামান্যতম অবশিষ্টাংশ থেকে যেতেও পারে এবং এগুলিতে কালক্রমে আবার অবক্ষয় দেখা যেতে পারে। বস্তুটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য প্রবহমান জল স্রোতের নীচে রেখে একটি নরম ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। অনেক সময় বস্তুর উপরিভাগটি অবক্ষয় মুক্ত করার পর রন্ধ্র দেখা যায় এবং এতে ক্লোরাইড লবণ জমা থাকতে পারে। এই ধরনের জমা ক্লোরাইড মুক্ত করার জন্য দীর্ঘ সময় পরিশ্রুত জলের নীচে বস্তুটিকে নিমজ্জিত রাখতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিশ্রুত জল পালটে নতুন জল এতে যোগ করতে হবে। সম্পূর্ণভাবে বস্তুটি ক্লোরাইড মুক্ত হলো কিনা তা সিলভার নাইট্রেট পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে দুর্বল, ভঙ্গুর বস্তুকে অবক্ষয় মুক্ত করার পর ঠিক কি ভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব এজন্য অভিজ্ঞ মিউজিওলজিস্টের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

শুষ্ক করা ঃ ধাতব শিল্পবস্তুকে ধুয়ে পরিষ্কার করার পর সাধারণতঃ দুভাবে শুষ্ক করা যায়—। (১) তাপ দিয়ে, (২) অ্যাসিটোন গাহ ব্যবহার করে।

তাপ প্রয়োগ করে ঃ ধাতব বস্তুকে বিদ্যুৎ চুল্লীর উপর রেখে ১০৫ সেণ্টিগ্রেড তাপ প্রয়োগ করে সম্পূর্ণভাবে শুকনো করা সম্ভব। লোহা, তামা, রুপার ধাতব বস্তুকে এইভাবে শুকনো করে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

তবে রন্ধ্রযুক্ত ধাতব শিল্পবস্তুকে এইভাবে শুকনো করতে প্রচুর সময় লাগে এবং অনেক সময় এর ফলে ধাতববস্তুর গায়ে একটি অক্সাইডের আস্তরণ সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য ব্রাশ করে অক্সাইডের আস্তরণটি পরিষ্কার করা যায়।

(২) **অ্যাসিটোন গাহ ব্যবহার করে ঃ** এ ছাড়াও বস্তুকে শুকনো করার জন্য প্রথমে অ্যাসিটোন গাহতে নিমজ্জিত করে তারপর বার করে নিয়ে ডেসিকেটারের মধ্যে রাখতে হবে। ডেসিকেটারটিকে অবশ্য এজন্য সম্পূর্ণভাবে বায়ুমুক্ত করা দরকার।

বস্তুর সংরক্ষার জন্য প্রলেপ দেওয়া ঃ

শুকনো বস্তুটিকে এবারে সংরক্ষিত করার জন্য এর উপর নানা ধরনের বস্তুর একটি পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়। যে বস্তুগুলি ধাতব শিল্পবস্তুর উপর প্রলেপ

দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলো—এ্যারকালিন, ফ্রাজিলিন, পলীভিনাইল অ্যাসিটেট, পলিমেথা-ক্রাইলেট, প্যারাফিন, মোম, বিটুম্যাসটিক-পেস্ট, ল্যানোলিনমিশ্রণ, ভেসিলিন, পেট্রোলিয়াম জেলি ইত্যাদি।

সব ধরনের ধাতব শিল্পবস্তুকে সালফার গ্যাস ও ধুলো বালি মুক্ত পরিষ্কার, পরিমিত আর্দ্র ও তাপযুক্ত কক্ষে সংরক্ষণ করা উচিত।

লোহা ও ইস্পাত

ব্রোঞ্জ আবিষ্কারের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। খৃষ্টপূর্ব আট শতাব্দীতে লোহা খুবই মূল্যবান ধাতু হিসাবে পরিচিত ছিল। গ্রীসের কবি হোমারের সময় পর্যন্ত লোহা ও সোনার মূল্য সমান ছিল। অনেকে মনে করেন লোহা ভারতবর্ষে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন এশিয়া মাইনরের মেসোপটোমিয়াতে প্রথম লোহা নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। রোমান সাম্রাজ্য কালে ভারতীয় লোহা ইউরোপে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ইস্পাত তৈরী করার পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। পরবর্ত্তীকালে জার্মানীতে "মারুত চুল্লী" ব্যবহার করে লোহা তৈরীর পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়। ইস্পাত নির্মাণের বর্ত্তমান 'বেসেমার পদ্ধতি' মাত্র ১৮৫২ খৃীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে হেনরী বেসেমার কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ল্যাটিন শব্দ ফেরাম (Ferrum) শব্দ থেকে লোহার প্রতীক Fe নেওয়া হয়েছে।

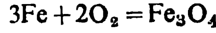
লোহার প্র কৃতিক যৌগ ঃ লোহার প্রাকৃতিক যৌগ হিসাবে অকসাইড—হেমাটাইট Fe_2O_3 এবং চৌম্বক অক্সাইড বা ম্যাগনেটাইট Fe_3O_4, হাইড্রেটেড বা সোদক অক্সাইড —লিমোলাইট $3Fe_2O_3$, $3H_2O$; কার্বনেট—স্পাথিক লৌহ আকরিক বা সিডারাইট $FeCO_3$, সালফাইড—আয়রন পিরাইটিস FeS_2, কপার পিরাইটিস $CuFeS_2$ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লোহা বিশেষ কোন কাজে লাগেনা। সদ্য প্রস্তুত লোহার মধ্যে অল্প পরিমাণ কার্বন ও অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত থাকে। লোহার মধ্যে কার্বন ও অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ অনুসারে লোহাকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—ঢালাই লোহা (cast or pig iron), পেটা লোহা (wrought iron), ইস্পাত (steel)।

লোহার প্রতীক Fe (ফেরাম), ইলেকট্রন বিন্যাস [Ar] $4s^2 3d^6$, অপরাধর্মিত ১.৮, গলনাংক ১৫৩৫° সেণ্টিগ্রেড, ঘনত্ব ৭.৮৬ গ্রাম / ঘনসেমি, পারমাণবিক সংখ্যা ২৬, পারমাণবিক ওজন ৫৫.৮৫, জারণ সংখ্যা +২, +৩; স্ফুটনাংক ২৭৩০° সেণ্টিগ্রেড, বর্ণ শ্বেত-ধূসর, কঠিন ধাতু, ভূপৃষ্ঠে ৫% পাওয়া যায়।

ভৌত ধর্ম—বিশুদ্ধ লোহা দেখতে সাদা, নমনীয় ও প্রসারণশীল এবং তন্তুর (fibrous) আকারে গঠিত। এতে চুম্বকধর্ম বর্তমান।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ বিশুদ্ধ বায়ু লোহার উপর বিক্রিয়াহীন। আর্দ্র বায়ুতে লোহার উপর মরিচা (rust) পড়ে। অগ্নিতপ্ত লোহা অক্সিজেনের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দগ্ধ হয় এবং ফেরাসফেরিক অক্সাইড বা ম্যাগনেটিক অক্সাইড (Fe_3O_4) গঠন করে।



$$3Fe + 2O_2 = Fe_3O_4$$

লোহা সনাক্তকরণ ঃ (ক) সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে লোহার যে কোন যৌগ মিশ্রিত করে অঙ্গার পিণ্ডের গর্তে রেখে ফুৎ-নলের সাহায্যে বুনসেন দীপের বিজারণ শিখায় উত্তপ্ত করলে এক রকম বাদামী কালো আস্তরণ পাওয়া যায়। এটি চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয়।

(খ) ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ($K_4[Fe(CN)_6]$) দ্রবণ মিশ্রিত করলে ঘন নীল বর্ণের (প্রুশিয়ান ব্লু) অধঃক্ষেপ পড়ে। কিন্তু ফেরাস ক্লোরাইডে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ($K_3[Fe(CN)_6]$) মিশ্রিত করলে ঘন নীল অধঃক্ষেপ পড়তে দেখা যায়।

(গ) ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণে অ্যামোনিয়া থায়োসায়ানেট (NH_4CNS) যৌগ মিশ্রিত করলে গাঢ় লাল বর্ণের দ্রবণ পাওয়া যায়। কিন্তু ফেরাস দ্রবণে এইরকম লাল বর্ণের দ্রবণ পাওয়া যায় না।

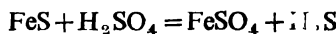
সংগ্রহশালায় নানা ধরনের লোহা ও ইস্পাতের তৈরী শিল্পবস্তু আমরা দেখতে পাই যেমন, যুদ্ধের পোষাক, আসবাবপত্র, চেয়ার টেবিল, থালা, বাটি, নানা আকারের লোহার পাত্র, শিকার ও যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র, মূর্ত্তি, বিজয় স্তম্ভ, খেলনা ইত্যাদি। এই শিল্প নিদর্শন গুলিতে প্রায়ই মরিচা পড়তে দেখা যায়। মরিচা পড়া থেকে যদি শিল্পবস্তুগুলি রক্ষা না করা যায় তাহলে কালক্রমে এগুলি নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য।

মরিচা পড়ার কারণ ঃ জল ও দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে সাধারণতঃ লোহার উপর মরিচা পড়ে। মরিচা খুব সম্ভবতঃ স্বল্প পরিমাণ ফেরাস কার্বনেট সহ আর্দ্র ফেরিক অক্সাইড ($2Fe_2O_3$, $3H_2O$ + অল্প $FeCO_3$)।

মরিচা পড়ার জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন জল ও অক্সিজেন, কিন্তু যদি শুধু অক্সিজেন সম্পৃক্ত পাতিত জলে লোহার শিল্প-বস্তু ডুবিয়ে রাখা হয় তাহলে মরিচা পড়ে না। মরিচা পড়ার জন্য জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড বা লবণের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং বলা যায় মরিচা পড়ার জন্য (i) জল (ii) অকসিজেন, (iii) জলে দ্রবীভূত কার্বনেট $(Co)_3^{2-}$ আয়ন বা ক্লোরাইড (Cl^-) আয়নের উপস্থিতি প্রয়োজন। বস্তুর বিশুদ্ধতার উপরেও মরিচা পড়া অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই শিল্পনিদর্শন গুলিতে যদি অন্য কোন ধাতু মিশ্রিত থাকে এবং জলে অ্যাসিডমূলক বর্তমান থাকে তাহলে দ্রুত মরিচা পড়ে।

এ ছাড়াও যখন লোহার শিল্পবস্তু দীর্ঘদিন মাটির নীচে বায়ুশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে এবং যদি এই জায়গায় সালফেট যুক্ত মৃত্তিকা বর্তমান থাকে তাহলে কিছু

অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া এর উপর মরচে পড়ার কাজ করতে সাহায্য করে। অবায়ু-জীবী ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ দুভাবে এই কাজটি করে ঃ (১) প্রথমে এটি সালফেটকে বিজারিত করে সালফাইডে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয় এবং এই সালফাইড লোহার বস্তুকে আক্রমণ করে। (২) বস্তুর উপরিভাগে যদি হাইড্রোজেন যুক্ত কোন যৌগের আস্তরণ থাকে তাহলে তা ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়, ফলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবক্ষয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে। যদি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অবক্ষয় প্রক্রিয়া চালু থাকে তাহলে শিল্পবস্তুর উপর একটি কালো আস্তরণ পড়তে পারে। এটি আয়রণ সালফাইডের আস্তরণ। বস্তুতে যদি এই ধরনের আস্তরণ পাওযা যায়, তাহলে দেখা যায় মাটির যে অংশে এটি ছিল সেই জায়গার বস্তুসংশ্লিষ্ট মৃত্তিকাও কালো রং-এ রূপান্তরিত হয়েছে। একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারা এই আস্তরণের গঠন সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। যদি অল্প পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড এই আস্তরণের উপর কোন অংশে প্রয়োগ করা যায় তাহলে পচা ডিমের গন্ধ নির্গত হতে থাকে। এটি আসলে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস।



$$FeS + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2S$$

সালফেট বিজারক ব্যাকটিরিয়া যেমন—ভাইব্রিও ডিসালফিউরিক্যানস (**Vibrio desulphuricans**) ব্যাকটিরিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও অনেকগুলি প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায় যারা সালফেট বিজারণ প্রক্রিয়ার সাহায্য করে যেমন—গালিওনেলা ফেরিজিনিয়া (Gallionella ferriginea)। লোহার বস্তুর উপর একটি আস্তরণ তৈরী করার কাজে এটি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

সংরক্ষণ ঃ

প্রাথমিক পরীক্ষা ঃ সংরক্ষণাগারে লোহার বা ইস্পাতের কোন বস্তু সংরক্ষণ করার যদি দরকার হয তাহলে প্রথমে বস্তুটির অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া দরকার। যেমন বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা, মরিচা পড়া বস্তু হলে মরিচার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও গঠন ইত্যাদি। যদি মরিচায় ক্লোরাইড লবণ না থাকে তাহলে একে শুষ্ক মরিচা (dry rust) বলা যায় এবং এর ফলে বস্তুর খুব বেশি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। আবার যদি সম্পূর্ণ লোহাটি মরিচায় রূপান্তরিত হয়ে যায় এমন কি সামান্যতম গর্ভধাতু (core metal) যদি না পাওয়া যায় তাহলে এই অবস্থায়ও বস্তুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কিন্তু যদি বস্তুটিতে অবক্ষয় (corrosion) প্রক্রিয়া চালু থাকে তাহলে এটি ক্লোরাইড মুক্ত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাই বস্তুতে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলছে কিনা তা প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে।

বস্তুর উপরিভাগটি যদি ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে বস্তুটিতে মরিচা পড়া শুরু হয়েছে কিনা বোঝা যায়। ক্ষয়িষ্ণু অংশের রং ও গঠন এবং অক্ষয়িষ্ণু অংশের রং ও গঠনে তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু শুধু রং ও গঠনের পরিবর্ত্তন দেখেই রাসায়ণিক প্রক্রিয়া চালু আছে কিনা তা বোঝা সম্ভব নয়।

যদি বস্তুর উপরিভাগটি সিক্ত হয় তাহলে অবক্ষয় প্রক্রিয়া চালু আছে ধরে নেওয়া যায়, কারণ যদি লোহার সংস্পর্শে ক্লোরাইড লবণ আসে তাহলে অবক্ষয় শুরু হতে পারে এবং এর থেকে বাদামী রং-এর একটি যৌগ উৎপন্ন হয়। এই যৌগটি জলাকর্ষী তাই বস্তুর উপরিভাগটি সিক্ত থাকে।

যথাযথভাবে সংরক্ষিত করার জন্য বস্তুর উপরিভাগের মত আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। আভ্যন্তরীণ অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একস-রেডিওগ্রাফি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। যেখানে সম্ভব নয় সেই সব ক্ষেত্রে চুম্বক দিয়ে কতখানি গর্ভধাতু (core metal) আছে তা নির্ণয় করা যায়। এছাড়া সূচ দিয়ে বস্তুর উপরিভাগে গর্ত করে অবক্ষয়ের পরিমাণ এবং গর্ভধাতুর পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়। এটি করার সময় লেন্সের সাহায্য নেওয়া উচিত।

সংরক্ষণ করার পদ্ধতি ঃ

যদি বস্তুতে কোন অবক্ষয় বা মরিচা পড়ার চিহ্ন দেখা না যায় তাহলে বস্তুর উপরিভাগটি পরিষ্কার করার পর উপরে মোম বা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু যদি বস্তুটিতে অল্প পরিমাণ মরিচার আক্রমণ দেখা যায় তাহলে কারবোরানডাম পাউডার বা সূক্ষ্ম এমারি-পাউডার দিয়ে উপরিভাগটি ঘষে মরিচামুক্ত করার পর মাম, পেট্রোলিয়াম জেলি বা ল্যানোলিন মিশ্রণ লাগিয়ে এটি সুরক্ষিত করা সম্ভব।

যদি মরিচা ধরা ক্ষয়িষ্ণু লোহার বা ইস্পাতের বস্তু পাওয়া যায় তাহলে প্রথমে দেখা দরকার অবক্ষয় প্রক্রিয়া চালু আছে কিনা। যদি অবক্ষয় প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তাহলে বস্তুর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে কিনা তা দেখতে হবে। যদি এর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অবিকৃত থাকে তাহলে বিশেষ কোন চিকিৎসার দরকার নেই কিন্তু যদি আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বিকৃতি দেখা যায় তাহলে মরিচা পড়ার প্রকৃতি কিরূপ তা দেখা দরকার। যদি বস্তুর উপর প্রভূত পরিমাণে মরিচা পড়ে এবং মরিচা যদি রন্ধ্রবহুল হয় তাহলে মরিচা নরম করার জন্য প্যারাফিন অয়েল, প্লাস-গ্যাস-ফ্লুইড 'এ' ইত্যাদি ব্যবহার করে মরিচা নরম করে তারপর স্টীল-উল (steel wool) ব্যবহার করে বস্তুটিকে মরিচা মুক্ত করা যায়। আবার যদি খুব সুদৃঢ়ভাবে মরিচার কণাগুলি একটির সাথে আর একটি লেগে থাকে তাহলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মরিচাগুলি তুলে পরিষ্কার করা যায় অথবা এই অবস্থায় যদি বস্তুটির উপর মোম, পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে রেখে দেওয়া যায় তাতেও এর বিশেষ কোন ক্ষতি লক্ষ্য করা যায় না। অনেকগুলি বস্তু যদি একসাথে জড়িয়ে যায় তাহলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগুলি আলাদা করা উচিত।

যদি অল্প পরিমাণ মরিচার দ্বারা বস্তুটি আবৃত থাকে তাহলে মরিচা নরম করার জন্য এর উপর প্যারাফিন অয়েল লাগানো দরকার তারপর একটি শক্ত ব্রাশ দিয়ে ঘষে

মরিচা মুক্ত করা যায়। মরিচা পড়ার জন্য যদি কোন সূক্ষ্ম কারুকার্য চাপা পড়ে যায় তাহলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অথবা এমারি পাউডার দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে মরিচা মুক্ত ও সূক্ষ্ম কারুকার্য সংরক্ষণ করা যায়।

যদি বস্তুর উপর আস্তরণটি অস্থায়ী (unstable) হয় এবং অবক্ষয় প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে তাহলে প্রথমে দেখা দরকার অবক্ষয়িত অংশটি পুরোপুরি বিস্তার লাভ করেছে, না বস্তুর কিছু অংশে অবস্থান করছে। বস্তুর কিছু অংশ যদি আক্রান্ত হয় এবং বস্তুটি যদি পাতলা ও দুর্বল হয় তাহলে প্রথমে মরিচা নরম করার জন্য প্যারাফিন অয়েল লাগাতে হবে। মরিচা নরম হয়ে যাওয়ার পর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এগুলি পরিষ্কার করা দরকার তারপর এর উপর মোম, পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভেস্‌লিন লাগিয়ে দিতে হবে। বস্তুটি যদি ভারী, বড় ও সুদৃঢ় হয় তাহলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বস্তুটিকে মরিচা মুক্ত ও পরিষ্কার করা যায়। এর পর বিজারণ পদ্ধতিতে বস্তুটিকে পরিষ্কার করার পর পরিশ্রুত জলে বস্তুটিকে ধুয়ে যদি কোন ক্লোরাইড লবণের অবশিষ্টাংশ কিছু লেগে থাকে তা মুক্ত করা দরকার। ইস্পাতের উপর অনেক সময় কোন কোন অংশে মরিচা পড়তে দেখা যায়। প্রথমে মরিচা নরম করার জন্য ডিঅক্সিডাইন বা জেনোলাইট ইত্যাদি লাগিয়ে তারপর সূক্ষ্ম এমারি পাউডার দিয়ে ঘষে এটি পরিষ্কার করা যায়। একটি ব্রাশ দিয়ে ঘষে সম্পূর্ণ ভাবে বস্তুটি মরিচা মুক্ত ও সংরক্ষিত করা যায়।

বস্তুটির উপর যদি অবক্ষয় প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে তাহলে এতে গর্ভধাতু (core metal) কতখানি আছে তা দেখা দরকার। যদি এতে কোন গর্ভধাতু না থাকে তাহলে এতে ল্যাকার লাগিয়ে দিলেই চলবে। যদি বস্তুতে যথেষ্ট পরিমাণ গর্ভধাতু থাকে তাহলে বিজারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বস্তুটিকে সংরক্ষিত করা যায়। এই পদ্ধতি প্রযুক্ত হলে বস্তুটিকে পরিশ্রুত জলে ধুয়ে সম্পূর্ণভাবে ক্লোরাইড মুক্ত করা দরকার।

সংরক্ষণ করার জন্য কতকগুলি পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা :

বিজারণ পদ্ধতি : মরিচা পড়া লোহার শিল্পবস্তুতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে অবিচ্ছিন্ন গর্ভধাতু থাকে তাহলে বিজারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। যদি বস্তুর উপরিভাগটি গহ্বরযুক্ত না হয় তাহলে একে তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট বিজারণ (Electrolytic reduction) পদ্ধতিতে অবক্ষয় মুক্ত ও সংরক্ষণ করা যায়। মরিচা পড়া অংশে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যায় না।

বস্তুটিতে যদি প্রচুর পরিমাণে গহ্বর থাকে তাহলে বিদ্যুৎ-রাসায়নিক বিজারণ পদ্ধতিতে অবক্ষয় মুক্ত ও সংরক্ষণ করা যায়। দস্তা ও কষ্টিক সোডা ব্যবহার করলে অনেক সময় বস্তুর গভীরতম অংশে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বস্তুটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। সব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বস্তুটির উপরিভাগ সম্ভবমত পরিষ্কার করার পরই তড়িৎ-বিশ্লেষণ (Electrolysis) করা উচিত।

বিজারণ পদ্ধতিতে লোহা অবক্ষয় মুক্ত ও সংরক্ষণ করতে হলে একে পরিশ্রুত জল দিয়ে ধুয়ে লবণ মুক্ত ও শুষ্ক করতে হবে।

কস্টিক সোডার ব্যবহার ঃ লোহার বস্তুটি যদি দুর্বল ও ভঙ্গুর হয় এবং অবক্ষয় প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে তাহলে তড়িৎবিশ্লিষ্ট বিজারণ পদ্ধতিতে অবক্ষয় মুক্ত করা সম্ভব নয়। এই সব ক্ষেত্রে লঘু কস্টিক সোডা দ্রবণে নিমজ্জিত করে দ্রবণটি ফোটাতে হবে এবং প্রয়োজন মত দ্রবণটি বার বার পরিবর্ত্তন করতে হবে। বস্তুটি পরিষ্কার হওয়ার পর তুলে এনে খুব ভালো করে পরিশ্রুত গরম জলে বার বার ধোয়া দরকার। এরপর বস্তুটিকে যথাযথ পদ্ধতিতে শুষ্ক করার পর ল্যাকার লাগিয়ে রাখতে হবে।

তাপ প্রয়োগ ঃ অনেক সময় মরিচা পড়া বস্তুগুলি এক সাথে লেগে থাকতে দেখা যায়। এগুলি আলাদা করার জন্য ব্লো-ল্যাম্প দিয়ে তাপ প্রয়োগ করা হয়। তাপ প্রয়োগ যথেষ্ট সাবধানতার সাথে করা উচিত, না হলে বস্তুটি বা বস্তুগুলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। বস্তুর উপরিভাগে নানা জায়গায় বুদবুদের মত ফেরিক ক্লোরাইডের আস্তরণ ফুলে থাকতে দেখা যেতে পারে। ফেরিক ক্লোরাইড বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প ও লবণ (salt) শোষণ করতে পারে। খুব সিক্ত অবস্থায় এই ধররেন বস্তুর উপর তাপ প্রয়োগ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার স্তর গঠিত হতে পারে। একে 'ফ্লেকিং' বলা হয়। ফ্লেকিং হওয়ার পর বস্তুতে যদি কোন কার্বনেট যৌগ বর্তমান থাকে তাহলে সেটি আলাদা হয়ে যেতে পারে কিন্তু এর গায়ে মৃত্তিকা জাতীয় কোন পদার্থ লেগে থাকলে তা অতি দৃঢ়ভাবে আটকে যায়। দ্রাবক ব্যবহার করেও এটি পরিষ্কার করা কঠিন ব্যাপার। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তাপ প্রয়োগ করে বস্তুকে আলাদা করা উচিত নয়।

মরিচা নিরোধক ও নরম করার জন্য দ্রাবকের ব্যবহার ঃ যদি লোহা বা ইস্পাতের শিল্পবস্তুর উপরিভাগে বিক্ষিপ্তভাবে মরিচা পড়তে দেখা যায় তাহলে এইগুলি নরম করার জন্য প্যারাফিন অয়েল ব্যবহার করা দরকার। প্যারাফিন অয়েল লাগানোর কিছুক্ষণ পর মরিচা পড়া অংশগুলি স্বাভাবিক ভাবে নরম হয়ে যাবে এবং এমারি-কাগজ ব্যবহার করে এটি মরিচা মুক্ত করা যায়। মরিচা মুক্ত জায়গাটি থেকে এরপর লেগে থাকা অবশিষ্ট প্যারাফিন তেল গরম কাপড় দিয়ে মুছে তারপর লুব্রিকেটিং অয়েল লাগিয়ে দিতে হবে। 'প্লাস-গ্যাস-ফ্লুইড-এ' খুব ভালোভাবে মরিচা নরম করার কাজে সাহায্য করে। যদি এই সব ক্ষেত্রে মরিচা লাগা জায়গাগুলি পরিষ্কার না হয় তাহলে এই অংশগুলি আস্তে আস্তে গহ্বরে পরিণত হতে পারে। তাই সংগ্রহশালায় শিকার ও যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি সংরক্ষণ করার সময় যাতে কোন ভাবে মরিচার দ্বারা আক্রান্ত না হয় তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। অবশ্য যে সব অঞ্চল লবণ (salt) মুক্ত এবং পরিবেশে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৫০ শতাংশ অথবা তারও কম সেই সব অঞ্চলে কোন লোহার বস্তুতে মরিচা পড়লে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু এইসব জায়গায় বাতাস হঠাৎ ঘনীভূত হয়ে ঠাণ্ডা ধাতুর উপর জমতে পারে বিশেষত যখন তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যায়। শহর ও শহরাঞ্চলে এই

ঘনীভূত জলীয় বাষ্পে সালফার ডাই-অকসাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে যা মরিচা পড়তে সাহায্য করে। এই সব ক্ষেত্রে বস্তুর উপর যদি মোমের প্রলেপ দেওয়া যায় তাহলে বস্তুটি সুরক্ষিত হতে পারে।

কিছু কিছু বিজারণ প্রক্রিয়ায় যেখানে বস্তুকে মরিচা ও অবক্ষয় মুক্ত করা সম্ভব নয় সেইসব ক্ষেত্রে মরিচা নিরোধক ও নরম করার করার জন্য দ্রাবক ব্যবহার করা যায়। এই দ্রাবকগুলি কিছু কিছুক্ষেত্রে বস্তুর উপর মরিচা নিরোধক আস্তরণ তৈরী করতে সাহায্য করে। মরিচা নরম করার জন্য কোন দ্রাবক ব্রাশ দিয়ে বস্তুর উপর লাগানো যায় এবং কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পরিষ্কার গরম কাপড় দিয়ে মুছে বস্তুটিকে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

মরিচা নিরোধক যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহাব করা হয় সেগুলি প্রায়ই ফসফোরিক অ্যাসিড সঞ্জাত (derivatives)। এটি বস্তুর উপর একটি নিষ্ক্রিয় (inert) আস্তরণ সৃষ্টি করে।

কস্টিক সোডা মরিচা নিরোধক ঃ কিন্তু কস্টিক সোডা ব্যবহার করার পর বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করা দরকার যাতে ক্লোরাইডের অবশিষ্টাংশ থেকে না যায়।

মরিচা পরিষ্কার করার জন্য ৯ শতাংশ অকজ্যালিক অ্যাসিড দ্রবণ ব্যবহার করা যায়। এছাড়া সাইট্রিক অ্যাসিড (অ্যামোনিয়ার সাথে মিশিয়ে), ডি-অকসিডাইন, জেনোলাইট, ভারসিনেস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

মরিচা মুক্ত, অবক্ষয় মুক্ত পরিষ্কার বস্তু সুরক্ষার জন্য এর উপর পাতলা প্রলেপ এমনভাবে দেওয়া দরকার যাতে বস্তুর মূল সত্তা ও বৈশিষ্ট্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য অবিকৃত থাকে।

প্রলেপ দেওয়ার জন্য যে রাসায়নিক বস্তুগুলি ব্যবহার করা হয়, তা হলো—মোম ল্যাকার, নানান ধরনের তেল, পেট্রোলিয়াম জেলি, ভেসলিন, প্যারাফিন মোম, ডিপ (Paraffin wax dip), মাইক্রোক্রিস্টালাইন ওয়াক্স পালিস্ ইত্যাদি।

মরিচা সংরক্ষণ (Preservatiou of Rust) ঃ যখন কোন লোহার বস্তু সম্পূর্ণ আয়রন অক্সাইডে রূপান্তরিত হয় এবং আর কোন অবশিষ্ট গর্ভধাতু থাকে না তখন বস্তুটি স্থায়িত্ব লাভ করে। এই ধরনের বস্তুর বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। অবশ্য বস্তুতে বর্তমান লবণের স্ফটিকীকরণের ফলে এটি দুর্বল এমনকি ভঙ্গুর হয়। এই অবস্থায় বস্তুটিতে নাইট্রোসেলুলোজ, কৃত্রিম রেজিন জাতীয় পদার্থ লাগিয়ে সুদৃঢ় (consolidate) করে নিতে হবে। এর পর এর উপর কাগজের মণ্ড লাগিয়ে লবণ মুক্ত করা দরকার। এছাড়াও যেখানে মরিচা পরিষ্কার করার ফলে বস্তুটি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে মরিচা সংরক্ষণ করতে হবে। অনেক সময় ফেরিক অকসাইডে বস্তুতে সৃষ্ট গহ্বরগুলিতে জমা হয়। যদি এই ফেরিক অকসাইড পরিষ্কার করা হয় তাহলে বস্তুর মূল সত্তা ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তাই এগুলি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় রেখে বস্তুটির সংরক্ষণ করতে হবে। লবণ মুক্ত করে বস্তুর উপর মরিচা নিরোধক প্রলেপ লাগাতে হবে।

পুনর্গঠন কার্য (Reconstruction works) ঃ লোহার শিল্পবস্তুগুলি অনেক সময় টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া যায়। খণ্ডিত বস্তুগুলিকে পুনর্গঠিত করা দরকার। পুনর্গঠিত করার জন্য সাধারণতঃ ডুরোফিক্স ব্যবহার করা হয়। প্রথমে টুকরোগুলিকে একত্রিত করতে হবে তারপর এগুলিকে একটি বালির বাক্সের উপর যথাযথভাবে মিলিয়ে নিতে হবে। এখন ডুরোফিক্স ব্যবহার করে একটি খণ্ডকে আর একটি খণ্ডের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে।

এছাড়াও রাং ঝালাই করে খণ্ডিত বস্তুগুলিকে জোড়া দেওয়া যায়। রাং হিসাবে যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে Tinman's Solder Grade K বলা হয়। এটি দুই ভাগ সীসা (lead) ও তিনভাগ টিন মিশ্রিত করে তৈরী করা যায় এবং এর গলনাংক (melting point) লোহার চাইতে কম। রাং ঝালাই করার পূর্বে জোড়া দেওয়া জায়গাটি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত, না হলে ঝালাইতে অসুবিধা হতে পারে।

সীসা

বহু প্রাচীন কাল থেকে সীসার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরে ১২০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের প্রাচীন কবরে সীসার পাত্র পাওয়া গেছে। আয়ুর্বেদে 'সীসক' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এর রাসায়নিক নাম 'প্লামবাম' (Plumbum) এবং প্রতীক চিহ্ন Pb।

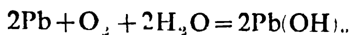
সীসার প্রধান আকরিক সমূহ ঃ সীসার প্রধান আকরিক গ্যালেনা বা লেড সালফাইড। এছাড়াও অন্যান্য আকরিকে সীসা পাওয়া যায়। সীসার প্রধান আকরিক ঃ সালফাইড—গ্যালেনা, PbS ; সালফেট—অ্যাংলিসাইট, $PbSO_4$; লেনারকাইট $PbSO_4$, PbO ; পাইরোমরফাইট, $3Pb_3(PO_4)_2$, $PbCl_2$; কার্বনেট—সেরুসাইট, $PbCO_3$; ক্লোরাইড—ম্যাটলোকাইট, $PbCl_2$, PbO, ক্রোমেট—ক্রোকোইসাইট, $PbCrO_4$।

সীসার ইলেকট্রন বিন্যাস [Xe] $4f^{14}$, $5s^2$, $5p^6$; অপরাধর্মিতা ১.৮ ; পারমাণবিক সংখ্যা—৮২ ; পারমাণবিক গুরুত্ব ২০৭ ; ঘনত্ব ১১.৩৫ গ্রাম/মিলি লিটার ; জারণ সংখ্যা +২, +৪ ; গলনাংক ৩২৭°C ; ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্তি .০০০১৬% ; প্রকৃতি নীলাভ বাদামী কঠিন ধাতু।

ভৌত ধর্ম ঃ সীসা একটি নীলাভ ধূসর ধাতু। সদা ব্যবহৃত বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে এটি সবচেয়ে ভারী। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১১.৪ এবং গলনাংক ৩২৭° সেন্টিগ্রেড। ইহা বিশেষভাবে সম্প্রসারণশীল ধাতু। এর স্ফুটনাংক ১৬২০°C।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ সীসার উপর অনার্দ্র বায়ুর কোন প্রভাব নেই। আর্দ্র বায়ু এর গায়ে লেড অকসাইড এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষারীয় লেড কার্বনেট তৈরী করে। তপ্ত বায়ুতে দহনের ফলে লেড প্রথমে লিথার্জ (PbO) নামক অকসাইড এবং পরে 'রেডলেড নামের উচ্চতর অকসাইডে (Pb_3O_4) পরিণত হয়।

জলের ক্রিয়া ঃ বায়ুমুক্ত জলের সঙ্গে সীসার কোন বিক্রিয়া দেখা যায় না কিন্তু জলে বায়ু (অক্সিজেন) দ্রবীভূত থাকলে জলের সঙ্গে সীসার বিক্রিয়ার ফলে লেড হাইড্রক্সাইড গঠিত হয়। এটি জলে অল্প দ্রবণীয়।



$$2Pb + O_2 + 2H_2O = 2Pb(OH)_2$$

অ্যাসিডের ক্রিয়া ঃ লঘু HCl বা H_2SO_4 লেডের উপর কোন ক্রিয়া করে না। কিন্তু ঘন ও তপ্ত H_2SO_4 সীসার উপরে বিক্রিয়া ঘটিয়ে সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। ঘন ও তপ্ত HCl ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। লঘু বা ঘন HNO_3 সীসার উপর দ্রুত বিক্রিয়া ঘটায়।

ক্ষারের ক্রিয়া ঃ তপ্ত কস্টিক সোডার সঙ্গে সীসার বিক্রিয়া মন্থর গতিতে হয় এবং সোডিয়াম প্লামবাইট যৌগ উৎপন্ন করে।

ক্লোরিন ও সালফারের বিক্রিয়া ঃ ক্লোরিন ও সালফার উত্তপ্ত সীসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে লেডক্লোরাইড ($PbCl_2$) ও লেড সালফাইড (PbS) গঠন করে।

দস্তার দ্বারা প্রতিস্থাপন ঃ সীসার যৌগের দ্রবণের মধ্যে যদি দস্তার দণ্ড ঝুলিয়ে রাখা হয় তাহলে দস্তার গায়ে কেলাসের আকারে সীসা জমে যায়। সীসার এইরূপ আকৃতিকে 'সীসার গাছ' (lead tree) বলা হয়।

সীসা সনাক্তকরণ ঃ (ক) সীসার যে কোন যৌগ সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে মিশ্রিত করে অঙ্গার পিণ্ডের গর্তে রেখে ফুৎ-নলের সাহায্যে প্রদীপ্ত বিজারণ শিখা উত্তপ্ত করলে সীসার দানা নিষ্কাশিত হয় এবং এর দ্বারা কাগজে দাগ দেওয় সম্ভব।

(খ) সীসার যে কোন দ্রবণীয় লবণে HCl যুক্ত করলে সাদা সাদা লেড ক্লোরাইডের সূচাকৃতি কেলাসের অধঃক্ষেপ পড়তে দেখা যায়। এই লেড ক্লোরাইড ($PbCl_2$) গরম জলে দ্রবণীয়, ঠান্ডা জলে অদ্রবণীয়।

গ) সীসার লবণের দ্রবণের সংগে পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ মিশ্রিত করলে লেড আয়োডাইডের (PbI_2) হলুদ অধঃক্ষেপ পড়ে। ইহা গরম জলে দ্রবীভূত হয় কিন্তু শীতল করলে স্বর্ণাভ চকচকে অধঃক্ষেপ পড়তে দেখা যায়। সীসার লবণের দ্রবণ পটাসিয়াম ক্রোমেটের সঙ্গে মিশ্রিত করলে হলুদ বর্ণের লেড ক্রোমেটের ($PbCrO_4$) অধঃক্ষেপ ফেলতে পারে।

সংগ্রহশালায় সীসার নানা ধরনের শিল্প-বস্তু দেখা যায়। প্রায়শঃই এই বস্তুগুলির উপর একটি পাতলা আস্তরণ পড়তে দেখা যায়। অদূষিত মুক্ত বায়ুতে এটি বাড়তে থাকে। এটি ধাতব বস্তুটিকে রক্ষা করে। দূষিত বাতাসে সীসার বস্তুটির উপর

অক্সাইডের একটি আস্তরণ পড়তে দেখা যায় এবং এটি বস্তুর ক্ষতিসাধন করে। যখন বস্তুতে ক্ষারীয় লেড কার্বনেট তৈরী হতে থাকে তখন বস্তুটির দ্যুতি এবং আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। এই অবস্থায় যদি অবক্ষয় নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব না হয় তাহলে বস্তুর সামগ্রিক ক্ষতি হতে পারে। যদি মাটির নীচ থেকে কোন সীসার বস্তু সংগৃহীত হয় তাহলে এর উপর একটি সাদা আস্তরণ দেখা যায়। এটি সীসার যৌগের সঙ্গে লবণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে তৈরী হয়। অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য এই আস্তরণ সৃষ্টি হতে পারে। তাই শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করার সময় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা দরকার—(১) অবক্ষয় নিয়ন্ত্রিত করা এবং (২) বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা।

সীসার বস্তুর উপর যদি কোন আস্তরণ না দেখা যায় তাহলে বস্তুটি সুরক্ষার জন্য প্যারাফিন ওয়াক্স্ ডিপ. অথবা প্লাসটিকের বস্তুতে সিক্ত করে সংরক্ষণ করা যায়।

যদি বস্তুর উপর আস্তরণ থাকে এবং এটি ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে বস্তুর উপরের আস্তরণটি স্থায়ী না অস্থায়ী তা পরীক্ষা করা দরকার। যদি বস্তুর দ্যুতি ও উপরিভাগের অবস্থা সন্তোষজনক হয় তাহলে বিশেষভাবে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই বস্তুটিকে সংরক্ষণ কর যায়। কিন্তু যদি বস্তুটি খুব বেশি পরিমাণে আস্তরণযুক্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহলে উপরিভাগটি পরিষ্কার করার পর এটি সুরক্ষিত করার জন্য প্লাসটিক পদার্থ দিয়ে নিষিক্ত করতে হবে।

বস্তুর উপরিভাগের আস্তরণটি যদি অস্থায়ী হয় তাহলে তিনটি জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার : (১) খুব বেশি আস্তরণযুক্ত কিনা, (২) অল্প পরিমাণ আস্তরণ যুক্ত কিনা এবং (৩) অবক্ষয় বিক্রিয়া চালু আছে কিনা। খুব বেশি আস্তরণযুক্ত হলে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়। কস্টিক সোডা দ্রবণে তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অথবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করা যায়। পরিষ্কার ও সংরক্ষণের পদ্ধতি যাই হোক না কেন বস্তুটি পরিষ্কার করার পর এর উপর প্যারাফিন ওয়াক্স্-এর প্রলেপ দিতে হবে।

যদি অল্প আস্তরণ অথবা বিক্ষিপ্তভাবে অবক্ষয়ের চিহ্ন বস্তুর উপর দেখা যায় তাহলে বিজারণ পদ্ধতিতে এটি পরিষ্কার করা উচিত। দস্তা ও কস্টিক সোডা এই বিজারণ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়। কস্টিক সোডার ব্যবহার খুব সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে।

অবক্ষয় বিক্রিয়া সক্রিয় আছে এই অবস্থায় যদি কোন সীসার শিল্পবস্তু পাওয়া যায় তাহলে দেখতে হবে এতে অবশিষ্ট কোন গর্ভধাতু আছে কিনা। যদি একেবারেই কোন গর্ভধাতু না থাকে তাহলে বস্তুটিকে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় কিন্তু যদি কিছুটা গর্ভধাতু থাকে তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বস্তুটিকে সংরক্ষণ করা যায় : (১) বিজারণ পদ্ধতিতে—(ক) ভালোভাবে পরিশ্রুত গরম জলে ধুয়ে, (খ) যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ; অথবা (২) বিজারণ পদ্ধতি (জিংক ও কস্টিক সোডা ব্যবহার করে) (ক) যান্ত্রিক

পদ্ধতি প্রয়োগ করে, (খ) ধুয়ে পরিষ্কার করে ও সর্বশেষে (গ) বস্তুটিকে প্লাসটিক দ্রবণে নিষিক্ত করে।

সংরক্ষণ করার কতকগুলি পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা ঃ

বিজারণ পদ্ধতি ঃ বিজারণ পদ্ধতিতে সীসা অবক্ষয়মুক্ত ও সংরক্ষণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে যদি কস্টিক সোডা ব্যবহার করা হয় তাহলে এটি সম্পূর্ণভাবে কস্টিক সোডা মুক্ত করা দরকার।

কস্টিক সোডা মুক্ত করার পদ্ধতি ঃ ঠাণ্ডা জলে যদি বস্তুটিকে ধোয়া যায় তাহলে এটি সম্পূর্ণভাবে কস্টিক সোডা মুক্ত নাও হতে পারে। তাই যথাযথ পদ্ধতিতে ধুয়ে কস্টিক সোডা মুক্ত হলো কিনা তা সূচক (indicator) ব্যবহার করে সুনিশ্চিত করতে হবে। থাইমলফ্যালিন (Thymolph-lein) এবং **ফেনলপথ্যালিন** সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পর্য্যায় ক্রমে দুটি ভাগে এটি করা যায় ঃ

প্রথমে প্রবহমান গরম জলের নীচে বস্তুটিকে রাখতে হবে যাতে বেশির ভাগ ক্ষার ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে এবং এর সঙ্গে জলে এক ফোঁটা করে থাইমলফ্যালিন দিয়ে যেতে হবে। এইভাবে **থাইমলফ্যালিন** দিতে দিতে জলের রংটি যখন নীল রং-এ রূপান্তরিত হবে তখন ধরে নেওয়া যায় যে ধোয়ার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। এরপর বস্তুটিকে গরম পরিশ্রুত জল গাহে রাখতে হবে এবং পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করতে করতে এমন এক সময় আসবে যখন **ফেনলপথ্যালিন** জলে মিশ্রিত করলে জলের রং ফ্যাকাশে (হাল্কা) লাল রং-এ রূপান্তরিত হবে। এরপর বস্তুটিকে সাবধানে গরম জল থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে শুকনো করতে হবে এবং ৯৫ শতাংশ অ্যালকোহল গাহে আবার নিমজ্জিত করতে হবে। কিছুক্ষণ পর এটি অ্যালকোহল গাহ থেকে বার করে নিয়ে শুকনো করতে হবে তারপর মোমের প্রলেপ দিয়ে ১০০°C তাপমাত্রার উপরে কয়েক মিনিট রাখতে হবে। কারণ যদি কোন জলীয় বাষ্প এতে থেকে যায় তাহলে ১০০°C তাপমাত্রায় রাখার ফলে এটি সম্পূর্ণভাবে জলীয় বাষ্প মুক্ত হতে পারে। মোমের গাহে নিমজ্জিত করলে এটি গাহ থেকে বার করার পর একটি ব্লটিং কাগজের উপর রাখা দরকার কারণ যদি অবশিষ্ট কোন মোম লেগে থাকে তা বেরিয়ে যেতে পারে। এরপর শুকনো করে নিয়ে বস্তুটিকে রাখতে হবে।

সীসার বস্তুতে অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করা ঃ সীসার উপর অনেক সময় সাদা আস্তরণ পড়ে। এটি লেড কার্বনেটের আস্তরণ। লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করে লেড কার্বনেট পরিষ্কার করা যায়। এবং যদি বস্তুর উপর অ্যাসিডের কোন অবশিষ্টাংশ থেকে যায় তা ক্ষার ব্যবহার করে প্রশমিত করা যায়। কিন্তু এইভাবে সীসার শিল্পবস্তুকে পরিষ্কার করার কয়েক বছর পর বস্তুর উপর একটি সাদা আস্তরণ পড়তে দেখা গেছে—তাই এই পদ্ধতিতে বস্তু পরিষ্কার বা সংরক্ষণ করা ঠিক নয়। অ্যাসেটিক অ্যাসিড ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে আস্তরণ মুক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ অ্যাসেটিক অ্যাসিডের বাষ্পের সংস্পর্শে সীসার খুব তাড়াতাড়ি অবক্ষয় ঘটতে দেখা যায়।

ক্যালে (Caley) এই ধরনের শিল্পবস্তু পরিষ্কার করার জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট ব্যবহার করেছেন। পদ্ধতিটি এইরকম ঃ—

লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণ ঃ ১০১ মিলি লিটার ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এক লিটার পরিশ্রুত জলে মিশ্রিত করে দ্রবণটি তৈরী করা দরকার।

অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ : ১০০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট এক লিটার পরিশ্রুত জলে মিশ্রিত করে দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে।

এছাড়াও পরিশ্রুত জল ব্যবহার করার পূর্বে ভালো ভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে যাতে কোন দ্রবীভূত গ্যাসের অবশিষ্টাংশ জলে না থেকে যায়। এর পর এটি বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গাহ ঃ বস্তুটিকে আয়তনের অন্ততঃ ৫০ গুণ বেশি পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গাহে প্রয়োজন মত ১-২ ঘণ্টা অথবা ১ রাত্রি ভিজিয়ে রাখতে হবে। যখন বুদবুদ ওঠা বন্ধ হবে তখন অ্যাসিড বার করে দিয়ে বস্তুর আয়তনের ১০০ গুণ বেশি গরম পরিশ্রুত জলে এটি কয়েক মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরিষ্কার করা দরকার।

অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট গাহ ঃ এরপর বস্তুটিকে এর আয়তনের অন্ততঃ ২৫ গুণ পরিমাণ গরম অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণে ভিজিয়ে দিতে হবে। ১ থেকে ২ ঘণ্টা এটি এই দ্রবণে নিমজ্জিত করে রাখা যায়। তবে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কোন অবস্থায় ২ ঘণ্টার বেশি এতে নিমজ্জিত করে রাখা উচিত নয়। এরপর বস্তুর আয়তনে ১০০ গুণ পরিমাণ ঠাণ্ডা এবং গরম ও পরিষ্কার পরিশ্রুত জল দিয়ে যথাক্রমে ধুয়ে নিতে হবে।

শুষ্ক কর ঃ কোন তাপ প্রয়োগ না করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অথবা অ্যালকোহল ব্যবহার করে শুকনো করা যায়।

মোমের প্রলেপ দেওয়া ঃ তরল প্যারাফিন যুক্ত মোমে ১০০ C তাপমাত্রায় কয়েক মিনিট বস্তুটিকে নিমজ্জিত করে রাখা দরকার। তারপর বস্তুটি বার করে নিতে হবে। এভাবে বস্তুর উপর পাতলা এক আস্তরণ পড়বে যা একে সংরক্ষিত করবে। অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট ব্যবহার করার সুবিধা দুটি ; এটি লেড ডাই-অক্সাইডকে দ্রবীভূত করে যা HCl-এ দ্রবীভূত হয়না এবং এটি সীসাকে HCl-এর বিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।

তামা ও ব্রোঞ্জ

তামা (copper) মানব সভ্যতার ইতিহাসে ব্যবহৃত অন্যতম প্রাচীন ধাতু। তামা দিয়েই অতীতে অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা হোত। ব্রোঞ্জ ও পিতল অর্থাৎ তামা ও টিনের মিশ্রণ এবং তামা ও দস্তার মিশ্রণ পরবর্তীকালে নানান

কাজে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। সাইপ্রাস দ্বীপ থেকে সংগ্রহ করা বলে রোমান যুগে তামার নাম দেওয়া হয় 'সাইপ্রিয়াম' বা কিউপ্রাম বা কপার।

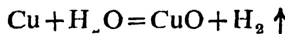
প্রাকৃতিক যোগ ঃ তামা খুব সক্রিয় ধাতু নয় অর্থাৎ তড়িৎ-রাসায়নিক তালিকায় হাইড্রোজেনের নীচে বলে তামা অল্প-পরিমাণে মৌলরূপে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তামার প্রধান ভাণ্ডার তামার আকরিকসমূহ।

অকসাইড—কিউপ্রাইট Cu_2O, সালফাইড—কপার গ্লান্স Cu_2S, কপার পিরাইটিস Cu_2S. Fe_2S_3 বা $CuFeS_2$, কার্বনেট—ম্যালাকাইট $CuCO_3$, $Cu(OH)_2$, অ্যাজুরাইট $2CuCO_3$ $3Cu(OH)_2$, ক্লোরাইড—অ্যাটাকামাইট $CuCl_2$, $3Cu(OH)_2$ প্রতীক, Cu (Cuprum), ইলেকট্রন বিন্যাস [Ar] $3d^{10}4s^1$; পারমাণবিক সংখ্যা ২৯, পারমাণবিক গুরুত্ব—৬৩.৬৭, অপরাধর্মিতা—১.৯, ঘনত্ব ৮.৯২ গ্রাম মিলিমিটার, গলনাংক—১০৮৩ C, ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্তি ০.০০০১%, জারণ সংখ্যা +১+২, প্রকৃতি—কঠিন, রক্তিম বর্ণ।

ভৌতধর্ম ঃ তামা এক বিশেষ ধরনের লাল বর্ণের ধাতব মৌল পদার্থ। গলিত তামা ধীরে ধীরে শীতল করে যে তামা প্রস্তুত করা হয় তা ভঙ্গুর হয়, কিন্তু দ্রুত শীতল করে যে তামা পাওয়া যায় তা নমনীয় ও প্রসারণশীল হয়। রূপার পরই তামা সর্বোত্তম তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী ধাতু। একে বায়ুশূন্য পরিবেশে বাষ্পে রূপান্তরিত করা যায়। টিন দস্তা অ্যালুমিনিয়াম নিকেল ও অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে তামা ধাতু সংকর গঠন করতে পারে।

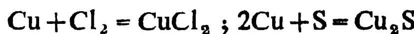
রাসায়নিক ধর্ম ঃ তামার উপরে হাইড্রোজেন সালফাইড-মুক্ত অনাদ্র বায়ুর কোন বিক্রিয়া নেই। শিল্পাঞ্চলে আদ্র বায়ুর সংস্পর্শে এলে তামা প্রথমে কপার অকসাইড বা সালফাইড গঠন করে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষারীয় কপার সালফেটে [$CuSO^4$, $Cu(OH)_2$] পরিণত হয়। বায়ুর সংস্পর্শে শেষ পর্যায়ে তামা কার্বনেট যৌগে পরিণত হয় বলে যে ধারণা ছিল তা ঠিক নয়। অকসিজেনের সঙ্গে উত্তপ্ত তামার বিক্রিয়ায় কিউপ্রিক অক্সাইড তৈরী হয় ঃ

জলের সঙ্গে ক্রিয়া ঃ সাধারণ তাপমাত্রায় তামার সঙ্গে বিশুদ্ধ জলের কোন বিক্রিয়া ঘটেনা। অতিতপ্ত তামা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে অথবা দস্তা-তামা-যুগ্ম জলে স্বল্প বিক্রিয়া ঘটে এবং অক্সাইড গঠন করে ও হাইড্রোজেন বিমুক্ত করে ঃ



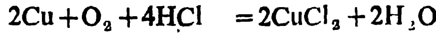
$$Cu + H_2O = CuO + H_2 \uparrow$$

ক্লোরিন ও সালফার বাষ্পের ক্রিয়া ঃ উত্তপ্ত তামার পাউডার ক্লোরিন গ্যাস ও বাষ্পীয় সালফারের মধ্যে প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলে উঠে এবং কিউপ্রিক ক্লোরাইড ও কিউপ্রিক সালফাইড গঠন করে।

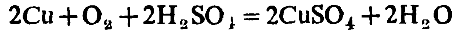


$$Cu + Cl_2 = CuCl_2 \; ; \; 2Cu + S = Cu_2S$$

অ্যাসিডের ক্রিয়া ঃ ধাতুর তড়িৎ রাসায়নিক সারিতে তামা হাইড্রোজেনের নীচে ; তাই লঘু ও শীতল অ্যাসিড হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে না। তামার সংগে HCl ও H_2SO_4 বায়ুর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া ঘটায়।



$$2Cu + O_2 + 4HCl = 2CuCl_2 + 2H_2O$$



$$2Cu + O_2 + 2H_2SO_4 = 2CuSO_4 + 2H_2O$$

ঘন, লঘু শীতল বা তপ্ত—সমস্ত HNO_3 তামার সংগে বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। এই বিক্রিয়ার ফলে কপার নাইট্রেট ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

তামার সনাক্তকরণ ঃ (ক) সোডিয়াম কার্বনেটের সংগে তামার কোন যৌগ মিশ্রিত করে অঙ্গার পিণ্ডের গর্তের মধ্যে রেখে ফুৎ-নলের সাহায্যে বুনসেন দীপের বিজারক প্রদীপ্ত শিখায় উত্তপ্ত করলে অঙ্গার-পিণ্ডের উপর কিউপ্রাস অকসাইডের (Cu_2O) লাল আস্তরণ পড়ে। এই লাল আস্তরণে কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত করলে বাদামী নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয় এবং নীল রং-এর দ্রবণ পাওয়া যায়।

(খ) HCl সিক্ত প্লাটিনাম-তারের মুখে লাগিয়ে যে কোন কপার যৌগ বুনসেন দীপের অদীপ্ত-শিখায় ধরলে নীলাভ সবুজ শিখা সৃষ্টি হয় এবং প্লাটিনাম তারটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

(গ) কপার সালফেট দ্রবণে অল্প অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ঢাললে নীলাভ সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশ্রিত করলে অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং দ্রবণ ঘন নীল বর্ণে রূপান্তরিত হয়।

সংগ্রহশালায় তামা এবং এর থেকে উৎপন্ন সংকর ধাতু বিশেষতঃ ব্রোঞ্জের নানান ধরনের শিল্পবস্তু দেখা যায়। ধাতব তামার শিল্পবস্তুগুলি অনেকখানি রূপালী মত দেখতে হয় এবং এগুলি খুবই স্পর্শকাতর হয়। সালফারের সংস্পর্শে এলেই তামার উপর কপার সালফাইডর আস্তরণ পড়তে দেখা যায়। খাঁটি তামা যদি আর্দ্র বা যথেষ্ট জলীয় বাষ্প যুক্ত কোন জায়গায় থাকে তাহলে জারিত (oxidised) হয়।

তামার শিল্পবস্তুর যখন দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা নষ্ট ও মলিন (tarnish) হয়ে যায় তখন এই অবস্থায় এর গায়ে পাতলা অক্সাইডের আস্তরণ পড়ে। সময়ের সাথে সাথে অক্সাইডের আস্তরণটির বেধ খুব বেশি বৃদ্ধি পায়না। এই আস্তরণটি শিল্পবস্তুকে রক্ষা করে। এই সময় অল্প জারণ বিক্রিয়া ঘটতে পারে কিন্তু এর ফলে বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য কোনভাবে নষ্ট হয় না। কিন্তু যদি ধাতুটিতে টিন, দস্তা অথবা অন্য কোন ধাতু মিশ্রিত থাকে এবং এই মিশ্রণটি যদি ত্রুটিপূর্ণ বা আনুপাতিক হারে না হয় তাহলে জারিত অংশগুলিতে কালো কালো দাগ দেখা যায়। এর ফলে বস্তুর মৌলিক সত্তা ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতে বাধ্য। যদি সময় মত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে বস্তুর ধাতব দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। অল্প ধাতব পালিশ (metal polish) দিয়ে পালিশ করলে ধাতুর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ৫-১০ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে তারপর কিছু সময় পর বার করে নিয়ে নরম কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বস্তুর উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই যথেষ্ট সাবধানতার

সঙ্গে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। বস্তুর উপর ল্যাকার প্রলেপ দিয়ে এটি রক্ষা করতে হবে।

কোন স্যাঁত স্যাঁতে বা আর্দ্র জায়গায় অথবা মাটির নীচে তামার শিল্পবস্তু দীর্ঘদিন থাকলে বস্তুর ধাতব দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। এই সব ক্ষেত্রে বস্তুর উপর অক্সাইডের একটি আস্তরণ পড়ে এবং যত দিন বাড়তে থাকে ততই এর বেধ বাড়তে থাকে। আস্তরণটির কিউপ্রাস অক্সাইড ঘনীভূত হওয়ায় ঈষৎ নীল-বেগুনী বর্ণের কিউপ্রাইটে রূপান্তরিত হয়। এটি আবার ক্ষারীয় কার্বনেট দিয়ে আবৃত হলে দেখতে সবুজ রং এর হয় অথবা অনেক সময় নীলও হতে পারে যা ম্যালা-কাইট বা অ্যাজুরাইট খনিজ পদার্থের মত দেখতে। তামার উপর এই ধরনের ক্লোরাইড মুক্ত আস্তরণ স্থায়ী হতে পারে। এই আস্তরণটি ধাতব বস্তুটিকে সংরক্ষণ ও সুরক্ষিত করে। অবশ্য সব সবুজ আস্তরণ যে স্থায়ী হবে তার কোন মানে নেই এবং এটি স্থায়ী না অস্থায়ী তা বাইরের থেকে বোঝা শক্ত। তবে বস্তুর উপর একটি সুসঙ্গত (coherent) আস্তরণ স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদি আস্তরণটি যথেষ্ট বেধ যুক্ত ও সচ্ছিদ্র (porous) হয়, এটি স্বাভাবিকভাবে বায়ু থেকে বাষ্প ও দ্রবণীয় লবণ শোষণ করতে পারে এবং এতে একাধিক মৌলিক ধাতুর উপস্থিতি দেখা যায় তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে আস্তরণটির গঠন ও আকৃতি খুবই জটিল। এটি লবণাক্ত হতে পারে ও লবণ ধরে রাখতে পারে।

রূপার শিল্পবস্তু যদি লবণাক্ত জায়গা থেকে উৎখনন করে পাওয়া যায় তাহলে এর উপর একটি অদ্রবণীয় আস্তরণ পাওয়া যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এটি সিলভার ক্লোরাইড। যদি তামা এবং তামার সংকর ধাতুর উপর এই ধরনের আস্তরণ পাওয়া যায় তাহলে এটি সংরক্ষণ করা বেশ কঠিন ও জটিল ব্যাপার। এর মূল কারণ অস্থায়ী কিউপ্রাস ক্লোরাইড বস্তুকে ক্ষয়িষ্ণু করে দেয় এবং এর উপস্থিতিতে অবক্ষয় বিক্রিয়া সক্রিয় থাকে। তামার শিল্পবস্তু ও তামার সংকর ধাতুর উপরিভাগে যখন দাগ পড়তে দেখা যায় এবং বস্তুর উপর গুঁড়ো গুঁড়ো পাউডারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তখন একে 'ব্রোঞ্জ ডিসিজ' (Bronze disease) বলা হয়। 'ব্রোঞ্জ ডিসিজ' তামার শিল্পবস্তু বা তামার সংকর ধাতু উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে।

সময় যত বাড়তে থাকে এই ক্ষত দাগগুলি ব্যাপকভাবে বস্তুর উপর বিস্তার লাভ করে কারণ কিউপ্রাস ক্লোরাইড অক্সিজেনের সহায়তায় কিউপ্রিক ক্লোরাইডে রূপান্তরিত হয়। এই বিক্রিয়াটি খুবই ত্বরান্বিত হতে পারে যদি বস্তুটি আর্দ্র পরিবেশে থাকে। তাই আর্দ্র অবস্থায় বস্তুর অবক্ষয় খুব তাড়াতাড়ি হতে দেখা যায়। কিন্তু খুব আর্দ্র পরিবেশেও বস্তুটি যদি ক্লোরাইড মুক্ত থাকে তাহলে 'ব্রোঞ্জ ডিসিজ'-এ আক্রান্ত হতে দেখা যায় না। আসলে জলীয় বাষ্প রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সহায়তা ও ত্বরান্বিত করতে পারে।

তামার বস্তু সংরক্ষণ করার জন্য বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে ক্লোরাইড মুক্ত করতে

হবে। এটি ক্লোরাইড মুক্ত করতে গেলে প্রধানত দুটি অসুবিধা দেখা যায়, যেমন—কিউপ্রাস ক্লোরাইডকে শুধু জলে ধুয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব নয় কারণ জলে এটি দ্রবীভূত হয় না। এছাড়াও এটি বস্তুর উপর খুব ঘন ও দৃঢ় ভাবে ও আস্তরণের নীচে আটকে থাকে। তাই প্রথমে অদ্রবণীয় ক্লোরাইড যৌগটিকে দ্রবণীয় লবণে রূপান্তরিত করতে হবে ও পরে ধুয়ে তা পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু কিউপ্রাস ক্লোরাইড বা ন্যানটোকাইট যা উপরিভাগে থাকেনা তা অপসারিত করা খুবই কঠিন ও জটিল ব্যাপার।

বিদ্যুত-রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বস্তুটি অবক্ষয় মুক্ত করা যায় কিন্তু সব বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। বিজারণ পদ্ধতি কেবল সেই ধরনের শিল্পবস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় যেখানে বস্তুতে যথেষ্ট পরিমাণ গর্ভধাতু পাওয়া যায় এবং যাতে এর যথেষ্ট পরিমাণ ধকল সহ্য করার ক্ষমতা থাকে।

যেখানে একেবারেই কোন গর্ভধাতু থাকে না সেইসব জায়গায় অবক্ষয় বন্ধ করার জন্য বিশেষ ধরনের দ্রাবক ব্যবহার করা যায়। তড়িৎ-রাসায়নিক বা তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট বিজারণ পদ্ধতিতে সব ক্ষয়িষ্ণু বস্তুর সুরক্ষা সম্ভব নয়। খুব সুন্দর মসৃণ সুসঙ্গত আবরণ (patina) যদি বস্তুতে থাকে প্রথমে সেটি সুরক্ষিত করে তারপর যাতে অবক্ষয় বন্ধ করা যায় তা দেখতে হবে। কারণ এটি শিল্পবস্তুকে সুরক্ষিত করে এবং বিজারণপদ্ধতি প্রয়োগ করলে এই আবরণটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বস্তুটি যদি শুষ্ক জায়গায় থাকে তাহলে বস্তুর উপর ক্লোরাইডের বিক্রিয়া সবচেয়ে কম হয়। বস্তুর উপর যখন প্রথম 'ব্রোঞ্জ ডিসিজ' ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক সেই সময় যদি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে বস্তুটিকে পরিষ্কার, অবক্ষয় মুক্ত এবং সংরক্ষণ করা যায়।

সংরক্ষণ ও অবক্ষয় মুক্ত করার সময় শিল্পবস্তুগুলির নিম্নলিখিত অবস্থা সমূহ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হবেঃ (ক) বস্তুর উপর দাগ পড়তে দেখলেই প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করতে হবে; (খ) তারপর দূষণমুক্ত শুষ্ক পরিবেশে এটি রাখতে হবে।

যে সব ক্ষেত্রে বস্তুর উপর আবরণ (patina) রক্ষা করা দরকার সেই ধরনের বস্তুকে বিশেষ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করার পরও অনেক সময় বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে ক্লোরাইড মুক্ত করা যায়না। এবং এর ফলে বস্তুর স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হতে পারে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। তবে খুব অল্প সময়ে এবং রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করলেই শুধু এই ধরনের বস্তুর সংরক্ষণ সম্ভব নয়, এর জন্য মিউজিওলজিস্টের মতামত নিতে হবে।

সংরক্ষণঃ তামা ও তামার সংকর ধাতুর শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা যায়ঃ

যদি বস্তুর উপর বিশেষ কোন অবক্ষয়ের চিহ্ন পাওয়া না যায় এবং কোন আস্তরণ দ্বারা আবৃত না থাকে এবং উজ্জ্বল হয় তাহলে বিশেষ কোন চিকিৎসার দরকার নাই। তবে এর উপরিভাগে এ্যারক্যালিন (Ercaline), পলিভিনাইল অ্যাসিটেট, পলিমেথাক্রাইলেট অথবা বেডাক্রাইড ১২২X জাতীয় কোন ল্যাকারের প্রলেপ দিয়ে রাখলে বস্তুটি সুরক্ষিত হয়।

অনেক সময় এই ধরনের বস্তু জারিত হওয়ার ফলে যথেষ্ট মলিন, বিবর্ণ ও দ্যুতি-হীন (tarnish) হয়ে যায়! এর ফলে বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের বস্তুর দ্যুতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। ধাতু পালিশ (metal polish) দিয়ে পালিশ করলেও মলিনতা মুক্ত হয় এবং স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে পেতে পারে। যদি এতেও কাজ না হয় তাহলে ১ শতাংশ নাইট্রিক অ্যাসিড বস্তুর উপর ফোঁটা ফোঁটা দিলে উপরিভাগটি পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। ক্ষারীয় রচেলী সল্ট দিয়ে তারপর ১০ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা যায়। এছাড়াও ক্ষারীয় রচেলী লবণের সাথে যদি ১০ শতাংশ হাইড্রোজেন পারক্সাইড মিশ্রিত করে ব্যবহার হয় করা তাতেও সুফল পাওয়া যায়। এরপর বস্তুটিকে ক্লোরাইড মুক্ত করার জন্য পরিশ্রুত জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে লিসাপল গাহে ডুবিয়ে নরম ব্রাশ দিয়ে এটি পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

যদি বস্তুটির উপর অবক্ষয়ের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং এটি আস্তরণ যুক্ত হয় তাহলে আস্তরণটি স্থায়ী (stable) না অস্থায়ী (unstable তা পরীক্ষা করতে হবে। যদি আস্তরণটি অস্থায়ী হয় তাহলে অবক্ষয় প্রক্রিয়া সক্রিয় আছে কিনা তা দেখতে হবে। স্থায়ী আস্তরণ এবং অবক্ষয় প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করার জন্য প্রথমে দুটি জিনিষ দেখা দরকার; যথা, বস্তুর বাহ্যিক আকৃতি ও দ্যুতি সন্তোষজনক কিনা—যদি বাহ্যিক আকৃতি ও দ্যুতি সন্তোষজনক না হয় তাহলে বস্তুটির উপর যে আবরণ আছে তা কি পরিমাণে বস্তুটিকে আবৃত করেছে তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সামান্য পরিমাণ আস্তরণ বস্তুর উপর থাকলে অনেক সময় এর উল্লেখযোগ্য অংশগুলি পরিদৃশ্যমান হয় কিন্তু ভালোভাবে সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলি বোঝা যায় না। এই ধরনের শিল্প-বস্তু সংরক্ষণ করার জন্য, এর আস্তরণটি দ্রবীভূত করতে প্রথমে ক্ষারীয় রচেলী সল্ট এবং তারপর ১০ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড অথবা ক্ষারীয় রচেলী সল্ট ১০ শতাংশ ২০ শতাংশ হাইড্রোজেন পারক্সাইড মিশ্রিত দ্রবণ ব্যবহার করে পরিষ্কার করা যায়। যদি এই দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করার পরও আস্তরণটি পরিষ্কার করা সম্ভব না হয় তাহলে ৫ শতাংশ সোডিয়াম হেক্সামেটা-ফসফেট (calgon) দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। যে কোন রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরিষ্কার করা হোক না কেন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার অব্যবহিত পরই বস্তুটিকে পরিশ্রুত জলে ধুয়ে ক্লোরাইড মুক্ত করতে হবে। তারপর এটি শুকনো করে ল্যাকারের প্রলেপ দিতে হবে।

যদি পাতলা আস্তরণটি বস্তুটিকে এমনভাবে আবত করে রাখে যে তারু উপর

সূক্ষ্ম কারুকার্য বা খোদাই করা অংশ বোঝা সম্ভবপর নয় তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বস্তুটিকে পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করা সম্ভব।

প্রথমে দ্রাবক যেমন ক্ষারীয় রচেলী সল্ট এবং তারপর ১০ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) দিয়ে আস্তরণটি পরিষ্কার করা যায়। এছাড়াও কস্টিক সোডা ব্যবহার করে তড়িৎ বিশ্লেষণ (elcctrolysis) পদ্ধতিতেও আস্তরণটি পরিষ্কার করা যায়। তবে আগের মতই ক্লোরাইড লবণ মুক্ত করার জন্য বস্তুটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। শুকনো করার পর বালি স্প্রে grit spray) পদ্ধতিতে বস্তুর উপরিভাগে লেগে থাকা অপবস্তুগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা যায়।

কিছু বস্তু পাওয়া যায় যার উপরিভাগ মোটা আস্তরণ দিয়ে আবৃত। এই সব ক্ষেত্রে দেখা দরকার যে আস্তরণটি কি বস্তুর অবক্ষয় জনিত উৎপাদিত বস্তুর দ্বারা আবৃত এবং এতে কোন অবশিষ্ট গর্ভধাতু আছে কিনা। যদি অবশিষ্ট কোন গর্ভধাতু না থাকে তাহলে কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নাই।

যদি আস্তরণের উপাদানগুলি বাহিরের বালি, কার্বন এবং অন্যান্য অপবস্তু হয় তাহলে ৫ থেকে ১৫ শতাংশ সোডিয়াম হেক্সামেটা-ফসফেট ব্যবহার করে পরিষ্কার করা যায়। এরপর আগের মতই ক্লোরাইড মুক্ত করার জন্য পরিশ্রুত জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

অস্থায়ী আস্তরণযুক্ত এবং অবক্ষয় বিক্রিয়া সক্রিয় আছে এই ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা দরকার অবক্ষয় বিক্রিয়া বস্তুর কোন বিশেষ অংশে বা স্থানে সক্রিয় আছে, না সমস্ত বস্তুতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

বস্তুটির বিশেষ কোন অংশে বা স্থানে অবক্ষয় বিক্রিয়া সক্রিয় থাকলে প্রথমে দেখা দরকার 'ব্রোঞ্জ ডিসিজ'(Bronze disease)-এর ক্ষেত্রে যে ধরনের গহ্বর বস্তুর উপর সৃষ্টি হয় তা হয়েছে কিনা। যদি উপরিভাগে গহ্বর সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে উপযুক্ত দ্রাবক দিয়ে উপরের আস্তরণটিকে নরম ও দ্রবীভূত করতে হবে। এই কাজে ক্ষারীয় রচেলী সল্ট এবং পরে ১০ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়। আস্তরণটি পরিষ্কার করার পর ক্লোরাইড মুক্ত করার জন্য একে পরিশ্রুত জলে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। অথবা দস্তা ও ৯১ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে বিজারণ প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত স্থানগুলিকে আস্তরণ ও গহ্বর মুক্ত করা যায়। আগের মতই পরিশ্রুত জলে ধুয়ে বস্তুটিকে ক্লোরাইড মুক্ত করা দরকার।

আবার যদি এই ধরনের বস্তুতে নানান জায়গায় খুব ছোট ছোট ফাটল দেখা যায় তাহলে প্রয়োজন মত যে কোন একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বস্তুর উপর থেকে অবক্ষয় প্রাপ্ত বস্তু তুলে ফেলা যায়। এরপর এর উপর ৫ শতাংশ সোডিয়াম সেসকিউ কার্বনেট লাগিয়ে দেওয়া যায়। এর-ফলে বস্তুটি অবশিষ্ট ক্লোরাইড মুক্ত হতে পারে। আগের মত পরিশ্রুত জলে ধুয়ে বস্তুটি পরিষ্কার করে নিতে হবে।

যদি এছাড়াও বস্তুর উপরিভাগের কোন কোন জায়গা ফুলে যেতে ও ফাটল ধরতে

দেখা যায় তাহলে প্রথমে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপরিভাগের অবক্ষয় প্রাপ্ত বস্তু অপসারিত করা দরকার। এর পর ৫ শতাংশ সোডিয়াম সেস্‌কিউ কার্বনেট ব্যবহার করে ক্লোরাইড মুক্ত করতে হবে। সবশেষে পরিশ্রুত জলে ধুয়ে বস্তুটিকে পর্য্যায় ক্রমে শুকনো করা উচিত।

সমস্ত বস্তুটি যদি আস্তরণ দিয়ে আবৃত এবং ক্ষয়িষ্ণু হয় তাহলে দেখতে হবে বস্তুতে অবশিষ্ট কোন গর্ভধাতু আছে কিনা। যদি এতে গর্ভধাতু অবশিষ্ট থাকে তাহলে প্রথমে ক্ষারীয় রচেলী সল্ট ও পরে ১০ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করতে হবে। যদি এতেও পরিষ্কার করা না যায় তাহলে কস্টিক সোডা দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করা যায়।

তামা ও গিলটি করা তামার সংকর ধাতুর শিল্পবস্তুর ক্ষেত্রে দু ধরনের সমস্যা দেখা যায়। যদি গিলটি করা সংকর ধাতুর উপর সোনার সুসঙ্গত (coherent) কোন আস্তরণ থাকে তাহলে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বস্তুটির উপরিভাগ পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করা যায়। যদি যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও পরিষ্কার করা না যায় তাহলে লিসাপল গাহে নিমজ্জিত করে তারপর যদি নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষা যায় তাহলে উপরিভাগটি পরিষ্কার হতে বাধ্য। শেষে একইভাবে পরিশ্রুত জলে বস্তুটিকে ধুয়ে নিতে হবে।

একই ধরনের গিলটি করা তামার ধাতুতে মূল ধাতুটিতে যদি আস্তরণ ও অবক্ষয় ধরা পড়ে তাহলে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এটি পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করা যায়।

তামা ও তামার-সংকর ধাতুর সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি ঃ

বস্তুর উপর থেকে আবরণ (patina) **অপসারিত করা ঃ** যখন বস্তুর উপর সৃষ্ট আবরণ বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয় তখন বিদ্যুৎ রাসায়নিক অথবা তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট বিজারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে আবরণ অপসারিত করা যায়। এছাড়াও ক্ষারীয় রচেলী সল্ট দিয়ে আবরণ অপসারণ ও বস্তুটিকে সুরক্ষিত করা যায়। প্রাথমিক পর্য্যায়ে ক্ষারীয় রচেলী সল্ট দিয়ে আবরণ অপসারণ করার চেষ্টা করা উচিত এবং চূড়ান্ত পর্য্যায়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে বস্তুর উপর আটকে থাকা লবণ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অপসারিত করা যায়।

ক্ষারীয় রচেলী সল্ট এবং লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার ঃ তামা অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিউপ্রাস অক্সাইড ও কিউপ্রিক অক্সাইড গঠন করতে পারে। এই যৌগ গুলির উপস্থিতি আবরণে পাওয়া যায় এবং এরা দুটি লবণ উৎপাদন করে যেমন—কিউপ্রাস ও কিউপ্রিক লবণ। এই লবণগুলি কার্বনেট, ক্লোরাইড অথবা সালফেট জাতীয় হতে পারে। এই লবণগুলির রাসায়নিক গঠন ও বস্তুর উপর আক্র-মণের স্থান নির্ভর করে এটি কোথায় এবং কি ধরনের আবহাওয়াতে অবস্থান করছে তার উপর। সাধারণতঃ কিউপ্রিক লবণগুলি পরিষ্কারভাবে বস্তুর উপর জমতে থাকে এবং দেখে বোঝা যায়। এই লবণগুলি ক্ষারীয় রচেলী সল্ট দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। যদি উপরের সবুজ আবরণটি ক্ষারীয় রচেলী সল্ট ব্যবহার করে দ্রবীত করা যায় তাহলে

এরপর অবশিষ্ট কিউপ্রাস লবণ অপসারণ করার জন্য লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়। পর্য্যায়ক্রমে দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং বস্তুটি লবণ ও লোহা মুক্ত করে সংরক্ষিত করা যায়।

দ্রবণ (ক) ক্ষারীয় রচেলী সল্ট দ্রবণঃ ২৮.৩৫ গ্রাম বাণিজ্যিক কস্টিক সোডা ০.৫৬৭৯ লিটার পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে দ্রবীভূত করা দরকার। এরপর ৮৫ গ্রাম রচেলী লবণ (সোডিয়াম পটাসিয়াম টারটারেট) এতে মিশ্রিত করতে হবে।

দ্রবণ (খ) লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণঃ ৫৬ গ্রাম ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড খুব আস্তে ঠাণ্ডা জলে মিশ্রিত করে ১০ শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে। এই দ্রবণটি পোরসিলিনের পাত্রে রেখে নাড়াতে হবে।

আবরণ যুক্ত শিল্পবস্তুটিকে প্রথমে দ্রবণ (ক) তে ভিজিয়ে পাত্রটিকে চাপা দিয়ে দিতে হবে। যদি তাড়াতাড়ি আবরণটি মুক্ত করার দরকার হয় তাহলে বস্তুটিকে গরম দ্রবণে ভিজিয়ে রাখা যায়। যখন আবরণটি নরম হয়ে যাবে তখন এটি তুলে নিয়ে নরম ব্রাশ দিয়ে উপরিভাগটি পরিষ্কার করা উচিত।

রংহীন রচেলী সল্ট দ্রবণটি আস্তরণের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে নীল রং-এ রূপান্তরিত হয়। বস্তুটিকে প্রথম দ্রবণে সিক্ত করার পর একটি বাদামী-লাল কিউপ্রাস অক্সাইডের আস্তরণ বস্তুর সঙ্গে খুব দৃঢ়ভাবে আটকে থাকতে দেখা যায় এবং ব্রাশ করার পরও এটি পরিষ্কার করা যায় না। সাধারণত কিউপ্রাস ক্লোরাইডের সঙ্গে এটি মিশ্রিত হয়ে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে। অনেক সময় আস্তরণের মধ্যেও ধাতব একটি তামার স্তর পাওয়া যায় এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই স্তরটি অপসারিত করা ছাড়া বিকল্প কোন পদ্ধতি নাই।

এরপর বস্তুটিকে দ্রবণ (খ) তে নিমজ্জিত করতে হবে ও এটি গরম জায়গায় রাখা দরকার। বস্তুটিকে মধ্যে মধ্যে তুলে একটি ব্রাশ দিয়ে উপরিভাগটি পরিষ্কার করতে হবে। উপরের কিউপ্রাইট বা কপার অকসাইডের আস্তরণটি কতখানি পরিষ্কার ও অপসারিত হলো তা একটি পকেট লেন্স দিয়ে দেখতে হবে।

অনেক সময় পরিষ্কার ধাতব বস্তুর উপরিভাগের কিউপ্রাইট তামার যৌগের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বস্তুর উপর একটি আস্তরণ তৈরী করে। এর নীচে ক্লোরাইড লবণ জমতে দেখা যায়। চূড়ান্ত পর্য্যায়ে যখন বস্তুটিকে পরিষ্কার করা হয় তখন এই আস্তরণটিও অপসারিত করতে হবে। বিদ্যুৎ-বিশ্লিষ্ট পদ্ধতিতে এই আস্তরণটির অপসারণ সম্ভব।

লঘু দ্রবণ (খ) ব্যবহার করে এটি করা যায় যদিও এটি অনেক সময়সাপেক্ষ। এই ভাবে সম্পূর্ণভাবে আস্তরণ মুক্ত করার পর একে পরিশ্রুত গরমজল দিয়ে ফুটিয়ে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার ও লবণমুক্ত করতে হবে। এটি সম্পূর্ণভাবে লবণমুক্ত হলো কিনা সিলভার নাইট্রেট পরীক্ষা করে তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

ক্ষারীয় রচেলী সল্ট ও হাইড্রোজেন পারক্সাইডের ব্যবহারঃ ব্রোঞ্জের বস্তুর

উপর যদি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য থাকে তখন লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করার পর কিউপ্রাইট দ্রবীভূত হয়, কিন্তু এর ফলে, এর উপর পাতলা একটি আস্তরণ পড়তে দেখা যায়। এই আস্তরণের মধ্যে তামার পাউডার জমে থাকে এবং ব্রাশ করেও এই পাউডার পরিষ্কার করা যায় না। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য একটি জারণ-গাহ (oxidizing bath) ব্যবহার করা যায়। এই জারণ-গাহ প্রস্তুত করা যায় ১০০ মিলিলিটার হাইড্রোজেন পারক্সাইড (২০ ভাগ আয়তন) এক লিটার ক্ষারীয় রচেলী সল্ট দ্রবণ (ক)-এর সংগে মিশ্রিত করে। এই দ্রবণে এখন আস্তরণযুক্ত শিল্পবস্তুকে নিমজ্জিত করতে হবে এবং মধ্যে মধ্যে তুলে ব্রাশ দিয়ে উপরিভাগটি পরিষ্কার করতে হবে। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিক্রিয়ার ফলে বস্তুর ক্ষত জায়গার উপর কিউপ্রাইটের অধঃক্ষেপ পড়তে থাকবে। কিউপ্রাস লবণ আবার রচেলী সল্ট দ্রবণে জারিত ও দ্রবীভূত হতে পারে। সালফিউরিক অ্যাসিডের চেয়ে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিক্রিয়া খুব আস্তে হতে দেখা যায়। বস্তুটি জারিত করার জন্য ব্যবহৃত দ্রবণ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে যদি অবশ্য খুব বেশি সময় এটি দ্রবণে নিমজ্জিত করে রাখা হয়। কিন্তু যদি যথাযথ পদ্ধতি ও ঠিক সময় এটি অপসারিত করা যায় তাহলে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও খোদাই অংশগুলি স্পষ্ট ও সুরক্ষিত হয়। বিশেষ ব্যবস্থা ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

বস্তুর উপর আস্তরণ সংরক্ষণ ঃ ব্রোঞ্জের বস্তুর উপর যখন মসৃণ, সুদৃঢ়, সুসঙ্গত আস্তরণ পাওয়া যায়, যা বস্তুটিকে সুরক্ষিত করে তখন এটি রক্ষা করার দরকার। যদি এর উপর কোন ক্ষত পাওয়া যায় তাহলে আস্তরণটিকে রক্ষা করে ক্ষত অপসারিত করা বেশ জটিল ও কঠিন ব্যাপার। এই ধরণের শিল্পবস্তু পেলে প্রথমে এর উপরে অবক্ষয়বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এটি না করলে বস্তুর দ্যুতি ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতে পারে। এই ক্ষত দাগগুলির গুণাগুণ এবং এটি কতখানি বস্তুর উপর ছড়িয়ে পড়েছে, তার উপর নির্ভর করে, কি ধরনের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করে শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করা উচিত।

তিন ধরনের অবক্ষয় এই ধরনের বস্তুর উপর লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল (ক) বস্তুর উপর পাতলা মসৃণ আস্তরণ এবং বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কিছু ক্ষত (খ) শক্ত মসৃণ আস্তরণ ও এর উপর নানান জায়গায় ক্ষতের দাগ (গ) আস্তরণের উপর দাগ এবং দাগগুলির উপর সচ্ছিদ্র ক্ষত স্থান। এই ধরনের আস্তরণযুক্ত শিল্পবস্তুর উপর ক্ষতের গুণাগুণ অনুসারে আস্তরণটি সংরক্ষণ করে কি ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তা আলোচনা করা যায় ঃ

(ক) ধরা যাক একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত শিল্পবস্তু যার উপরিভাগটিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য-বর্তমান। শিল্পবস্তুটির উপরিভাগে সবুজ পাতলা আস্তরণের সঙ্গে আবার বাদামী কিউপ্রাইট মিশ্রিত থাকতে দেখা যাচ্ছে। আস্তরণটি মসৃণ, পাতলা ও বিক্ষিপ্তভাবে থাকে এবং এর উপর ক্ষতস্থান লক্ষ্য করা যদি যায় তাহলে এতে ক্লোরাইডের উপস্থিতি অনুমান করা যায়। এই ক্লোরাইডযুক্ত ক্ষতদাগগুলি বস্তুর বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দেয় ও সূক্ষ্ম

কারুকার্য গুলি আবৃত করে রাখে। এই ধরণের বস্তুকে সংরক্ষণ করতে হলে প্রথমে ক্লোরাইডমুক্ত করা দরকার। ক্লোরাইড মুক্ত করার পর ক্ষত অংশগুলি পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হতে পারে। বস্তুটির ক্ষত অংশ পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হলে সূক্ষ্ম কারুকার্য-গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বস্তুটিকে প্রথমে ৫ শতাংশ সোডিয়াম সেস্কিউকার্বনেট দ্রবণে কয়েক সপ্তাহ নিমজ্জিত করে রাখতে হবে এবং দ্রবণটি প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করা দরকার। দেশলাইকাঠি অথবা আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে বিশেষভাবে আবৃত ও ক্ষত অংশগুলি পরিষ্কার করতে হবে। সম্পূর্ণভাবে ক্লোরাইডমুক্ত করার জন্য এটি পরিশ্রুত জলে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে ক্লোরাইড মুক্ত হলো কিনা সিলভার নাইট্রেট ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে হবে। ক্লোরাইড মুক্ত করার পর একে কয়েক ঘন্টা গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। গরম জল থেকে তুলে নিয়ে ভালোভাবে শুকনো করার পর পরিষ্কার আস্তরণের উপরিভাগে ব্রাশ দিয়ে তরল মোম লাগিয়ে দিতে হবে। এইভাবে আস্তরণ ও বস্তুটিকে সংরক্ষণ করা যায়।

যদি ব্রোঞ্জের বস্তুর উপর সবুজ পুরু আস্তরণ থাকে এবং এর উপরিভাগে গভীর ক্ষতযুক্ত অল্প সবুজ দাগ পাওয়া যায় তাহলে প্রথমে গহবরে গুলির মধ্য থেকে গুড়ো গুড়ো পাউডার বার করে দিতে হবে। একটি ছুঁচ ব্যবহার করে এই কাজটি করা যায়। দরকার হলে লেন্স ব্যবহার করে আস্তে আস্তে গুড়ো অপসারিত করতে হবে। গহবর-গুলি মোটামুটি পরিষ্কার করার পর প্রতিটি গহবরে দস্তার গুড়ো দিয়ে ভর্ত্তি করার পর এর উপর ১০ শতাংশ H_2SO_4 ফোঁটা ফোঁটা করে ফেলতে হবে। এর ফলে বস্তুর অবক্ষয়ের জন্য যে ক্লোরাইড লবন দায়ী সেগুলি দ্রবীভুত হয়ে যাবে এবং পরিশ্রুত জলে ধুয়ে এখন এটি পরিষ্কার করতে হবে। এই চিকিৎসার ফলে বস্তুর উপর থেকে সব গুড়ো পদার্থ অপসারিত হলে অল্প বাদামী রং-এর গহবরগুলি দেখা যাবে। ম্যালাকাইট যাতে কোন ভাবে অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত না হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ক্ষত অংশগুলিকে চিকিৎসা করার পর একে প্রবহমান পরিশ্রুত জলের নীচে রাখতে হবে। তারপর তুলে এনে যথাযথ পদ্ধতিতে শুকনো করতে হবে। যদি দেখা যায় যে বস্তুটি পরিষ্কার হয়নি তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা উচিৎ।

(গ) কিছু কিছু ব্রোঞ্জের বস্তু ঢালাই করার কলাকৌশল এমন যে এটি প্রস্তুত করার সময় এতে প্রচুর রন্ধ্র থেকে যায়। কিছু কিছু ব্রোঞ্জের শিল্পবস্তুর ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে দেখা যায়। এই ধরনের শিল্পবস্তুর যখন 'ব্রোঞ্জ ডিসিজ' হতে দেখা যায় তখন এদের স্থায়িত্ব রক্ষা করা বেশ কঠিন ব্যাপার হয়। এতে গহবরগুলি সংখ্যায় বেশি থাকে এবং অন্যান্য ব্রোঞ্জের শিল্পবস্তুর তুলনায় এতে বেশি পরিমাণ ক্লোরাইড লবণ জমে থাকতে পারে। বস্তুটিকে কোন দ্রবণে নিমজ্জিত করে যদি লবণমুক্ত করার চেষ্টা করা হয় তাহলে বস্তুটির সামগ্রিক ক্ষতি হতে পারে। তাই এই ধরনের শিল্পবস্তুকে লবণমুক্ত করার জন্য রন্ধ্রযুক্ত জায়গাগুলিতে কেবল চিকিৎসা করা দরকার। বস্তুটিকে কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করার আগেই এতে কতখানি গর্ভধাতু আছে তা পরীক্ষা করতে হবে। বস্তুতে নানান ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করেও

সম্পূর্ণভাবে লবণমুক্ত করা যায় না। তাই প্রথমে উপরিভাগটি পরিষ্কার করার পর বস্তুর নীচের ডিসট সম্ভব হলে অপসারিত করতে হবে। লবণ অপসারিত করার পর রাসায়নিক দ্রাবক দিয়ে এটি আবার বস্তুর সংগে পুনরায় আটকে দেওয়া যায়। প্রথমে সাইট্রিক অ্যাসিড ও চূড়ান্ত পর্য্যায়ে সোডিয়াম সেসকিউকার্বনেটে নিমজ্জিত করে বস্তুর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা সম্ভব।

চুনা বস্তু অপসারণ ঃ তামা ও ব্রোঞ্জের উপর অনেক সময় চুনাপাথর জাতীয় বস্তু দৃঢ়ভাবে আটকে থাকতে দেখা যায়। যদি বস্তুটি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সমৃদ্ধ হয় অথবা ধাতব বস্তুটির বেধ কম হয় তাহলে লঘু HNO_3 ব্যবহার করে চুনা বস্তু অপসারিত না করাই বিধেয়; কিন্তু সূক্ষ্ম কারুকার্য্য না থাকলে এবং বেধ যদি বেশি হয় তাহলে লঘু HNO_3 ব্যবহার করে চুনাবস্তু পরিষ্কার করা যায়।

সূক্ষ্ম কারুকার্য্যযুক্ত পাতলা বস্তুর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ সোডিয়াম হেক্সামেটাফসফেট দ্রবণে নিমজ্জিত করলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ দ্রবীভূত হয়ে মুক্ত হতে পারে। প্রয়োজন হলে এই কাজে ১৫ শতাংশ দ্রবণ ব্যবহার করা যায়। এতে বিক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয় ও তাড়াতাড়ি জমা বস্তু দ্রবীভূত হয়। রাসায়নিক পদার্থটি এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বস্তুর মূল আস্তরণের কোন ক্ষতি না হয়। অবশ্য যদি কোথাও আস্তরণটিকে অপসারিত করার দরকার হয় তাহলেও সোডিয়াম হেক্সামেটাফসফেট ব্যবহার করা যায়। এমনকি যে সব বস্তুতে কোন গর্ভধাতু অবশিষ্ট নেই অথচ চুণা বস্তু দৃঢ়ভাবে বস্তুর উপর আটকে আছে সেখানেও সোডিয়াম হেক্সামেটা-ফসফেট ব্যবহার করে বস্তুটিকে অবক্ষয়মুক্ত ও সংরক্ষিত করা যায়।

পরিশিষ্ট

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সংগ্রহশালা

সংগ্রহশালা ঃ ইতিহাস ও সংরক্ষণ গ্রন্থটির প্রথম খন্ড পাঠ করে হয়ত কোন কোন পাঠকের সংগ্রহশালা দেখার এবং সে সব সংগ্রহশালার সঙ্গে কৌতুহলী দর্শক বা জিজ্ঞাসু গবেষকের ব্যক্তিগত সংযোগ গড়ে তোলার ইচ্ছা জাগতে পারে। ছুটির দিনে, কিম্বা, হাতে সময় থাকলে যে কোনদিন এই শহর কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে যে সব মিউজিয়ম রয়েছে সেগুলি তাঁরা দেখতে যেতে পারেন. সে কারণ পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালাগুলির একটি ঠিকানা সহ তালিকা দেওয়া হল। বলা প্রয়োজন যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নোক্ত সংগ্রহশালাগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাস বিবৃত করা হবে।

কলিকাতা ঃ

১। আশুতোষ মিউজিয়ম অফ ইন্ডিয়ান আর্টস (১৯৩৩), শতবার্ষিকী ভবন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্ট্রীট, কলিঃ ৭০০০৭৩ ; ফোন ঃ ৩৪-৩০১৪ (বিশ্ববিদ্যালয়) ভারতীয়, বিশেষ করে পূর্বভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক। বাংলার লোকশিল্পের সংগ্রহটি খুবই সমৃদ্ধ। খোলা ঃ ১০-৩০—৫-৩০, শনিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ।

২। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম (১৮১৪), ২৭ জহরলাল নেহেরু রোড, কলিঃ ৭০০০১৩ ; ভারতের বৃহত্তম সংগ্রহশালা। শিল্পকলা, প্রত্ন-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, জীব-বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, আর্থ-উদ্ভিদ-বিদ্যা সংক্রান্ত সর্বভারতীয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের নিদর্শনের বিশাল সংগ্রহ এখানে আছে। খোলা ঃ ১০—৫, ১০—৪-৩০ (ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারী সোমবার বন্ধ।)

৩। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি, হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েল ফেয়ার মিউজিয়ম, লেক টাউন, কলি ঃ ৭০০০৫৫, ফোন : ৫৭-২৭৩১/৩২ ; খোলা ঃ ১০—৫, সরকারী ছুটির দিনে বন্ধ।

৪। ইনস্টিটিউট অফ পোর্ট ম্যানেজমেন্ট মিউজিয়ম. ৪০ সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, কলি ঃ ৭০০০৪৩. ফোন ঃ ৪৫-১০৯১।

৫। একাডেমি অফ ফাইন আর্টস (১৯৩৩), ক্যাথিড্রাল রোড, কলিঃ ৭০০০১৬, ফোন ঃ ৪৪-৪২০৫। এই সংস্থার প্রদর্শকক্ষ 'রবীন্দ্র গ্যালারী' (১৯৬২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি, স্বহস্তে অংকিত চিত্র ও চিঠিপত্রের সংগ্রহশালা।

খোলা ঃ ১২-৮, সোমবার বন্ধ।

৬। এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া (১৮২০), ১ আলিপুর রোড, কলি ঃ ৭০০০২৭, ফোন ঃ ৪৫-২৬১৩, এখানে ফুলের বাগান ও সবুজ কুঞ্জ খুবই মনোরম। খোলা ঃ ৭—১১, ৩—৫।

৭। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (১৭৮৪), ১ পার্ক স্ট্রীট, কলি : ৭০০০১৬, ফোন : ২৪-০৪৩৯। এখানে রুবেন, রেনল্ড, হোম প্রভৃতি ইওরোপীয় শিল্পীদের আঁকা চিত্র, পালযুগের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রলেখ, মুদ্রিত চিত্র এবং দুর্লভ গ্রন্থের সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। খোলা : ১২—৭, শনিবার—১২—৬।

৮। এথনোগ্রাফিক মিউজিয়ম (১৯৫৫), কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, উপজাতি কল্যাণ বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস, ১ কে. এস. রায় রোড, কলি : ৭০০০০১, ফোন ২৩-৬২৭১। উপজাতি সংস্কৃতি সংক্রান্ত নিদর্শনসংগ্রহ। খোলা : ১০-৩০—৫, সরকারী ছুটির দিন বন্ধ।

৯। ক্রাফট্‌স্‌ মিউজিয়ম (১৯৫০), রিজিওনাল ডিজাইন সেণ্টার, অল ইণ্ডিয়া বোর্ড অফ হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌স্‌, ভারত সরকার, ৯/১২ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলি : ৭০০০০১, ফোন : ২৩-৭২০৫। সর্বভারতীয় হস্তশিল্পের সংগ্রহ। খোলা : ১০—৫ সরকারী ছুটির দিন বন্ধ।

১০। গভর্নমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড কমার্শিয়াল মিউজিয়ম (১৯৩৯), পঃ বঃ সরকার, ৪৫ গনেশ চন্দ্র এভিন্যু, কলি : ৭০০০১৩, ফোন : ২৪-৩২৯০। ক্ষুদ্র শিল্প, হস্ত শিল্প ও লোক শিল্পের সংগ্রহ। ১০-৩—৫, সরকারী ছুটির দিন বন্ধ।

১১। জুট মিউজিয়ম (১৮৩৬), টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীজ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, ১২ রিজেন্ট পার্ক, কলি : ৭০০০৪০, ফোন : ৪৬-৪৫৪১। পাটজাত পণ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত সংগ্রহ।

১২। স্টেট আর্কিওলজিক্যাল গ্যালারী (১৯৬২), তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, ১ সত্যেন রায় রোড, বেহালা, কলি : ৭০০০৩৪, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রাচীন শিল্পবস্তুর সংগ্রহ। খোলা : ১১—৫-৩০, সরকারী ছুটির দিন বন্ধ।

১৩। স্টেট আর্কাইভস (১৯০৯), পঃ বঃ সরকার, ৬ ভবানী দত্ত লেন, কলি : ৭০০০০৭, ফোন : ৩৪-১১৩৩। ১৭৭০ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়ের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ রাজ শাসনের সরকারী প্রশাসন ও অন্যান্য ১৬২৪ সাল থেকে পার্সী ও বাংলা, ১৭০২ থেকে ১৪২৭ পর্যন্ত সময়ের চুঁচুড়ার ডাচ প্রশাসন, সংক্রান্ত ও শ্রীরামপুরের ডেনিস প্রশাসন ও অন্যান্য কাগজ-পত্র, নথী প্রভৃতি এখানে সংরক্ষিত। খোলা : ১০-৩০—৫, সরকারী ছুটির দিন বন্ধ।

১৪। জুলজিক্যাল গার্ডেন (১৮৭৫), ২ আলিপুর রোড, কলি : ৭০০০২৭। ভারতের বৃহত্তম ও অন্যতম চিড়িয়াখানার একটি। খোলা : ৬—৫-৩০ (গ্রীষ্মকাল), ৬-৩০—৫-০০ (শীতকাল)।

১৫। নেতাজী মিউজিয়ম, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো (১৯৬১), ৩৮/২ লালা লাজপত রায় সরণী, কলি ঃ ৭০০০২০। ফোন ঃ ৪৭-৩৭৪৫ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের জীবন ও কর্ম সংক্রান্ত নথী পত্তর পান্ডুলিপি, মুদ্রিত চিত্র, ব্যবহৃত জিনিস প্রভৃতি তাঁর পৈতৃক গৃহে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত। খোলা ঃ ৪—৮, রবিবার ৯—১২।

১৬। নেহরু চিল্ড্রেনস মিউজিয়ম (১৯৭২), ৯৪১ চৌরঙ্গী রোড, কলি ঃ ৭০০০০১৫, ফোন ঃ ৪৪-৩৫১৬। পুতুলে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী, দেশ বিদেশের জাতীয় পোষাক পরা পুতুল, চলমান খেলনা রেলগাড়ী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। খোলা ঃ ১২—৬, সোমবার বন্ধ।

১৭। ন্যাশনাল লাইব্রেরী ঃ দুর্লভ পুস্তক ও পান্ডুলিপি বিভাগ; আলিপুর কলি ঃ ৭০০০২৭, ফোন ঃ ৪৫-৪০২৪। বৃটিশ পূর্ব ও বৃটিশ কালের বহু মূল্যবান ও দুর্লভ পান্ড্রুলিপি, পুস্তক, খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চিঠিপত্র প্রভৃতি এখানে সংরক্ষিত। খোলা ৯—৮, ছুটির দিনে ১০—৫।

১৮। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালা (১৯১০), ২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড, কলি ঃ ৭০০০০৬। পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্য্য, প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা, চিত্রিত পুঁথি, পান্ডুলিপি, বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যসেবীদের পত্র, পান্ডুলিপি ও ব্যবহৃত দ্রব্য। খোলা ঃ ১—৮, বৃহস্পতিবার ও সাধারণ ছুটির দিন বন্ধ।

১৯। বিড়লা ইন্ডাস্ট্রীয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম (১৯৫৭), ১৯এ গুরুসদয় রোড, কলি-৭০০০১৯; ফোন ঃ ৪৪-৭২৪১-৪৪। প্রয়োগ-বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ও কারিগরী বিজ্ঞানের উপর ভারতের বৃহত্তম সংগ্রহশালা। সারা বছরে নানান বিষয়ে অস্থায়ী প্রদর্শনী, আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নানা ধরনের শিক্ষাকার্য্যক্রমের ব্যবস্থা আছে। আধুনিক উন্নতমানের সংগঠন ও কার্য্যক্রম। খোলা ঃ ১০—৫-৩০, সোমবার বন্ধ।

২০। বিড়লা একাডেমি অফ আর্টস এন্ড কালচার (১৯৬০), ১০৮-১০৯ সাদার্ন এভিনিউ, কলি-৭০০০১৯, ফোন ঃ ৪৬-৯৮০২। ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য্য, চিত্রিত পুঁথি প্রভৃতির সংগ্রহ। আধুনিক শিল্পীদের চিত্র ও ভাস্কর্য্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। খোলা ঃ ৪—৮, রবিবার ১—৮, মঙ্গলবার বন্ধ।

২১। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম (১৯৬২), ৯৬, জহরলাল নেহরু রোড, কলি-৭০০০১৩, ফোন ঃ ৪৪-১৫৫৪। নক্ষত্র, সৌরমন্ডল, ছায়াপথ, মহাকাশ-অনুসন্ধান সংক্রান্ত বিষয় আকাশ-প্রতিম অর্ধমণ্ডলাকার ছাদের তলদেশে প্রক্ষেপ করে ব্যাখ্যাসহ দেখান হয়। প্রেক্ষাগৃহ সংলগ্ন বৃত্তাকার গ্যালারীতে দূরবীক্ষণ ক্যামেরাতে তোলা জ্যোতিষ্ক চিত্র, ও প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদদের

আবক্ষ মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি, তামিল, গুজরাতী ও ওড়িয়া ভাষায় ভাষ্যসহ প্রক্ষেপণের পৃথক সময়সূচী আছে। প্রক্ষেপণ সময় ঃ ২, ৩-৩০, ৫, ৬-৩০ ; রবিবার ও ছুটির দিনে ১১-৩০ এ অতিরিক্ত প্রক্ষেপণ।

২২। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (১৯০৩), কলি-৭০০০১৬ ; ফোন ঃ ৪৪-৫১৫৪। ষোড়শ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ; বিশেষত বৃটিশ যুগের ভারতীয় ইতিহাস, সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল, দস্তাবেজ, চুক্তিপত্র, সন্ধিপত্র, ইংরেজ সম্রাট ও শাসকদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পাশ্চাত্যরীতির চিত্র, এনগ্রেভিং, মুদ্রিত চিত্র, প্রতিকৃতি চিত্র ও মূর্ত্তি, পুরানো কলিকাতা সংক্রান্ত চিত্র, পুস্তক ও অন্যান্য নিদর্শন এখানে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত। সৌধটি ও তৎসংলগ্ন বাগান দর্শনীয়। খোলা ঃ ১০ - ৫ (মার্চ-অক্টোবর) ও ১০—৪ (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী), সোমবার বন্ধ।

২৩। মার্বেল প্যালেস আর্ট গ্যালারী এণ্ড জু-গার্ডেন, ৪৬ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলি-৭০০০০৭, ফোন ঃ ৫৬-৪৫৪১। ইওরোপীয় ভাস্কর্য, চিত্র ও আসবাবের পারিবারিক সংগ্রহশালা ও সংলগ্ন ছোট চিড়িয়াখানা। কলকাতার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের প্রাসাদটির স্থাপত্যসৌন্দর্য দর্শনীয়। খোলা ঃ ১০ ৪, সোম ও বুধবার বন্ধ।

২৪। রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়ম (১৯৬১), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলি-৭০০০০৭, ফোন ঃ ৩৪-৫২৪১। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির একাংশে রক্ষিত ও প্রদর্শিত ঠাকুর-পরিবার, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধীয় এবং ঊনবিংশ শতক সংক্রান্ত সংগ্রহশালা। খোলা ঃ ১০—৭, শনিবার ১১—২, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে সন্ধ্যা ৭—৮।

২৫। মিউজিয়ম এণ্ড গ্যালারী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলি-৭০০০২৯। ভারতীয় চিত্র, লোকশিল্প, ও ভাস্কর্যের সংগ্রহশালা। ভারতীয়, বিশেষত বাংলাশৈলীর চিত্রকলার সংগ্রহ ভাল। খোলা ঃ ৯—১ ও ৪—৮।

২৫। লোক সংস্কৃতি সংগ্রহশালা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, ১ সত্যেন রায় রোড, বেহালা, কলি-৭০০০৩৪। লোক সংস্কৃতি সংক্রান্ত নবনির্মিত ছোট সংগ্রহশালা। খোলা ঃ ১১—৫-৩০, সরকারী ছুটির দিন বন্ধ।

২৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মিউজিয়ম (১৯৬২), সংস্কৃত কলেজ, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলি-৭০০০১২। প্রাচীন ভারত ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কলেজ সংগ্রহশালা। প্রকৃত পুরা ও শিল্পবস্তুর ছাঁচে তোলা ও

মুদ্রিত কপি, চার্ট ও আলোক চিত্রের সংগ্রহ। সামান্য কয়েকটি প্রকৃত পুরা-বস্তু আছে। খোলা : ১১—৫, কলেজ ছুটির দিন বন্ধ।

উপরোক্ত সাধারণ ও কলেজ সংগ্রহশালাগুলি ছাড়াও কলকাতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, কৃষি, নৃ-তত্ব, ভূ-তত্ব, ভূগোল, উদ্ভিদ-বিদ্যা, কৃষি প্রভৃতি বিভাগে স্ব স্ব বিষয়ে বিভাগীয় সংগ্রহশালা আছে। প্রথমটি হাজরা রোড ও অন্যগুলি ৩৫ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলি-৭০০০১৯ এ অবস্হিত। ৯২ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে অবস্হিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোস ইনস্টিটিউট সংলগ্ন আচার্য্য জগদীশ বোসের বাড়িতে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সংগ্রহশালায় আচার্য্য জগদীশ বোসের পান্ডুলিপি, চিঠিপত্র, আলোকচিত্র, আচার্য্য কর্ত্তৃক নির্মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিদর্শনের সংগ্রহ আছে।

কলকাতার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে বিভাগীয় সংগ্রহশালা আছে। যেমন—১। অ্যানাটমিক্যাল এন্ড প্যাথলজিক্যাল মিউজিয়ম, মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫); ২। মিউজিয়ম অফ দি স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন (১৯২১) ৩। অ্যানাটমিক্যাল এন্ড প্যাথলজিক্যাল মিউজিয়ম, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ; ৪। আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ মিউজিয়ম (১৯১৬) ৫। হেলথ এডুকেশন মিউজিয়ম (১৯৫৫); অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাব্লিক হেলথ; (১৯৪৮), ৬। অ্যানাটমিক্যাল এন্ড প্যাথলজিক্যাল মিউজিয়ম, ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট; ৭। মিউজিয়ম অফ দি বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজ (১৮৯৪) প্রভৃতি।

যাদবপুর মিউজিয়ম অফ্ দি সেন্ট্রাল গ্লাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ ইন-স্টিটিউটে গ্লাস এন্ড সিরামিকস এর উপর একটি ছোট সংগ্রহ আছে।

২৪ পরগণা : উত্তর

১। **গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় (১৯৬১), ১৪ রিভারসাইড রোড, বারাকপুর; ফোন : বারাকপুর—১০। গান্ধী স্মারকনিধি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গান্ধীর জীবনী, আদর্শ ও কর্ম (নোয়াখালি শান্তি মিছিল সহ) আলোকচিত্র, চিঠিপত্র, ফটোস্টাট কপি, প্রেস কাটিংস পুস্তক-পুস্তিকা, পত্রিকা, টেপ রেকর্ডিংস প্রভৃতির মাধ্যমে প্রদর্শিত। খোলা : ১২—৬ (এপ্রিল-অক্টোবর), ১১—৫ (নভেম্বর-মার্চ), বুধবার বন্ধ।**

২। ঋষি বঙ্কিম লাইব্রেরী এন্ড মিউজিয়ম (১৯৫৪), কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি। বাংলার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বসতবাড়ির একাংশে অবস্হিত এই সংগ্রহশালায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার পান্ডুলিপি, ব্যবহৃত জিনিস, চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ আছে। তিনখানি ঘর, একটি হলঘর ও গা'লাগা বাগান, সমগ্র বাড়ীর ঐ অংশটুকু যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বাস করতেন, সেই অংশটি ১৯৩৮ সালে বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকী

উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ক্রয় করেন। খোলা : ১২—৬, শুক্রবার ৩—৬, বৃহস্পতিবার ও সরকারী ছুটির দিন বন্ধ।

২৪ পরগণা : দক্ষিণ

৩। কমার্স মিউজিয়ম, রামকৃষ্ণ-মিশন বিদ্যালয় (১৯৬২), নরেন্দ্রপুর। ছাত্রদের উৎসাহে ছাত্র ও শিক্ষকদের দ্বারা সংগৃহীত চারু ও কারু শিল্প এবং হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প নিদর্শন, মডেল প্রভৃতি এবং অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফটস বোর্ড কর্তৃক দানকৃত হস্তশিল্প নিদর্শন, জাপান, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসগুলির দেওয়া বিভিন্ন জিনিসে এই ছাত্র-শিক্ষক পরিচালিত সংগ্রহশালাটি পশ্চিমবঙ্গের সামান্য কয়েকটি স্কুল মিউজিয়মের একটি। খোলা : সাধারণের জন্য রবিবার।

৪। কালিদাস দত্ত সংগ্রহ, মজিলপুর। ২৪ পরগণার প্রত্নবস্তুর সংগ্রহ। কালিদাস দত্ত মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত বহু পুরাবস্তু কলিকাতার বিভিন্ন সংগ্রহশালায় দান করার পর অবশিষ্ট অংশটি মজিলপুরে তাঁর গৃহে রক্ষিত আছে।

৫। গুরুসদয় মিউজিয়ম অফ ফোক আর্ট (১৯৫৩), ঠাকুর পুকুর, পোঃ জোকা। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক এবং বাংলার লোকশিল্পের অনুরাগী ও সংগ্রাহক গুরুসদয় দত্ত, আই সি এস মহাশয় কর্তৃক ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে বেঙ্গল ব্রতচারী সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত যুক্তবঙ্গের লোকশিল্পের একটি সুন্দর সংগ্রহ। লোকায়ত চিত্র, কাঁথা, পুতুল, খেলনা, কাঠের কাজ, মন্দিরের মৃৎফলক, পাথরের মূর্তি, বেত ও বাঁশের কাজ, মৃৎপাত্র প্রভৃতি এখানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। খোলা : ১১-৩০—৪, ১১-৩০—১-৩০ (বুধবার), বৃহস্পতিবার বন্ধ।

৬। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মিউজিয়ম (১৯৬৫), নিমপীঠ, ভায়া জয়নগর। লোক-শিল্প ও উপজাতি-শিল্পের ছোট সংগ্রহশালা, আশ্রম-পরিচালিত স্কুলের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত আশ্রমের মন্দির দর্শনার্থীরা কৌতূহলী হলে পরিচালকদের অনুমতি নিয়ে মিউজিয়ম দেখতে পারেন।

৭। রামকৃষ্ণ মিশন সংগ্রহশালা, মানসদ্বীপ, সাগর। স্থানীয় প্রত্নবস্তুর ছোট সংগ্রহশালা।

৮। সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা (১৯৮২), বারুইপুর। স্থানীয় বিধায়ক শ্রীহেমেন মজুমদারের প্রযত্নে স্থাপিত ও সংগঠিত একটি নবজাত আঞ্চলিক প্রত্ন ও লোকশিল্প সংগ্রহশালা।

৯। সুরেন্দ্রনগর হাইস্কুল সংগ্রহশালা, জে. প্লট, সুরেন্দ্রনগর, পাথরপ্রতিমা। প্রত্ন-বস্তুর স্থানীয় সংগ্রহ।

১০। সুষমা মেরিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কাকদ্বীপ। সামুদ্রিক গবেষণা সংস্থার একটি অঙ্গ এই সামুদ্রিক প্রাণী নিদর্শনের সংগ্রহশালা।

১১। হাতিয়ার সাহিত্য সংসদ সংগ্রহ, কাশীনগর। স্থানীয় প্রত্ন বস্তু, লোক-শিল্প ও পুঁথি-পুস্তকের ছোট সংগ্রহ ভান্ডার।

এছাড়া ২৪ পরগণায় সুন্দরবন অঞ্চলের পুরাবস্তু ও লোকশিল্পের আরও কয়েকটি প্রত্নবস্তু সংগ্রহ বিভিন্ন সংস্থা অথবা ব্যক্তির উৎসাহে গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে ১২। হাড়োয়ায় অবস্থিত বালান্দা সংগ্রহশালাটি এম. এ জাব্বরের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হলেও সংগ্রহের মান ও পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ।

হুগলী ঃ

১৩। অমূল্য প্রত্নশালা (১৯৪১), রাজবলহাট। বাংলার বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ পন্ডিত অমূল্য চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাজবলহাটের হেমচন্দ্র পাঠাগার কর্তৃক স্থানীয় জন সাধারণের দান ও উৎসাহে স্থাপিত। প্রস্তরমূর্ত্তি, দুর্লভ পুঁথি, কাঠের ভাস্কর্য, মন্দিরের খোদিত মৃৎফলক, প্রাচীন মুদ্রা, পট চিত্র, খেলনা ও পুতুল এই ছোট সংগ্রহালয়টিতে আছে। খোলা ঃ লাইব্রেরীর সঙ্গে সকালে ও বিকালে খোলা থাকে। পূর্বে খবর দিয়ে দেখতে যাওয়া ভাল।

১৪। টেক্সটাইল মিউজিয়ম, কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর। পাট-শিল্পের বয়ন প্রক্রিয়া শিক্ষা সহায়ক কলেজ মিউজিয়ম। খোলা ঃ কলেজ যখন খোলা থাকে তখন প্রিন্সিপালের অনুমতি নিয়ে দেখা যায়।

১৫। কেরী মিউজিয়ম এন্ড লাইব্রেরী (১৮১৮), শ্রীরামপুর কলেজ, শ্রীরামপুর। বাংলায় মুদ্রণশিল্প প্রবর্তন, উদ্ভিদ বিজ্ঞানচর্চা, কৃষি-গবেষণা ও সংগ্রহশালা স্থাপনায় ঊনবিংশ শতকের পুরোধাগণের বিশিষ্ট একজন রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরী। তিনি ও তাঁর দুই সহযোগী জে মার্শম্যান ও ডব্লু, ওয়ার্ড যে মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন ১৮১৮ সাল থেকে, সেটিরই পরবর্ত্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন কেরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উপরোক্ত নামকরণ করেন। বাংলা তথা ভারতের মুদ্রণশিল্পের প্রথম যুগে বিভিন্ন ভারতীয় ও এশিয় ভাষায় কেরী ও মার্শম্যানের শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ, কেরীকর্ত্তৃক সংগৃহীত বেদ ও উপনিষদের পুঁথি, খনিজ নিদর্শন এবং কেরীর ব্যবহৃত নানান জিনিসের দুর্লভ সংগ্রহ রয়েছে।

১৬। মিউজিয়ম এন্ড আর্ট গ্যালারী ইনস্টিটিউট দ্য চন্দরনগর, দি রেসিডেন্সি, চন্দননগর। ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরের ভারতভুক্তির চুক্তি (১৯৫২) অনুসারে ভারত ফরাসী সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইনস্টিটিউট দ্য চন্দর নগর স্থাপন করা হয় চন্দরনগরের ঐতিহাসিক রেসিডেন্সি ভবনে। মিউজিয়ম এন্ড আর্ট গ্যালারী সেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একটি অংশ। কলকাতার ইতিহাস রচয়িতা প্রখ্যাত পন্ডিত হরিহর শেঠ মহাশয়ের সংগ্রহ, চন্দননগরের স্থানীয় ইতিহাস ও বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনী সংক্রান্ত মূল্যবান নথী-পত্র, দলিল, আলোকচিত্র, চিত্র, পুস্তক প্রভৃতি এখানে সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া সামান্য সংখ্যক প্রত্ন ও শিল্প বস্তু আছে। খোলা ঃ ৪—৮-৩০, রবিবার ১১—৫, বৃহস্পতিবার বন্ধ।

হাওড়া ঃ

১৭। আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা (১৯৬১), নবাসন, বাগনান। বাংলার শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব ও লোকশিল্প বিষয়ক স্থানীয় সংগ্রহশালা। মন্দিরের মৃৎফলক, মূর্তি, মুদ্রা, লোকশিল্প নিদর্শন এবং পুঁথির ছোট অথচ সুন্দর সংগ্রহ এখানে সুবিন্যস্তভাবে রাখা আছে। খোলা ঃ রবিবার ১১—৫, অন্যান্য দিন ৩—৫, বৃহস্পতিবার বন্ধ।

১৮। ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন (১১৮১), পোঃ বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। ২৭৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এশিয়ার বৃহত্তম উদ্ভিদ সংরক্ষণ উদ্যান। এখানে ১২,০০০ রকমের বৃক্ষ, গুল্ম, তরু ও লতা এবং সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এর অধীনে আড়াই লক্ষ শুকনো উদ্ভিদ নিদর্শন আছে। এই বোটানিক গার্ডেনের উদ্যোগে ভারতে চা, সিঙ্কোনা, মেহগনি প্রভৃতির চাষ প্রবর্তিত হয়। এখানকার পামবীথি, অর্কিড, লতা কুঞ্জ, পাতাবাহার ও ক্যাকটাস সংগ্রহ, বিশালাকার ওয়াটার লিলি এবং বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষ এই উদ্যানের বিশেষ আকর্ষণ। খোলা ঃ ৬-৩০—১১-৩০ ও ২-৩০—৫-৩০, গ্রন্থাগার ও হারবেরিয়াম ঃ ৯-৩০ —৫।

১৯। শরৎস্মৃতি সংগ্রহালয় (১৯৫৯), পানিত্রাস, দেউলপুর। রূপনারায়ণ নদীর কাছে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসত বাড়িতে শরৎ চন্দ্রের ব্যবহৃত জিনিস-পত্তর, পুস্তক-সংগ্রহ, তাঁর লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, মধ্যযুগীয় পুঁথি, মন্দিরের মৃৎফলক, মূর্ত্তি, লোকশিল্প নিদর্শন প্রভৃতি এই ছোট স্মারক সংগ্রহালয়ের দ্রষ্টব্য উপকরণ।

নদীয়া ঃ

কল্যানীতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি ও জুলজি বিভাগে দুটি বিভাগীয় সংগ্রহশালা আছে।

কল্যানী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান-বিষয়ক একটি সংগ্রহশালা রয়েছে।

বর্ধমান ঃ

২০। মিউজিয়ম এণ্ড আর্ট গ্যালারী (১৯৬৫), বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবাটি, বর্দ্ধমান। ইতিহাস, প্রত্ন ও শিল্প বিষয়ক সংগ্রহশালা। ইওরোপীয় চিত্রের কিছু কপি এখানে আছে। হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার শিল্প ও পুরাবস্তুর আঞ্চলিক সংগ্রহশালা হয়ে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। খোলা ঃ ১০—৫, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ।

মেদিনীপুর ঃ

২১। তাম্রলিপ্ত মিউজিয়ম এণ্ড রিসার্চ সেণ্টার, তমলুক, প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। এখানে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরাস্ত্র, ঐতিহাসিক যুগের সীল, সীলমোহর মুদ্রা, পোড়ামাটির মূর্ত্তি ও পুতুল, মন্দিরের মৃৎফলক, পুঁথি, পট প্রভৃতি পুরানিদর্শন সুবিন্যস্ত

ভাবে সাজান গোছান আছে। পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে আনন্দ নিকেতনের মত এটি একটি অন্যতম সংগ্রহশালা। খোলা : সবেতন কর্মীর অভাবে মিউজিয়ম খোলা রাখার কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। পূর্বে যোগাযোগ করে দেখতে যাওয়া ভাল।

২২। বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবন সংগ্রহশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখা মেদিনীপুর। মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চল ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা থেকে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু, মূর্ত্তি, তাম্রলেখ এই সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। খোলা : কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নেই।

২৩। মিউজিয়ম অফ দি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী, মেদিনীপুর। এই শতকের ষাটের দশকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় পুরাবস্তু ও লোককলার এই সংগ্রহশালাটি জিলা গ্রন্থাগারের একটি অংশ। তিলদা প্রত্ন-স্থান থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন কালের একটি ভাল স্থানিক পুরা-সংগ্রহ এখানে আছে। এ ছাড়া স্থানীয় মন্দিরের মৃৎফলক মুদ্রা, মূর্ত্তি ও লোককলা নিদর্শন এখানে আছে।

২৪। মিউজিয়ম অফ হ্যামিলটন হাইস্কুল (১৯৩৫), তমলুক। উক্ত স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা প্রাচীন তাম্রলিপ্তের পুরাস্থান থেকে সংগৃহীত প্রস্তরমূর্ত্তি, অলংকৃত স্তম্ভ, পোড়ামাটির মূর্ত্তি ও পুতুল, মৃৎপাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্যাদি এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। খোলা : ১১—৪, রবিবার ও স্কুলের অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ।

বাঁকুড়া :

২৫। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্ত্তিশালা (১৯৫১), বিষ্ণুপুর। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির নামাঙ্কিত এই প্রখ্যাত আঞ্চলিক সংগ্রহশালা প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুদ্র ও মসৃণ শ্রেণীর প্রস্তরাস্ত্র, প্রাচীন মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির কাজ, প্রস্তরমূর্ত্তি ও শিলালেখ, তাম্রলেখ, মুদ্রা এবং ঐ অঞ্চলের লোকশিল্পের নিদর্শনে সমৃদ্ধ। সচিত্র পুঁথি, পাটা, পট, গঞ্জিফাতাস এবং পালি, প্রাকৃত ও বাংলায় লেখা চার হাজারের বেশি পুঁথির সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় মন্দিরে উৎকীর্ণ রাঢ়বঙ্গের ঘরানার অপূর্ব ভাস্কর্য্য ও আলংকারিক নিদর্শনের প্রচুর আলোকচিত্র ভান্ডারটির সংগ্রহ উল্লেখ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখা কর্ত্তৃক এই পুরকীর্ত্তিশালাটি পরিচালিত।

বীরভূম :

২৬। কলাভবন মিউজিয়ম (১৯২২), বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বোলপুর। বিশ্বভারতীর চারু ও কারু কলা বিভাগ খোলার কয়েক বছরের মধ্যে কলাভবনস্থ কলাভবন মিউজিয়ম স্থাপিত হয় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং প্রতিমা দেবীর দানে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের বাউল ঘরানার চিত্র, বাংলার, বিশেষ ভাবে বীরভূম অঞ্চলের মন্দিরের মৃৎফলক, পোড়ামাটির কাজ, বাংলার প্রস্তর ও দারু

ভাস্কর্য ও লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনে এই সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ। দঃ পূঃ এশিয়ার গালার কাজ (থাইল্যান্ড ও ক্যাম্বোডিয়া), বাটিকের কাজ (ইন্দোনেশিয়া), সূচারু সূচী চিত্র (ট্যাপেস্ট্রি), মুখোশ ও বাদ্যযন্ত্র (চীন) এবং দেওয়ালচিত্রের নিদর্শনগুলি দর্শনীয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হস্তশিল্পের নিদর্শনও এখানে আছে। খোলা : সকাল ও বিকাল (কলেজ খোলা থাকার সময়)।

২৭। রবীন্দ্র ভবন (১৯৪২), অন্য নাম টেগোর মেমোরিয়াল মিউজিয়ম, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বোলপুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুর অনতি-পরে. কবির রচনার পাণ্ডুলিপি, চিঠি-পত্র. কবিকে লেখা চিঠি-পত্র. তাঁর লেখা এবং তাঁর উপর লেখা সকল রকম গ্রন্থ, পত্র, পত্রিকা, কবির বা কবির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র, রেকড, কবি কর্তৃক ব্যবহৃত নানা ধরনের জিনিস পত্তর. যা' কিছু কবির স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত সেই রকম বিভিন্ন জিনিষ রবীন্দ্র সদন নামক ভবনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র ভবন নামে রবীন্দ্র চর্চা ও গবেষণা সংস্থা স্থাপিত হলে রবীন্দ্র সদন রবীন্দ্র ভবনের একটি অঙ্গে পরিণত হয়। গ্রন্থাগার ও প্রদর্শনী কক্ষ একত্রে টেগোর মোমোরিয়াল মিউজিয়ম. বর্তমানে রবীন্দ্র ভবন নামে সমধিক পরিচিত। খোলা : শীতকালে ৭—১১-৩০ ও ২—৪-৩০, গ্রীষ্মকালে ৬-৩০—১১ ও ২-৩০—৫. মঙ্গলবার ও মে-জুন মাসে শুধুমাত্র সকালে খোলা থাকে. বুধবার বন্ধ।

শান্তিনিকেতনে উত্তরা ও শ্যামলী নামক ভবন দুটি কবিস্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় উত্তরা ও শ্যামলী রবিস্মৃতি সৌধ এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কক্ষগুলি যে ভাবে যেমনটি তখন ছিল তেমনটি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। জীবনীস্মারক সংগ্রহ শালারই আর এক প্রকাশ এই দুটি ভবন।

মুর্শিদ বাদ :

২৮। মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট মিউজিয়ম, জিয়াগঞ্জ। শ্রী এস. এন. নেহালিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূলত পারিবারিক সংগ্রহশালা। পাল ও সেন সময়ের প্রস্তর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি. প্রাচীন মূর্তি. রাজস্থানী, মুঘল, পাহাড়ী ও প্রাদেশিক মুঘল চিত্র প্রভৃতি এখানে আছে।

২৯। হাজার দুয়ারী প্যালেস মিউজিয়ম, মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের সম্পদ। শেষ মুঘল যুগের অস্ত্র-শস্ত্র ও বর্ম, ঐতিহাসিক দলিল, ফরমান, আরবি, ফার্সী ও উর্দুতে লিখিত পাণ্ডুলিপি এবং ঊনবিংশ শতকে মুদ্রিত পুস্তক, অলংকৃত ও চিত্রিত পাণ্ডুলিপি, প্রাদেশিক মুঘলরীতির (মুর্শিদাবাদী) চিত্র, তৈলচিত্র, প্রতিকৃতি চিত্র, হস্তীদন্ত কারুকৃতি সমৃদ্ধ এই প্রাসাদ সংগ্রহশালার ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ গুরুত্ব-পূর্ণ। সংগ্রহশালাটি সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হলেও এখনও এটি ঠিক সুপরিচালিত সাধারণ সংগ্রহালয় হয়ে ওঠেনি। খোলা : ১০—৪, শুক্রবার বন্ধ।

মালদা ঃ

৩০। মালদা মিউজিয়ম (১৯৬৭), মালদা। স্থাপনাকালে সংগ্রহশালাটির নাম ছিল বি. আর. সেন মিউজিয়ম এবং এটি বি আর সেন পাব্লিক লাইব্রেরীর অংশ ছিল। ১৯৫৭ সালে নোতুন ভবনে স্থানান্তরকালে এর নাম পরিবর্ত্তিত হয়। এই সংগ্রহশালার সঙ্গে একদা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যুক্ত ছিলেন। এখানে গৌড়বঙ্গের প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি, তাম্রলেখ, প্রাক্-মুসলিম ও মুসলিম যুগের মুদ্রা, বাংলা, নেপাল ও ত্রিপুরা থেকে প্রাপ্ত পুঁথি প্রভৃতির সংগ্রহ রয়েছে। খোলা ঃ নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা এস. ডি. ও'র অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে দেখা যায়।

পুরুলিয়া ঃ

৩১। পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট মিউজিয়ম, হরিপদ সাহিত্য মন্দির, পুরুলিয়া। পুরুলিয়া জেলা ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হিন্দু ও জৈন প্রস্তর-মূর্ত্তি, স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ পুঁথি, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি এই অধুনা স্থাপিত সংগ্রহ-শালায় আছে। সাহিত্য মন্দিরের একটি গ্রন্থাগারও আছে।

৩২। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ সংগ্রহশালা, বোঙ্গাবাড়ী, পুরুলিয়া। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্র, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ী কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং দানকৃত প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি, প্রস্তরমূর্ত্তির প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচে তোলা মূর্ত্তি, লোকশিল্প নিদর্শন, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের আঁকা চিত্র ও অন্যান্য নিদর্শনের স্কুল মিউজিয়ম। খোলা ঃ নির্দিষ্ট সময় নাই। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে যে কোনও দিন দেখা যেতে পারে।

পশ্চিম দিনাজপুর ঃ

৩৩। বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়ম। কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যক্তিগত উৎসাহে সংগৃহীত বারেন্দ্রভূমি অঞ্চলের পাল-সেন যুগের প্রস্তরমূর্ত্তি, আদি মধ্যযুগীয় মুদ্রা, তাম্রলেখ প্রভৃতি পুরা নিদর্শনের ভাল সংগ্রহ এখানে আছে। খোলা ঃ কলেজ খোলা থাকাকালীন সময়ে দেখা যায়।

দার্জিলিং ঃ

৩৪। অক্ষয় কুমার মৈত্র হিস্টরিক্যাল মিউজিয়ম (১৯৬৫), উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহনপুর, শিলিগুড়ি। উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সঙ্গে যুক্ত পুরাবস্তু সংগ্রহালয়। এখানে পাল-সেন যুগের প্রস্তর ও ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি, পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি এবং ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয়ের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত কিছু ভারতীয় মিনিয়েচর চিত্রের নিদর্শন এখানে আছে। খোলা ঃ নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।

৩৫। ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ম (১৯০৩), বেঙ্গল ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি, দার্জিলিং। বিশেষত দার্জিলিং, সিকিম, জলপাইগুড়ি ও হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের অমেরুদন্ডী ও সামান্য সংখ্যক মেরুদন্ডী প্রাণীর চর্ম, অস্থি, ডিম ও স্টাফড নিদর্শন

সহ হিমালয় অঞ্চলের জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোক চিত্র, চলচ্চিত্রখন্ড প্রভৃতির সংগ্রহ এখানে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত রয়েছে। কীট-পতঙ্গ, বিশেষভাবে প্রজাপতি ও পাখি, সাপ, মাছ প্রভৃতির সংগ্রহ ভাল। খোলা : ১০—৫. বুধবার ১—৫, শীতকালে এক ঘণ্টা আগে বন্ধ হয় এবং বৃহস্পতিবার বন্ধ।

৩৬। মিউজিয়ম অফ দি ডাওহিল ফরেস্ট স্কুল, ডাওহিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অরণ্য সম্পদ নিদর্শনের সংগ্রহশালা।

৩৭। পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জু-পার্ক (১৯৫৮), দার্জিলিং। শীত প্রধান উচ্চ-ভূমির প্রাণী সংরক্ষণাগার। খোলামেলা পরিবেশে হিমালয় অঞ্চলের জীব-জন্তু প্রজাতি অনুসারে পৃথক পৃথক এলাকায় মুক্ত করে রাখা আছে। দর্শকেরা উঁচু করে তোলা প্রাচীর ও লোহার বেড়ার বাইরে থেকে এই প্রাণী সংরক্ষণাগার দেখেন। এ জাতীয় চিড়িয়াখানা, শীত প্রধান উচ্চভূমির প্রাণী সংরক্ষণাগার, ভারতের আর কোথাও নেই।

৩৮। মিউজিয়ম অফ দি হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (১৯৫৫), দার্জিলিং মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের এই পার্বত্য অভিযান সংক্রান্ত সংগ্রহশালাটির বর্তমান নাম এভারেস্ট মিউজিয়ম। পার্বত্য অভিযান সংক্রান্ত নানান যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্তর, সফল অভিযাত্রীদের জীবনী ও অভিযান সংশিলষ্ট স্মারক দ্রব্যাদি, অভিযানের পথ ও পদ্ধতি, হিমালয় অঞ্চলের, বিশেষভাবে, বিভিন্ন শৃঙ্গ ও গিরিপথের ত্রিমাত্রিক টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র, হিমালয় অঞ্চলের জীব জন্তু গাছপালা ও ভূ-তাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এখানে সুপরিচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত আছে। খোলা : ৮ ৩০—১, ২—৪-৩০, মঙ্গলবার বন্ধ।

৩৯। লয়েড বোটানিক গার্ডেন (১৮৭৮), দার্জিলিং। এই উদ্ভিদ-সংরক্ষণ উদ্যানে নব্য দেশজ উদ্ভিদ, মধ্যযুগস্তরের পর্ণমোচী উদ্ভিদ এবং প্রাচীন বিচিত্র উদ্ভিদ, এই ভাগে বিভক্ত কুড়িটি উপ-বিভাজনে সতেরটি দেশের উদ্ভিদ নিদর্শন আছে। এছাড়া বহু রকমের পাতাবাহার, ফুলের গাছ ও লতা, অর্কিড এবং দেশজ ও ভেষজ বৃক্ষ-লতা-গুল্মের সংগ্রহ এখানে রয়েছে। হারবেরিয়ামে অজস্র শুকনো পাতা, বল্কল, শাখা, মূল প্রভৃতির নিদর্শন আছে। খোলা : সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত ; হারবেরিয়াম ১০-৩০ —২-৬০ (শীতকাল) এবং ১০—৩ (গ্রীষ্মকাল)।

—: — গুরুত্বপূর্ণ ভ্রম সংশোধন :—

৮১ পৃষ্ঠায় ২৪ পংক্তিতে ষোড়শের স্থলে সপ্তদশ এবং সপ্তদশের স্থলে অষ্টাদশ হবে।